

অবশ্যই যখন “পরলে অমৃত” তখন চূর্ণ অপর মানব জীবনের প্রাণ
 প্রেমরসকে মহনপূরক উহা উজ্জ্বল করিতে হইয়াছে। স্বভাবের নৈসর্গি
 বিকাশ, তাহার উপর শিকা ও শাসনের পরিচর্যা এবং অবস্থার সংঘর্ষ
 উহা দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি এবং অনন্ত উন্নতি। এই উন্নতি এবং
 পরিণতির প্রক্রিয়াকে এখানে পরলমহন এবং অমৃত উৎপাদন রূপে গ্রহ
 করা হইয়াছে।

গরলে অমৃত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শুভসংযোগ ।

বৈশাখ মাস, প্রাতঃকাল, নিদ্রাবের ভাগমান তরল মেঘান্তরাল ভেদ করিয়া তরুণ সূর্যের অরুণ কান্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহির ন্যায় মৃহ মৃহ প্রকাশ পাইতেছে। উপবনের ফুটন্ত ফুলের গাছগুলিকে ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিয়া, ধূসর বর্ণের বনাবলীকে সবেগে উড়াইয়া প্রভাত সমীরণ বহিয়া বাইতেছে, এবং সর্বাধিকসিত বর্ণ চম্পকের সুতীত্ৰ পরিমল রাশি সেই বায়ু-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আকাশ পথে বিচরণ করিতেছে। কৃষ্ণ নীলোজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুন টুন পক্ষীরা ফুলে ফুলে মধু খাটয়া ফিরিতেছে। আত্ম কান-নের গহন নিকুঞ্জে লুকাইয়া কোকিলকুল তুষা নিনাদে বন্ধার করিতেছে, এবং পাপিয়ার দল ডাকিয়া ডাকিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বসিতেছে, আবার আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর ও মধুমক্ষীকার গুঞ্জনে, বিহঙ্গের কুঞ্জনে, কুহুমের আত্মানে, বিমল প্রাতঃ-সমীরণে দশদিক্ আমোদিত, প্রকৃতির মুখমণ্ডল শান্তিরসে পরিপূর্ণ এবং নবরাগে সুরঞ্জিত। সেই মধুমর সময়ে একটা চতুর্দশ বর্ষীয়া কিশোর বালিকা ফুলের সাজি হস্তে প্রযুক্ত কেশে উৎফুল্ললোচনে চকল পাদবিক্রোশে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বিস্মারিত নয়নযুগল বিকসিত কুহুমাবলীর অধেষণে এমনি পিপাসু, যে অন্য কোন পদার্থ বা ব্যক্তি তথায় আছে কি না তাহা জানিবার অবসর ছিল না। কেন না, কুহুম-কোমল সেই সূচক লোচনদ্বয় চারিদিকে কেবল ফুলের শোভাই তখন

দেখিতেছিল। প্রাতঃসূর্য্যের হেমজ্যোতির্বিভাসিত বিচিত্র বর্ণের কুহুম-সৌন্দর্য্য ভটা, নয়নস্নিগ্ধকর নবপল্লবিত তরুশাখার হরিৎ কান্তি, তাহার মধ্যে নববালিকার অমল কোমল স্তন্যের মূর্ত্তি ধানি অবতীর্ণ হইয়া উপবনের উদ্ভিদ সমূহকে অতিমাত্রা সহজ্জ্বলিত এবং সুশোভিত করিয়াছিল।

বালিকার শ্রুতি ধীর প্রবাহত, অথচ গতি অতি চঞ্চল, এবং উদ্যাম-শীল; চক্ষের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী এবং অনুরাগ-পূর্ণ; অতি যত্ন এবং স্নেহ সহকারে বেল, মন্দিরা, চামেলী, গন্ধরাজ ফুলগুলি তুলিয়া তুলিয়া সে সাজিতে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। যে সকল অর্দ্ধ-বিকসিত গোলাপ নবরবির কিরণে প্রকীর্ণ হইয়া ঐবক্তাস্য মুখে স্তম্ভ পবনহিম্মোলে জ্রোড়া করিতেছিল, বালিকা তাহাদের প্রতি বন্ধিম প্রোবার, অনিমেষ লোচনে ক্রম কাল চাহিয়া রহিল, এবং চাহিয়া চাহিয়া নাসারন্ধ্রে তাহাদের সূক্ষ্ম মকরন্দ পান করিয়া আপনিও মুক্টিপিয়া একটু একটু হাসিল। কাহারো কাহারো সঙ্গে ইচ্ছিতে কিছু কিছু আলাপও করিল। উভয়ের মধ্যে কি ভাবের কথা বার্তা হইল, তাহা তোমার আমার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুহুমকলিকা নবীনা বালিকার উদ্ভিন্ন যৌবনরসাত্ত্বিক প্রকৃতির সহিত সহাস্য আস্য ফুলবালাগণের বহুভার সম্বন্ধ দেবগণেরও অগোচর। বস্তুতঃ উদ্যানের যে বিভাগে গোলাপ বৃক্ষ সকল প্রস্তুতিত কুহুমপুঞ্জে আলোকিত হইয়াছিল তাহাদেরপানে চাহিলে প্রাণ যেন পাগল হইয়া উঠে। খেত পীত নীল পাটল লোহিত নানা বর্ণের সহস্র সহস্র দিম্বি বিলাতি গোলাপে সে দিক্‌টা যেন একবারে হাইয়া রাখিয়াছিল। বড় বড় ফুটন্ত গোলাপ গুল সৌন্দর্য্যরসে এবং পুরতিভারে প্রমত্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে সেই পুষ্পচয়নকারিণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া স্পষ্টাক্ষরে কি যেন বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের হাস্য কৌতুক অজডঙ্কী রসরস দর্শনে বালিকা সে দিকে আর বড় ভাকাইতে পারিল না, তাহার নয়নকমল যেন মদভরে ঝাঁপিয়া পড়িল, দেহ মন প্রাণ বিচঞ্চল এবং গতিশক্তি রহিত হইল; ফুলফল যেন তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিল। তাহাদের বিপুল সৌন্দর্য্য প্রভাবে সে নিতান্তই এককালে শিথিলবদন হইয়া পড়িল। বনবিহারিণী সৌন্দর্য্যগর্ভিতা কুহুমকামিনী-গণের আশ্রয় নিকাশোদ্যুৎ হৃদিমল কোমার লাবণ্য এবং মধুর হাস্যহাস্য

অবলোকনে তাহা দ্বিধাকে সে আর তখন বুজুচ্যুত করিতে সাহসী হইল না। বভাবে বভাবে মিশিলে যে একটা প্রগাঢ় সহায়কৃতি আছে, তাহাই এখানে ঘটিয়াছিল। বালিকা গোলাপ বেধিতে বেধিতে মনে করিতে লাগিল, যেন সে আপনিও উহাদের দলের মধ্যে এক জন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার তরল চিত্তে সে ভাব অধিক দৃঢ় স্থান পাইল না। ভাবের আবেশে বিমনা হইয়া অলিগুপ্তনের সহিত গুন্-গুন্ করে এই গীতটী গাইতে লাগিল;—

“ফুটত ফুলের মাকে বেধে রে মাগের হাসি।

কিবা মৃদুমন্দ, সুধাগন্ধ, করে তাহে রাশি রাশি।

আহা কি রূপের ছটা, বিচিত্র বরণঘটা,

ঘোরালো রসালো, করে দিক্ আলো,

শোভা হেরে মন উদাসী।

কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিভাপ হরে,

মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভাল হাসি।

তরুণ পুষ্প বনে, নিরধিরে নিরঞ্জে,

হাসে যোগানন্দে, ভাসে প্রেমানন্দে,

যোগী ওষি তপোবনবাসী।”

গীত গাইতে গাইতে অজ্ঞাতসারে সে দুই একটা আশ্চর্য্যকৃত্ত গালভরা হাসি গোলাপ তুলিয়া সাজির শোভা বৃদ্ধি করিল। পরে মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে অস্থির কাটিয়া “আহা হা কি করলাম!” বলিয়া একটু হঃখও প্রকাশ করিয়াছিল।

ফুলের সঙ্গে স্ত্রীকাতির প্রকৃতিগত একটা অতি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কাহার সঙ্গেই বা না আছে? তুমি আমি নীরস পদ্যটির বিবরণী জীব, আমাদেরও কি ফুল দেখিতে, ফুল ভংকিতে ইচ্ছা হয় না? পুষ্পিত কানন হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে পড়িলে কার প্রাণ না সচকিত হয়? তা হবে না কেন, হয় বৈ কি; কিন্তু তরুণ বালিকার কবিত্বরসময় সুকোমল জ্বরে উহা যেমন প্রীতির স উৎসারিত করে, উহায়া উভয় উভয়ের প্রকৃতিতে যেমন অমুখ্যবিশিষ্ট হয়, অপরের সঙ্গে তেমনটী হইবার সম্ভাবনা নাই।

ফুলের সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যগৌরবে রসবতী রমণীর প্রাণ পাগল হইয়া উঠে । সে ফুল দেখিয়া ফুলের মত রূপবতী এবং সুন্দর কোমলকাণ্ঠি হইতে চায় । ফুল তাহার বড় লোভের লামগ্রী ; আত্ম পর জ্ঞান থাকে না ফুটন্ত ফুল দেখিলেই তার পানে সে ছুটিয়া যায় । এই জন্য অসভ সাঁওতাল কোলরমণী সুসভ্য বাবুর বাগানে প্রবেশ করে, তাহার ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই । ফুলের হাসি দেখিলে সে হাসিয়া ফেলে, এবং তাহার সঙ্গে কথা কয়, সখী সম্বোধনে তাহাকে আদর করে ; অবশেষে তাহাকে অঙ্গের সঙ্গী করিয়া লয় । কুমুদিত তরু লতা দেখিলে কিশোরবয়স্কা বালিকার চিত্ত আরও উন্মাদবৎ হইয়া উঠে । কলিকা হইতে ফুটন্ত ফুল-গুলি সমস্ত শাখা পত্রবের সহিত ছিন্ন করিতে না পারিলে আর তাহার জ্বর পরিতৃপ্ত হয় না । ইহাতে বৃক্ষবাটিকা শ্রীহীন হউক, আর উদ্যান-স্বামীর হৃদয়ে ব্যথা লাগুক, আর বাগাই হউক, তাহা সে ভাবিতে পারে না । সে ফুল লইয়া ঘোঁপায় শুঁজিবে, কানে পরিবে, এবং পরাইবে ; নাকে শুঁকিবে এবং শুঁকাইবে ; চুলে বাঁধিবে, মালা গাঁথিয়া গলায় ধারণ করিবে, ঘর সাজাইবে, এই তার কাজ । ফুলের সঙ্গে তাহার আরো কত বিধ সম্পর্ক আছে তাহা কে বলিতে পারে ? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে বাল্যকাল হইতে ফুলের প্রতি একটু আদর ও শ্রদ্ধা করিতেও শিখে । দেবপূজার উপকরণ কুমুদরাশিকে সে পবিত্র ভাবে আহরণ করিতে জানে ।

বালিকা অন্যান্য ফুল সংগ্রহ করিয়া শেষ চাঁপাগাছ তলে আসিল । বৈশাখী চাঁপা সুবর্ণ লাবণ্যে গাছ আলো করিয়া হাসিতেছে । সঙ্গে আকাশ প্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণ হাকুলি বিকুলি করিতে লাগিল । উচ্চ গাছের সরু ডালে ফুল সকল ফুটিয়া আছে, হাতে ধরিতে পারা যায় না । নানা রকমে সে চেষ্টা করিল, কিছুতেই কৃতকার্য হইল না । এক একবার বাতাসের ভরে নীচের হুই একটা ডাল তাহার হাতের কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে আবার তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল । প্রভাতের মন সমীরণ সচরাচর কিছু মন লোক হয় । সে যুক্তবাতারন পথে প্রবেশ করিয়া বিলম্বে স্নানান্ত নিদ্রাতুর বাঙ্গালী বাবুকে আটটা বেলা

পর্বাঙ্ক শোয়াইয়া রাখে, আলস্যমুখে তাহার মনের বন্ধনকে শিথিল করিয়া দেয়, বিলাসীদিগের অন্তরে বিলাস রস উদ্বোধন করে, সুতরাং তাহাকে আমরা ভক্তলোক আর কিরূপে বলিতে পারি। সে ঐ সময় সুযোগ পাইয়া সরলা বালার সঙ্গে একটু আমোদ কোঁতুক আরম্ভ করিল। কুহুম-মুরা পানে বিভোর হইয়া তাহার নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক মস্তিষ্কে পদ্ম-মোহে মাতাইয়া শেষ কানের ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিল। কার সাধ্য তাহার গমনাগমনের পথ বন্ধ করে ? রাজপ্রাসাদ হইতে দরজের পর্ণকূটীর, মলিন দুর্গন্ধময় স্থান হইতে পুষ্পবাসিত উপবন, কোথাও আর তাহার অগম্য স্থান নাই। সময়ে সময়ে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সে বড় লজ্জিত ও বিরক্ত করিয়া তোলে। এটা ভারি অন্যায় কিছ, না হইলে চলে না বলিয়াই কি এরূপ অভদ্র ব্যবহার উচিত হয় ? সে কখন বালিকার ললাট-সংলগ্ন বর্ষাবিন্দু মুছাইয়া, তাহার অলকদ্বয় দ্বয়ং কল্মিষ করিয়া লম্বমান কেশগুচ্ছের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিল ; কখন বা দৃষ্টভার সহিত চুলগুলি উড়াইয়া পার্শ্বস্থ কটক বৃক্ষশাখার সঙ্গে জড়াইবার চেষ্টা পাইতেছিল। কিন্তু তাহা পারিয়া উঠিল না। কারণ, বালিকা প্রাতঃস্নানের পর বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছিল, তখন তাহার চুল শুকায় নাই, তৈল এবং সলিলযোগে তাহার সকলে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কাজেই মল্লভায়া দলবলের ভয়ে এখানে আর বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে কুহুমমুখবাসিত তৈলচর্চিত সেই নিবিড় কুন্তলের সৌগন্ধের সহিত পুষ্পগন্ধ মিশাইয়া তিনি অনাত্ম প্রস্থান করিলেন।

চাঁপাকুল না লইয়া বালিকা বাড়ী ফিরিবে না, মালী ঠাকুরাণীর বৈশাখী চাঁপার ব্রত আছে, চাঁপার বিশেষ প্রয়োজন। অনন্তর এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া আঁকুশের অহুসঙ্কানে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাকুল মনে অনন্যচিন্তে আঁকুশি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখিল, চামেলী-কুন্ড-মধ্যে লোহার খেকের উপর বনকুহুম সদৃশ এক প্রিয়দর্শন যুবক বসিয়া রহিয়াছে। এই দর্শনটী সাধারণ দর্শন নহে, সুভযোগের দর্শন। পুষ্পচয়নকারিণী বালার অন্তরাত্মা চক্ষুদ্বারা দিয়া যুবকের স্বচ্ছ যৌবনলাবণ্যপ্রভা ভেদ করিয়া একবারে তাহার আত্মাপুরুষকে দেখিয়া কেলিয়াছিল। দেবিবামাত্র তাহার দ্বয়ভাষ্যভরে

প্রেমের সকার হয়। প্রথমে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কেন না, প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ নাম ধাম স্বভাব প্রকৃতি তখন সে কিছুই অবগত নহে; কেবল প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল, একটা কি রকম যেন গোল মাল হইয়া গেল। পূর্বেও সে ঐ যুবাকে দুই এক বার বাড়ীতে দেখিয়াছিল, কিন্তু অদ্যকার দেখার মত নহে। সকল কার্যেরই শুভ যোগ আছে। দেখিয়া আর তাহাকে সে বাহিরে রাখিল না, অলৌকিক নিয়মে আশ্রয় করিয়া ফেলিল। যেন গলিত উত্তপ্ত স্বর্ণের উপর একটা স্পষ্ট রেখা বসিয়া গেল।

যুবক এক খানি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করিয়া পত্রের মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপনপূর্বক অদীত বিষয়, অথবা প্রাকৃতিক সোভার বিষয় চিন্তা করিতে-ছিলেন। তিনি কে, নিবাস কোথায়, বালিকার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধই বা কি, সে সকল পরিচয় ক্রমে জানা যাইবে। এক্ষণে বালিকা আপনার অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়া লউক। তখনস্তর যুবকের সাহায্যে সে কতকগুলি চাঁপাফুল সংগ্রহ করিয়া ত্বরিত পদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু প্রাণের টান টুকু চাঁপাগাছ তলে রাখিয়া গেল। যে হস্ত তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিয়াছিল, চম্পককলিকা সম সেই করপন্নব ভাবিতে ভাবিতে, যুবকের মধুর সম্বোধন কর্ণকূহরে আলোচনা করিতে করিতে বিভ্রান্ত চিত্তে গৃহপ্রবেশ করিল। একটা অদৃশ্য অননুভবনীর দুর্জয় অঘটনুমিষ্ট শক্তি তখন তাহার উরল হৃদয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে পূর্বরাগ বলেন, কেহ বলেন নবাহ্বরাগ, আমরা দুইটাকে বলি শুভযোগের দর্শন। নূতন চক্ষে নূতন আলোকে নবভাবে নূতন মাহুয দর্শন। যে দর্শনে প্রাণ চঞ্চল, চিত্ত ভাবান্তরিত এবং মন উচাটন হয়, সেই দর্শন। প্রেমরাজ্যের হ্রবগাহ্য গূঢ় নিয়মে ইহা ঘটয়া থাকে। ইহার সাহায্যে লোকে আপনার মনের মাহুযকে চিনিয়া লয়। বিস্তীর্ণ ভবপ্রান্তরে, নিবিড় লোকারণ্য মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবনির্কর্ষে নরজ-হরের সহিত নারীজহরের মিলন হয়। অদৃষ্ট চক্র তাহাদ্বিগকে মিলাইয়া দেয়, স্বয়ং প্রজাপতি ঘটক হইয়া আপনার মেহের পুত্র কন্যাকে আধ্যাত্মিক অনন্ত প্রেমবন্ধনে গ্রথিত করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

নির্দিষ্ট নিয়তি ।

ভাগীরথী তীরে নন্দন গ্রামে বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে একটা ভদ্র গৃহস্থ বাস করিতেন, বাহ্যারাম নামে তাঁহার এক মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। বনমালী বাবু অতি সুচরিত্র ভদ্র স্বভাব ব্যক্তি, গ্রামস্থ সকলের শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্র। তিনি অল্প বয়সে বিবর কার্য পরিচাল্যপূর্বক পেনশিয়ান গ্রহণ করেন। নিরাপদে নিরোহ ভদ্র লোকের মত সংসারে থাকিয়া সঙ্গ্রহ পাঠ, ধর্মচিন্তা, পরসেবার জীবন বাপন করিবেন এই তাঁহার নক্স ছিল। সেই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। পুত্র বাহ্যারাম পিতার বড় বাধ্য অনুগত সন্তান। এই মূলক্ষণাক্রান্ত যুবর উপর সংসার সম্বন্ধীয় ভবিষ্যতের ব্যবতীয় আশা ভরসা নাস্ত রাখিয়া বনমালী মনে মনে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। স্ত্রী পুত্র লইয়া বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতেন। স্ত্রীও বড় সত্যী সাক্ষী ধর্মপরায়ণা, তিনি স্বামীকে দেবতার ন্যায় জানিয়া তদীয় পদ সেবার পরমানন্দ অনুভব করিতেন।

আমাদের বাহ্যারাম চেলেবেলা হইতেই একটু কেমন বেন অন্যমনস্ক রকম। এই দৈর্ঘ্যলম্ব বয়সে বালকদিগের সঙ্গে বেড়াইতেছে, দেখিতে দেখিতে কোথায় উধাউ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয় তো গ্রামের বহির্ভাগে সুদূর প্রান্তরের মাঝখানে একা এক গাছের তলার চূপ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে, না হয় নদীর ধারে বসিয়া জলের খেলা দেখিতেছে। অসীম নীল নভমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ড অন্তাচলগামী সূর্যের কিরণমালায় কেমন বিচিত্র শোভা ধারণ করে, তাহা দেখিবার জন্য বাহ্যারামের বড়ই একটা পিপাসা ছিল। সে মাঠে কিনা নদীর ধারে গিয়া এই সকল দেখিত, আর আপন মনে হাসিত। নির্জন জলাশয়ে মাঁচ দেখিলে বীরের মন যেমন ব্যাকুল হয়, সুগম্যগ্রিহ ব্যাক্ত অরণ্যমধ্যে সুগম্য বর্শনে লোভবশতঃ

যেমন ব্যস্ত হইয় পড়ে, তখনভাসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, কিম্ব উর্ব্বা-
মালা শোভিত স্রোতধিনী উন্নতিনী, কিম্ব। প্রযুক্ত মুনীল গগন দেখিলে
এই তরুণবয়স্ক যুবকের মন তেমনি উন্নত। এবং বিচঞ্চল হইত। যেখানে
ফুলের বাগান, যেখানে নদীর প্রবাহ, যেখানে বৃক্ষরাজী এবং পাখীর গান,
সেই সেই স্থানে নীরবে একা বসিয়া থাকিতে তাহার বড় ভাল লাগিত।
কেবল যে প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্যই সে দেখিতে ভালবাসিত তাহা নহে,
তাহার গভীর ভয়াবহ প্রচণ্ড এবং প্রশান্ত দৃশ্যের প্রতিও তাহার বিলক্ষণ
আকর্ষণ ছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মাঠের মধ্যে বটরক্তলে,
কিম্ব। অমানিশার ঘনতমসাক্ষর নির্জ্বল ভগ্ন দেবমন্দিরের রোরাকে, অথবা
দ্বিপদব্যাপী কৃক মেঘাবৃত বজ্রবিকল্লিত ভীষণ শকারমান আকাশনিম্নে
একাকী বসিয়া সে প্রকৃতির গভীর এবং রুদ্র বেশ দর্শন করিত। যে যে
স্থানে অনেরা ভয় পায়, বাহ্যারামের সেই সেই স্থলে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়
হয়। যখন সে লোকালয়ে বয়স্য বালকবৃন্দের সঙ্গে থাকিত, তখনও
একটু ঘেম খতর খতর ভাব। সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেছে, লোকাভীত
কোন রাজ্যে যেন বিচরণ করিতেছে, যাহারা কাছে তাহার কাছে নয়,
যাহা অদৃশ্য তাহার প্রতিই চিত্ত নিমগ্ন। মুখে বেশী কথাবার্তা ছিল না,
তবে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিলে একটু হাসিয়া অটিল হৃকোথা বৈজ্ঞানিক
ভাষায় দুই এক কথা প্রত্যুত্তর দিত। সহাধ্যায়ী বালকেরা এইরূপ ভাব
খতাব দেখিয়া তাহার নাম রাধিয়াছিল কাইলো। কেহ কেহ পণ্ডিত
বলিয়া ডাকিত।

বাহ্যারাম পণ্ডিতকে কেহ কখন চুল আঁচড়াইতে, কিম্ব। আরনা বুদ্ধ
ব্যবহার করিতে দেখে নাই। এই জন্য তাঁহার দীর্ঘ চুলগুলি চির কাল
বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকিত। শরীরের সংবাদ তিনি জ্ঞায় কিছুই লইতেন
না। সময়ে সময়ে হান দস্তমার্জ্জন, এমন কি আহারে পর্য্যন্ত ভুল হইত।
কথাগুলি আস্তে আস্তে মূহ হয়ে, সমস্ত কার্য্যই বীর গতিতে। কখন কার
লঙ্গে কাপড় চাদর ছাড়া জুতা বদল করিতেন, এবং নিজের ঐ সকল
ব্যবহার্য্য সামগ্রী কোথায় কখন ফেলিয়া আসিতেন তাহার ঠিক পাওয়া
যাইত না। এক দিন ভুলক্রমে একটা ছোট মশারি ধোছোট করিয়া বাহির

নির্দিষ্ট নিয়তি ।

হইয়াছিলেন। আর এক দিন একটা পিরাণ বৃকের দিক্‌টা গিঠে এবং পিঠের দিক্‌টা বৃকে বিপরীত ভাবে গাথ দিয়া বাহির হন। তাহার এই সকল অদ্ভুত বেশ ভূষা অনেকের হাস্যাত্মকের বিষয় ছিল। এ জন্য সহচর বালকগণ অনেক সময় তাহাকে একটু বায়ুরোগগ্রস্ত নির্দোষ মনে করিয়া ঠাট্টা বিদ্রোপ করিত। যে সকল কার্য্য স্বাভাবিক নিয়ম এবং প্রচলিত প্রথার বিরোধী তাহাতে যখন বালকবৎ সরল নির্দোষ ভাব প্রকাশিত হয়, তখন তাহা দেখিতে নিতান্ত মন লাগে না। বাহ্যারাম সরলতার অবতার বিশেষ। সে রাগিকে জানিত না; যে বাহা বলুক, এক নির্দোষ মুহূ হাস্যো সমস্ত উড়াইয়া দিত।

এক দিন বাড়ীতে কি ছিল না, বাজার করিবার লোকের অভাব হইল। বনমালীর ভগ্নী রামমণি ভ্রাতৃপুত্রকে বলিলেন, “বাবা, আজ একবার বাজারে যাঠিতে পারিবে কি? নৈলে ত আর রান্না হয় না।” বাহ্যারাম যে এ সকল কাজে নিতান্তই অপটু তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, “কেন পারিব না! দেও, পরসাদ দেও, কি কি আনিতে হইবে বল, সব আনিয়া দিতেছি।” রামমণি বহুবিধ জব্যের তালিকা দিয়া তাহাকে বাজারে পাঠাইলেন। বাহ্যারাম ভূগোল ইতিহাস মুখস্থের ন্যায় খোড় মোচা ডুমুর কাঁচকলা আলু পটোল শাক মাচ ভগ্ন করিতে করিতে বাজারে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কিনিবার সময় অধিকাংশ জব্য ভুল করিল। কতক পরসাদ তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল, কতক দোকানদারেরা ঠকাইয়া লইল। বাহা কিছু ক্রয় করিয়াছিল, তাহা গুহাইয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেওয়া বড় মুড়িল হইল। বাজারে লোকের ভিড়ে গা ঘামিয়া উঠিয়াছে, এক হাতে মাচ, অপর হাতে নিরামিষ কাঁচকলা শাক, বগলে একখান খোড়, কাঁধে গামছার বাঁধা অন্যান্য ভরকারী। চাদর সামলাইতে কাচা কোঁচা ঘসিয়া পড়ে, কাপড় পরিতে গিয়া চাদর ব্লাগ লুটার। আনিতে আনিতে অর্ধেক আলু পটোল পথেই পড়িয়া রহিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি দূরদর্শী মংসালোভী চিলের পক্ষে এটা বড় স্তম্ভকণ। অন্যমনস্ক অচতুর লোক দেখিলে তাহার বেশ চিনিতে পারে। বাহ্যারাম যেন চিলের সোণার জন্যই বাচগুলি হাতে ধরিয়া প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। পথের মাঝে চিলে ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে মাচ লইয়া গলাইল, ভর পাইয়া বাহ্যারাম অবশিষ্ট দ্রব্যাদি মাটিতে হরির লুট দিলেন। পথিকের সাহায্যে কোন প্রকারে শেষ বাজারসামগ্রী কিছু কিছু গৃহে আনিতে হয়।

রামমণি পিসী দ্রব্যাদি বেধিয়া অগ্রে খানিক নাকে কাঁধিলেন, বাহ্যারামকে ডাঙ্গা করিলেন, শেষ ভাড়াপুত্রের অবোগ্যতা বেধিয়া হাসিয়া বলিলেন, “হ্যাঁরে ছেলে, তোর কি কোন ক্ষমতা নাই? হার হার হার! গারে লুল কাণ মেখে, যেমে জিখতি হয়ে, মুখ রাঙ্গা করে! আর সব সামগ্রী পত্র কৈ? কি কি কিনি আনুলি হিসাব বে দিকি দেখি? এমন নিকোঁধ ছেলে তুই! হা আমার পোড়া কপাল! হাতে রক্তের দাগ কিসের? মাচ কৈ?” বাহ্যারাম হাসিয়া বলিলেন, “পিসী, চিলে ছোঁ মেরে হাত থেকে মাচ নিরে গেছে, তাই রক্ত পড়ছে। এই নাও কি কি সামগ্রী এনেছি সব বুকে মুখে নাও, আমি আর বাপু ভাত হিসাব টিসাব কিতে পারিব না।” বাহ্যারাম এক খান পুস্তক মুখস্থ করিতে পারে, কিন্তু আলু পুটোল খোড় কাঁচকলার হিসাবের কথা মনে হইলে তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। রামমণি সেই দিন হইতে আর তাহাকে কখনও বাজারের ভার দেন নাই।

বাহ্যারামকে ভা. মাহুব পাইয়া অনেক অনেক সময় ধমক দিত, নিকোঁধ বলিত, উপহাস বিদ্রূপ করিত, কিন্তু কিছুতেই কেহ রাগাইতে পারিত না। হয় তো বধন কেহ তাহাকে বকিতেছে, তখন সে অন্য দিকের ভাবিতেছে; খানিক ক্ষণ পর বলিল, “জাঁ, কি বল্? আমি তনিতে পাই নাই।” সব মাটা হইয়া গেল। গল্পনা ডাঙ্গা উপহাসবাক্য অনেক সময় এইরূপে তাহার কর্ণে প্রবেশই করিতে পারিত না। সে সহজেই চিত্তামগ্ন হইয়া বাহ্যাপার বিমূঢ় হইয়া বাইত। এত অল্প বয়সে কেন সে এমন গভীর স্বভাব অনন্যমনা হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, এই মাত্র কেবল শুনা গিয়াছে, যে সে বি. এ. ক্লাসে পড়িবার পূর্বেই চিত্তাশীল জানীদ্বিগের বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিয়া অবসর কালে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

ছুটিতে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িত। বাহ্যর যে বিষয়ে স্বাভাবিক কুচি, সে আপনা হইতে সেই দিকে গমন করে। বাহ্যারামের মনের গঠন ঐ প্রকার ছিল, সুতরাং চিন্তাশীল জ্ঞানগ্রন্থ তাহার ভাল লাগিত। ঐ সময়কালে বাতুল ভবনে গিয়া ক্রমাগত দুই মাস কাল সে বড় বড় লোকের জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র অমুলীন করিত। পরীক্ষা পাঠ্যের উৎপীড়ন না থাকিলে এ পথে সে আরও অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই। এই চিন্তাশীলতা, তত্ত্বপিপাসা এবং পাত্তার্থ্য বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে বর্ধিত হইয়াছিল। সমস্ত বাধা বিঘ্ন প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাহার মনের গতি এই দিকে ধাবিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্মশানবৈরাগ্য ।

প্রথম বৌবনেই বাহ্যারামের জীবনে এমন একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় বাহাতে তাঁহাকে একবারে সংসারসম্বন্ধে উদ্বাসিত করিয়া তুলে। তাহা না ঘটিলেও কোন কালে তিনি সাধারণ লোকের মত বিষয়াসক্ত সংসারী হইতেন কি না সন্দেহ; কারণ তাঁহার নিয়তি অন্য প্রকার ছিল। বাহিরের প্রতিকূল ঘটনা, তাঁহার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে নির্দিষ্ট নিয়তির পথে লইয়া যাইবার পক্ষে কেমন অসুকূল হইয়াছিল পরে তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। ইহাকে অদৃষ্টের লিখন বলিলে কোন ক্ষতি নাই। সেই অদৃষ্ট কল কলিবার পূর্বে নিয়তির সহিত দৈনিক জীবনের অন্তরঃ ঘটনারাজীর সংঘাতে যে সকল অনন্ত ঘটনাবলী সমুৎপন্ন হয় তাহাই উপন্যাসের স্তীলা। শেষ বাহা অদৃষ্ট, বহুবিধ কষ্টব্যাসুষ্ঠান ও অবস্থাচক্রে নিত্যের দ্বারা তাহা পরিণামে দৃষ্ট হয়। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ না পড়িলে সে অদৃষ্ট কি তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বাহ্যারামের জীবন-চরিত্র ভবিষ্যৎ চরিত্রের নিদর্শন সময়ের কিছু আগেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

বনমালী বাবু কুলীন বংশোদ্ভব, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। ইহঁার পিতৃ-
 পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষেরা বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিজে
 একটির অধিক দ্বারপরিগ্রহ করেন নাই। করিবার প্রবৃত্তিও কখন হয়
 নাই। মনে মনে কৌলীন্য প্রথাকে ঘৃণা করিতেন। বিশেষতঃ তদীয়
 সহধর্মিণী রমণীকুলের বস্তুবদ্ধতা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা বরা দাক্ষিণ্য
 প্রভৃতি সাহুগুণে বনমালীর মন ধর্ম্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হয়। মজুবোম
 বড় প্রকার সহায় এ পৃথিবীতে আছে উদ্ভবো সাক্ষী ত্রীর মত সহায় আর
 কেহ নাই। অনেক লোক ত্রীর গুণে ধর্ম্মের পথে স্থির থাকে এবং স্ত্রী-
 বিরোগে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গমন করে। বনমালীর ভাগ্যে শেষ
 তাহাই ঘটয়াছিল। বাহ্যারামের অনন্য পুরোহিতে জগন্নাথ দর্শনে গমন
 করেন, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিরোগে পিতা পুত্র উভ-
 য়েই অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলেন। গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্জ্ঞানে সংসার
 পরিবার স্থাপনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বনমালীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া
 গেল। বাহ্যারাম বিষম শোকের আঘাতে আরও নিস্তরু গভীর ভাব ধারণ
 করিলেন। এক অন্তঃ অভাবে পরিবারের সমস্ত বন্ধন একবারে শিথিল
 হইয়া পড়িল। কে আর তখন কাহাকে সাজুনা দিবে? একা রামমণি
 পিসী; তিনি আর কোন্ দিক্ সামলাইবেন? এক দিকে পিতা, অপর
 দিকে পুত্র হৃদয় শোকে ভিন্নমান হইয়া কাগধাপন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর বিরহে বনমালীর মনে অতিশয় মিসের্স উপস্থিত
 হইল। চিন্তা এমন উদ্বাস হইয়া গেল, যে গৃহকর্মে আর তিনি মন দিতে
 পারেন না। মধ্যে মধ্যে শোকভয়ঙ্কর হতাশ হইয়া এমন দীর্ঘ নিশ্বাস
 পরিভাষণ করেন, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন অর্ধেক পরমায়ু কয় হইয়া
 গেল। এত যে সংসারে মায়া মমতা, সমস্ত নিঃশেষিত হইল। একমাত্র
 সন্তান বাহ্যারাম তাঁহার পানে একবার ফিরে চাহিতে ইচ্ছা হয় না।
 সন্তানের সুখপানে চাহিলে স্ত্রীবিরোগশোক উৎখলিয়া পড়ে, প্রাণ পাগল
 হইয়া উঠে, নয়নঅঙ্গে বুক ভাসিয়া যায়। সমস্ত সংসার তিনি শূন্য
 দেখিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকটা দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। পরনে
 যখন উপবেশনে কেবল প্রিয়তমার মূর্ত্তিই মনে পড়িত।

শোকের প্রথম আঘাত কোনরূপে সংবরণ করিয়া একটু স্থির হইলেন। তখনস্তর ভবিষ্যৎ জীবন গৃহত্যাগী ভগবীর ন্যায় অভিযাহিত করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া, পলাতীয়ে একটি ক্ষুদ্র উপবন ছিল তথায় এক কুঠীর বাঁধিয়া উদ্ভেদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু একবার তখনে বহির্ভাগে ভোজন, দৈনিক বসন পরিধান, জপ তপ সত্যা আত্মিক, নীতি, জ্ঞানমত যোগবাণীত অধ্যয়ন, ধ্যান চিন্তা ইত্যাদি নিয়মে কালাতিপাত করিলেন। চুল বাড়ি রাখিলেন, কক্ষ বানবশতঃ চুলে ক্রমে জটা বাঁধিতে আরম্ভ হইল। ঠিক এক জন প্রকৃত বোগী সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যেরে কেবল একা রামমণি পিসী বস্তু, অস্ববিধা; তিনি সংসারভার সমস্ত বহন করেন, বাহ্যারামকে দেখেন শুনেন। পতিপুত্রহীন বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়াও তিনি সংসারভারে আক্রান্ত রহিলেন। নীতাপাঠক জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে এরূপে নিজায় ভাবে সংসারের কঠোর কর্তব্য প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে সক্ষম হন না। তিনি বৈরাগী হইয়া সকলকে বৈরাগ্যা-নলে বদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু হিন্দুর বিধবা পরের সুখে সুখী, সে উহার প্রেমিক বৈরাগিনী। ভগবান্ ক্রী প্রকৃতিকে এমন এক আশ্চর্য উপায়ে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ হিন্দুর বিধবাকে, যে সে সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াও বর সংসার করিতে পারে। আত্মীয় অন্তঃকরের সুখে তার সুখ। সে সকলের সেবা করিয়া নিজে উপবাসী থাকিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত গৃহকার্য সম্পন্ন করে। ইহাই তাহার প্রকৃত, সুতরাং ইহাতে অপেক্ষাকৃত সে সুখী।

রামমণি পিসী সংসারের স্রষ্টা বিশৃঙ্খল ভাব আর সহ করিতে পারিলেন না। ভাতৃপুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁধিতে লাগিল। “আহা! মাতৃহীন বাহ্যারামের আমার কোন কিনারা হইল না! বর সংসার সব পাঁধারে ভাসিয়া গেল। বাছা আমার মনের দুঃখে কাঁদাছা মনে কঁদা কঁদ না, ভাল ধার না, ভাল পরে না, কেবল কেতাবে দুখ শুঁকিয়া পড়িয়া থাকে।” এই ভাবিয়া তিনি এক দিন সেই পলাতীয়েই উঠিয়া পিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় পিয়া ভাতার সন্ন্যাস বেশ ধারণ করত

তাঁহার শোক দুঃখ আরও মহাধেয়ে উধলিয়া উঠিল। স্ত্রীজাতি আপনি অনায়াসে সন্ন্যাসিনী হইয়া সকল শ্রম বিলাস ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়পণের নিরামিব ভোজন বৈরাগ্য ত্যাগস্বীকার সহ্য করিতে পারে না। আপনি ব্রহ্মচারিণী হইয়াও সে আত্মীয় গ্রন্থ জনের নিমিত্ত মৎস্য মাংস রন্ধন পরিবেশন করে। ভ্রাতার বৈরাগ্য বেশ দেখিয়া তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। অণ কাল পরে বনমালীকে অতি কাঁড়র ভাবে বলিতে লাগিলেন, “হ্যাঁরে বনমালী, এই কি তোর ধর্ম! আচ্ছা, তুমিই না হয় সন্ন্যাসী হইলে, কিন্তু হৃথের ছেলে বাহারামকে কেন পাঁধারে ভাসাইবে? তোমার না হয় বরস হইয়াচে, ধর্ম কর্ত্ত্ব নিয়ে আছ, থাক; বাছাকে আমার কেন পুথের ডিখারী কর? আহা সে বে মা বাপ বিনে ভেসে ভেসে বেড়াকে। ছেলে আমার তিন চারটে পাস দি়েছে, হুদিন পরে চাকরি করে টাকা আনবে, কত সাধ আচ্ছাদ করব, বিয়ে ধা দেব, বিধাতা তাতে বাধ সাধলেন। এখন তুমি এক কাজ কর, ছেলের একটা বিয়ে দেও, দ্বি়ে ঘর সংসার বজায় করে তার পর আপনি বা ভাল যোগ্যতা করণে। বল্লে তো শুনবে না, তোমারই কি এ বয়সে এতল করা সাজে? আপনি বিয়ে করবে, ব্যাটার বউ নিয়ে সুখে ঘর সংসারে থাকিবে, দ্বি়ি আনোহ আচ্ছাদে ক্রিয়া কর্ত্ত্ব হবে, সব একবারে কেঁদে দিলে। তোমাকে আর বলিয়াই বা কি হবে, সকলি বিধির বিড়-ঘনা। এখন বা বল্লেন তাহা বহি ইচ্ছা হয় কর। আমি এখন বাঁচী বাই, ঘর করা যেটিরে গেল দেখিণে।” কি চমৎকার খার্বখীন জায়া। রামমণির চরিত্র দেখিলে হিন্দুর গৃহে যে বিধবা সন্তানহীন বৃদ্ধীর জন্য একটা উচ্চতর পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা নিলিপ্ত নিকাম সাংসারিকতা।

বিধবা ভগ্নীর নিখার্ব মেহের কথাগুলি বনমালীর প্রাণে বড় লাগিল। পুত্রের নিরাজয় অবস্থা শ্রবণ করত তিনি নিজেও কিছু মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, “সত্যই ত বটে, সন্তানকে কেন আমি পাঁধারে ভাসাইব? তাহার একটা কিনারা করিয়া আমার দেওয়া নিতাই উচিত হইতেছে। হুদিকা আর বিবাহ, এই দুইটা পিতার

প্রধান কার্য। এটা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি, অবশিষ্টটাও করিতে হইবে। আর বাস্তবিকও একথা ঠিক, বাহারাম যদি গৃহধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমার বৈরাগ্য রক্ষা পাইবে না। অশুভ্যে ঘেঁহের স্বাভাবিক ক্রিয়া কি আমি অত্যুৎকরণ হইতে সহজে দূর করিতে পারিব? তাহাতে বোধ হয় না। সুতরাং ইহাতে আমার উপসার বাধাত জন্মিবে। সংসারের সকল বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিত্ত মনে সাধন ভজন অবলম্বনই প্রেরণ। ভয়ীর কথা আমি উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আর এ সাধন ভজন যোগ উপস্যাওত দুই পাঁচ দিনের কর্ম নয়, অনেক কাল ইহা লটয়া থাকিতে হইবে; তাহার ভিতর কত উৎপাত ঘটতে পারে কে জানে? অতএব সে সকল ঝড়ট মিটাইয়া ফেলাই ভাল।” এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কিছু দিনের জন্য উপোষন পরিত্যাগ পূর্বক তিনি পুত্রবধূর অবেশণে বাহির হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ঘটনাচক্র ।

বনবাণী প্রথমে বসন্তপুর গ্রামে আপনায় স্বভার ভবনে গিয়া উপস্থিত হন। আহার পরিচ্ছদ, সাধন ভজন, অপ তপের যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন তদনুসারে চলিতে লাগিলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া সংসার সম্বন্ধে এক কালে নিশ্চিত্ত হইয়া বৈরাগ্যধর্ম পালন করিবেন এইটা আন্তরিক অভিপ্রায়।

বসন্তপুর একটা ভদ্রগ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ সজ্ঞানের বসতি। নিশানাথ বন্যোপাধ্যায় বনবাণীর সম্বন্ধী ভবায় বাস করেন। নিশানাথ সংস্কার, স্ত্রী বধ্য, প্রসঙ্গতা, সুলভা এবং প্রভাপশালিনী। তিনি হিন্দু আচার ব্যবহারের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী। হৃষ্টি ধানি নিরেট চাঁচা ছোলা। আলুতাপরা ছুইধানি পায়ে বিন পঞ্চাশ তরি রূপায় ডায়বলকাটা গোল

গোল দুই গাছা মল, হাতে সোণার বাউটি ও দুই গাছি তাগা। কানে চোঁড়ি কুম্ভো, গলায় এক গাছি বড়া হার। মাথার সিঁতিতে টাক পড়িয়া সে স্থানটী রান্নাঘরের মত প্রশস্ত হইয়াছিল, তাহাতে তেল সিন্দূর পোতা পাইত। মাছটী ইঁহীর নয়নতারা, তারি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। নারেব গোমস্তা দরওয়ান চাকরদের ধমক দিতেন, বাড়ীর খরচ পত্র তাহার হাতে থাকিত। নিশানাঘের উপর বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। তিনিও ইঁহাকে গুহ্য করিয়া চলিতেন। সত্তানাহি না-হওয়ার এবং পুরুষোচিত কার্য্য করার তাহার প্রকৃতি কতকটা পুরুষের মত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীনা শান্তডী ঠাকুরাণী তাহার ভয়ে কাঁপিতেন।

নিশানাঘ বাবুর বাড়ীটী প্রশস্ত এবং দুই তাল, চারি দিকে স্থান অনেক; পুকুরিণী বাগান অন্তর ও বাহির বাটী লইয়া বোধ হয় বিশ বিঘার কম হইবে না। বাহির মহলে পূজার দালান, তাহার সম্মুখে একখানি আটচালা। তৎপাশ্বে বৈঠকখানা ও কাছারি ঘর। পন্নী-গ্রামের অমিহার, তাহাতে আবার এজমালির সম্পত্তি, ঘর দ্বার প্রাক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দ্রব্যাদি সকল সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন থাকিবে আশা করা যায় না। উঠানে কোথাও জালানি কাঠের রাশি, কোথাও দুই চারিখানা ভাঙ্গা পাক্কী; এক কোণে অতিথিদিগের পরিভোক্ত উচ্ছিষ্ট পাতা ও হাঁড়ি সরার স্তূপ, অপর কোণে দুই চারিটা গোক বঁধা। আটচালার ভিতর এক দিকে গ্রাম্যদেবতাবৎ বৃদ্ধ বীড় বঁড়াইয়া স্থাপিত সরনে অতি প্রশস্ত ভাবে রোমস্থান করিতেছেন, আরখানে দুই পাঁচটা কুর্খান্ন অধিক্ষিত অসভ্য কুকুর অলস কুটুপদিগের ভ্রায় দিবানিত্যের বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে। তাহারা যে কেবল সেখানে শুইয়া থাকে তাহা নহে, কঠিন বৃত্তিকান্নব্যাকে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঘূলার পুঁথি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। আশে পাশে কোথাও সামিয়ানা, কোথাও গুঁড়ী, কোথাও নিশানের ছড়, কোথাও প্রতিহার কাঠামো। এ সকলে বাবুদের জ্ঞান গমনা-গমন নাই, কেবল পূজা পার্জনের সময় তাহারা আসেন। তাহার কিছু পূর্বে পুরাতন বেওয়ানজী মহাশয় একবার ভদ্রারক করিয়া বান। দালানের দক্ষিণ পাশে বাস্ত বেগুত কুটুপদের ঘর; সেখানে দুই চারি জন পিলুত

ভাইয়ের মানা, মানাত ভাইয়ের পিসে, বুড়তত সম্বন্ধী, মাসীমাতের বেওর, মামাখন্ডর ইত্যাদি নিয়তই বিরাজ করেন । তাঁহাদের কাছের মধ্যে ভামাকু সেবন, আর নিজা, আর মাকে মাকে বাবুদের বৈঠকখানার এক কোণে বসিয়া থাকে । পাশা কিম্বা ভাস খেলিবার সঙ্গী না জুটিলে তাঁহাদের অস্তিত্ব কিছু কাছে লাগে । ইহারা কুটুম্বের কুটুম্ব । জমিদার বাবুদের বাড়ীটার কোথাও চুপ বালি বাসিয়া পড়িতেছে, কোথাও জল বসিয়া জাভা ধরিয়াছে, কোথাও বা অখণ্ড গাছ বাহির হইতেছে, কোথাও কোরের নীচে গছ-গোফুলা এবং ভোঁদড়ে বাসা করিয়াছে, কেহই সে বিষয়ের তত্ত্ব লইবার লোক নাই ।

নিশানাথ যে অংশে বাস করিতেন তাহা বেশ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, সুসজ্জিত । তিনি প্রায় বাড়ীর ভিতরেই থাকিতেন, এবং অন্যের পাশে আপনার বৈঠকখানার বসিয়া পড়া শুনা করিতেন । কোন ভদ্র লোক বেড়াইতে আসিলে তাঁহারই কাছে বাইত, এবং থাকিত । গৃহসংলগ্ন গুল্পো-দ্যানটী তাঁহারই স্নকৃতির পরিচারক । বর্তমান সভ্যতার নিয়মে তিনি থাকিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু নয়নতারার স্ত্রী ভাইয়ের দৌরাশ্রয় সম্বন্ধ পারিয়া উঠিতেন না । বাড়ীতে একটি অনাথা কন্যা থাকে, তাহাকেই সম্ভান নির্বিশেষে দুই ভনে পালন করেন । কন্যাটী নিশানাথের পত্নীর ভগ্নীর হুঁহিতা । তারিনের বাপারাম কালেজের ছুটির সময় এখানে আসিত এবং দুই এক মাস থাকিয়া বাইত ।

বনমালীর স্ত্রী বিরোধ ঘটিলেও খন্ডর বাড়ীর আদর বহু কিছু কমে নাই । আমাতাকে তাদৃশ সম্মান্য বেশে দর্শন করিয়া নিশানাথের হাতা কাঁদিতে লাগিলেন । একে কন্যার সূত্ৰাশোক, তাহার উপর আমাতার উদাসীন হৃদয়, হুঁহে মিশিয়া তাঁহার শোক সম্ভাপ দিগন্ত করিল । পরলোকগতা হুঁহিতার নাম ধরিয়া কত জপ কাঁদিলেন । তাঁহার রোদন শুনিয়া বনমালীর চক্ষেও জল আসিল । অনন্তর শান্তকী ঠাকুরাণী তাঁহার প্রতি বধাযোগ্য আদর বহু প্রকাশ করিলেন, আসনে বসাইয়া জল বাইতে দিলেন । পরে বনমালীর যে অন্য তথায় আগমন তাহাযে শান্তকী সম্বন্ধী এবং বাড়ীর কত্রীর সহিত অনেক কথা বার্তা হইল ।

বেলা অবসান প্রায় হইয়াছে, অস্ত্রপুর মধ্যে এক নির্জন গৃহে সন্তো-
ষিনী একাকিনী বসিয়া এক ধানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থ পড়িতে
বসিয়াছেন বটে, কিন্তু সে দিকে মনোযোগ নাই। সুতরাং যাহা পড়ি-
তেছেন তাহার অর্থ স্থূলভঙ্গ হইতেছে না। মনের ভিতর অন্য এক
চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে। বোধ হয় বনমা-
লীর তথ্য আগমনের উদ্দেশ্য তিনি ভুলিয়াছিলেন। এই অন্য চিন্তের
গতি অতি চঞ্চল। কেন না, তিনি বাধ্যতে আসক্ত তাহারই বিবাহের অন্য
চেষ্টা হইতেছে। এই রূপ চিন্তাবিক্ষিপ্ত মনে গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত আছেন,
এমন সময় চপলা হুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চপলা বলিল, “ভয়ী,
অত পড়ে শুনে আর কি হবে? স্ত্রীলোকের বিবাহগত প্রাণ, স্বামীর
সোহাগ না পাইলে সে জীবন বিকসিত হয় না, অধিক পড়া শুনার কেবল
উপরের পীড়া অশ্রু, শরীর শুকাইয়া যায়, ভেবে ভেবে মাথা ঘোরে, চুল
পাক, নানান রোগে ধরে; এ বিষয়ে আমি এক জন ডুকৃতভোগী। স্বামীর
শান্তিগ্রন্থ শীতল ছায়ার বসিয়া আশ্রয়ী হইলে তার পর এ সকল পড়া
শুনা ভাল লাগে। তখন পাঠ্য গ্রন্থের মর্মও বুঝা যায়, তত্ত্ব সকলই
অনুকার। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কেন বঙ্করামের বাপের বিবাহ হউক না।
দেখিতেও বেশ হুন্দর পুরুষ, বয়সও তেমন কিছু বেশী বোধ হয় না।
দোজবরে ভিন্ন তোমার কপালে কি আর ভাল জুটবে? কত দিন আর এ
বৈধব্য বরণ সহ করিয়া থাকিবে? আহা! ভয়ী, তোমার কষ্টের কথা
মনে হইলে আমার কান্না পায়। কুলীনের বিবাহের বড় কষ্ট”

সন্তোষিনী একটু যুহু হাস্য করিয়া বলিলেন, “দ্বিধি, তুমি আপনিই যে
সব কথা মীমাংসা করিয়া লইলে? আমি যে বিধবা তাহারই বা প্রমাণ
কি? আর দ্বিধি বা বিধবা হই, তাহা হইলে হিন্দু সমাজে পুনর্বার বিবা-
হের সম্ভাবনা কোথায়? শুন নাই কি, এই হুংখে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিধা
পাত করিয়াছেন? তাহার চক্ষে জল দেখিয়া কি দেশের লোক কাঁদিল?
এ হতভাগ্য হিন্দু জাতি উৎসন্ন থাকিবে, পাণ্ড্রোতে দেশকে ডুবাইবে,
তথাপি বিধবার হুংখে কর্ণপাত করিবে না। বঙ্করামের পিতা বিবাহ
করিলেন এ কথা তুমি কোথায় শুনিলে? উনি যে পুত্রের বিবাহের জন্য

দেখিতে আসিয়াছেন । তাও বটে, আর উনি যে এখন গৃহভাগী সমানী । দেখে নাই কি, কেমন ঘনি ভগবীর মত গেরুয়া কাপড়পরা, চুল বাড়ি রেখেছেন, নিজ হাতে রেঁধে খান । এমন ধার্মিক লোকে কি আর হুবার ডিন বার বিয়ে করে ? বিশেষতঃ যে স্ত্রী তাহার মারা গিয়াছেন তিনি বড় সতী লক্ষ্মী ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এখনো ওঁর বুঝ আছে । প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম চিরকালের অন্ত, দেহের বিচ্ছেদে তাহার অন্ত হয় না, যেসো মহাশয়ের কাছে আমি শুনিছি । সে প্রকার প্রেম কাহারো সঙ্গে একবার বন্দি হয়, তাহা ভুলিবার ক্ষমতাও থাকে না । তাহাতে এক জন আর এক জনের সঙ্গে একবারে মিশিয়া অন্তঃস্থ হইয়া যায়, এ কথাও আমি কত পুস্তকে পড়িয়াছি ।

চপলা বড় মুখরা এবং চতুরা, বসমাণী যে পুনরায় বিবাহ করিবেন না, কি করিতে পারেন না, ইহা তাহার মনে লাগিল না । সে দাড়াবিক সংস্কারের গুণে বলিল, “ভাই, পুস্তকই পড়, আর উপদেশই শ্রবণ কর, আমি ও সব অনেক দেখিছি । শাসানবৈরাগ্য উপস্থিত হইলে দুই পাঁচ দিনের জন্য একরূপ অনেকে করিয়া থাকে । কিন্তু মনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনার কি স্বভাব কখন বদল হয় ? তা হয় না । কোন কোন লোকের কথা শুনা যায় বটে, তাহার কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একবারে নূতন জীবন পাইয়াছে, কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটে না । আমি বলছি, তুমি দেখে নিও, উনি আবার বিবাহ করিবেন । আমি ওঁর চেহারায় দেখেই তা বুঝতে পেরিছি । আর নাই বা করিবেন কেন ? ভবের বাজারে বৈরাগ্য কি এতই সস্তা ? সংসারের অবস্থাও বেশ বদল, বয়সও আছে, তাহা ছাড়া বাড়িতে অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই যে সেবা ভক্তি করে । তোমার সঙ্গে হটক না হটক, অনেকে উইাকে মেয়ে দিবার অন্ত সাধা সাধি করিবে । আমার ইচ্ছা যে তোমার সঙ্গে হয়, তপবান্ আমাদের বল বৃদ্ধি করুন ।”

চপলা উঠিয়া গেলে সন্তোষিনী ভাবিতে লাগিলেন, “আমিত কেবল বাহ্যিকভাবেই বাহ্য করি, অন্ত কাহারো সহিত বিবাহ হটক না হটক, সে অন্ত কোন হুং নাই ।” কিন্তু আমার বাহ্য কি পূর্ণ হবে ? বাহ্যিক

হিন্দু পরিবারস্থ কুলীন সন্তান, তাতে বি, এ, পাস করা। আমার এ আশা নিতান্ত দুর্গাশা বলিয়া মনে হইতেছে। যদি আমি সধবা বলিয়া প্রমাণিত হই, তাহা হইলেও বিবাহের পথ একবারেই বন্ধ। আর যদি বিধবা হইয়া থাকি, তাহেই বা আশা কোথায়? মাসী মায়ের বেকার পুত্রের প্রতাপ, যেসো মহাশয় কি এত দূর সাহস করিতে পারিবেন? কোন দিকেই আর কুল কিনারা দেখা যায় না। বাহা হউক, আশাতেও তবু অনেক শ্রম আছে। আমার মন এ শ্রমের আশা ছাড়িবে না। ছাড়িয়া কি লইয়া থাকিব? সে বার যে তিনি কত বড় আশ্রয়ের সহিত আমাকে চাপাফুল পাড়িয়া দিয়াছিলেন সেটা কি ভালবাসার চিহ্ন নয়? যে পর্য্যন্ত না আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম ততক্ষণ তিনি সেই গাছ তলাতেই ছিলেন, এবং ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘আর কি কুস চাই?’ ইহাতেও আমার প্রতি যেন তাঁর একটু বিশেষ টান বুঝা যায়। যদি কখন সুযোগ ঘটে আমার মনের তাব তাঁর কাছে প্রকাশ করিব। প্রকাশ করিবই বা কিরূপে তাওতো বুঝিতে পারি না। দেখি, কোন ছলে কৌশলে আকার ইঙ্গিতে আমি আমার মনের তাব প্রকাশ করিতে পারি কি না। গোপনে গোপনে জ্বরের সঙ্গে জ্বরের আলাপ পরিচয় কি হইতে পারে না?”

পাঠক মহাশয়েরা বুঝিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, বাহ্যারামের প্রতি সন্তোষীকৃত ভালবাসাটা এক তরফ। কেন না, বাহ্যারাম প্রতি তিনি মনে মনে এত আসক্ত তাহার জ্বরের প্রেমকুসুম এখনো পর্য্যন্ত একটুটু হয় নাই। বাহ্যারাম চিন্তাশীল এবং অধ্যয়নশীল যুবা, এত দিন সঙ্গীকার পাঠেই অধিকাংশ মনোযোগ সমর্পিত ছিল। অন্য কোন আমোদ প্রমোদ রস বিলাস তিনি আনিডেন না; আমোদের মধ্যে কেবল প্রকৃতির শোভা সম্বর্ধন, নির্জনে একাকী চিন্তা ও ভ্রমণ, ইহাই ভাল লাগিত। লোকসঙ্গে অবস্থান, লোকচরিত্র অধ্যয়ন, মানবজীবনের সৌন্দর্য্য বর্ণন, কি সামাজিকতার উৎকর্ষ সাধন এ সকল বিষয়ে আদৌ তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। থাকিবার মধ্যে কেবল এইটি ছিল, যে বড় বড় লোকের জীবনচরিত্র মধ্যে মধ্যে পাঠ করিতেন। সেও বাহ্যারাম বাহ্যারাম বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন জ্ঞানী পণ্ডিত অদৈবতবাদী তাহাদের; তাদৃক প্রেমিক বিদ্যাসী তজের মধ্যে।

সুতরাং সন্তোষিণী আপন মনে কি ভাবিতেছেন, কি করিতেছেন তাহার সংবাদ কে লয় ? তিনি যে ভালবাসার চিহ্ন দেখিয়াছেন মনে করেন, সে কেবল তাঁহার নিজের অমুরাগপ্রসূত কল্পনার কুহক মাত্র। স্বকপোল করিত কল্পনার বত কিছু প্রিয় সামগ্রী ছিল তাহারা তিনি বাহ্যারামকে সাজাইয়া একটা আদর্শ প্রতিমা রূপে তাহাকে জ্বরসিংহাসনে বসাইলেন। দিনের পর দিন জ্বরভাষ্যের বত নব নব অমুরাগ আশা পিপাসার ভরক টেবলিত হইতে লাগিল, তৎসমুদায় ঐ মানসপুতলিকাতে তিনি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। নবীনা রমণীর প্রণয়লালসার অদম্য প্রেমাঙ্কুর কে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে ? সে গভীর রাজ্যে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। প্রাণের নিভৃত নিলরে বসিয়া সন্তোষিণী বত পারিলেন বাহ্যারামকে সাজাইলেন, আপনি আপন মনে কত ভাবে কত আশার খেলা খেলিলেন, আদরের ধনকে আদর করিতে লাগিলেন ; বালিকার খেলনা পুতুলের প্রতি যেমন করে তেমনি করিলেন। ঘটনালেখক এবং পাঠক ইহাকে কল্পনা মাত্রা বপ্ত পাপলামি বাহা ইচ্ছা বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু প্রেমপিপাসু সুবতীর পক্ষে এ কথা খাটে না। সে কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া সুখী ; কেবল সুখী নহে, তাহার উপর ভবিষ্যতের সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়া সে নিত্য নব নব রসোদ্রাসে উন্মত্ত হইয়া

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মুনিবাক্য মতিভ্রমঃ ।

পর দিবস নিত্যকৃত্য সমাধায়ে বনমালী রত্ননকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, নিশানাতের পরী আহাৰ্য্য বস্তুর আয়োজন করিয়া দিতেছেন, শাক্তী ঠাকুরাণী কপাটের আড়ালে বসিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাবা, আমার গোড়া কপাল পুড়ে গেছে, পূর্ব জন্মের পাপের ফল কে আর ধোবে ? আ বা হইবার হইয়াছে, এখন বাবা, তুমি

কি এইরূপ সন্ন্যাসীর বেশে বেড়াবে? আমি বেঁচে থাকতে এটা চক্ষে দেখতে পারব না। আমার একটা ছেঁগরকি আছে, বয়েসেও বেশ শেরানা, বিবাহের যোগ্য বটে, আমার বড় সাধ, সে মেয়েটিকে তোমার হাতে দিই। যে মেয়ে আমার মরে গেল তাকে আরতো পাব না, কিন্তু তোমার মত জামাই কেন আমি হারাব? বাবা, এ অমুরোখটা শোন, আর এমন করে বেড়িও না, বাতে ঘর সংসার বজায় থাকে তা আগে কর, নৈলে মনে বড় কষ্ট পাই। বাহ্যারামের বিয়ে পরে দিও, আগে ঘর বজায় কর। আহা! আমার কি হুঃখের কপাল। মেয়ে আমার ব্যাটার বউ ছেঁখে যেতে পারলে না, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই বিদেশে প্রাণটা হারালে!” এই বলিয়া তিনি সেই পরলোকগতা কন্যার উদ্দেশে হুই এক কোটা চক্ষের জলও ফেলিলেন। নিশানাথের পত্নী নয়নতারা দেবীর এ প্রস্তাবে সহানুভূতি ছিল।

বনমালীর মন উদ্বাস, ধর্ম্মসাধনে সর্ব্বদা অমুরক্ত, অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি জলিতেছে, সাক্ষী পতিরতা সহধর্ম্মিণীর বিরোগ শোকের নিদারুণ মর্ম্মবেদনা তখনো পর্য্যন্ত সম্যক উপলব্ধিত হয় নাই, তন্নিম্ন গত কয়েক মাস নির্জনবাস এবং গীতা ভাগবত যোগবাসিষ্ঠ পাঠের ফলে সংসারটা যে ক্রমাগত রুগ্নাত্তর অবস্থাত্তর হইয়া সরিয়া সরিয়া বাইতেছে এ জ্ঞানটা বড় উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই জন্য বুদ্ধা শোকাভূরা শান্তড়ীর প্রস্তাব মনে স্থান পাইল না। তিনি আপনার ভাবে ভোর হইয়া রাঁধিতে লাগিলেন, কোন কথা উত্তর দিলেন না। প্রস্তাবটা যেন পাখীর মত ছুঁইয়ের উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার দাগ ভিতরে বসিল কি না, কেহ জানিতে পারিল না।

বনমালী বাবুর এই বর্ত্তমান বৈরাগ্য বেশ বহিঃ আত্মীয় প্রিয়জনের শোকউদ্বীপক, কিন্তু হেঁচিতে বড় সুন্দর। লাড়িগুলি কঁচাচর পাকার মিলিত, বেশী লম্বা নয়; পায়ের বর্শটা বেশ পরিষ্কার গৌর বর্ণ, বেহু ধানি ছোট পুট এবং তাহাতে বৈরাগ্যের পবিত্র গন্ধ। খুব মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে বুঝে কিকিৎ শোকের কালিমা যেন নয়নগোচর হয়, কিন্তু সে খুব নিভাস্ত নিরাশাঙ্ককারাঙ্কর অপ্রসন্ন নয়, বরং হঠাৎ হেঁচিলে অতীব প্রসাদ

বলিয়াই বোধ হয়। গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ, চিরকাল টানা পাখার বাতাসে আফিসে বসিয়া কেবল কাজ করিয়া আসিয়াছেন, প্রচণ্ড রোদ্ভোতাপ কিম্বা জলসিক্ত শীতল বত্স বায়ুর কঠোর আঘাত কখন সহ্য করিতে হয় নাই; শরীর চিরকাল ধর্মপন্থীর সেবা শুশ্রূষার অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই ছিল। এক্ষণে ইহাতে আর এক প্রকার সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নির্মল দেহ কাঁড়ির উপর গৈরিক বসন, মুখমণ্ডল তপস্যার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, চক্ষুর দৃষ্টি অত্মমুখী, ধীর পাদবিক্ষেপ, মৃদু বাক্য, দর্শন মাঝেই মনে প্রভাব সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ বিলাসবাসনোন্মত্ত সংসারাসক্ত জন-সমাজে একরূপ প্রিয়দর্শন দ্বিবালাবণ্য সাধু পুরুষের দর্শন অতীব সুহৃৎ ; ইহার প্রভাবে মানবের মাস্তাবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

বনমালীর শান্তডী যে দেওর স্থির অন্য বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেটী তাঁহার বড় অমুগত, এই অন্য মায়ী এত বেশী। বনমালী পুত্রের বিবাহের জন্য তখন ব্যস্ত, সুতরাং মনে মনে ভাবিলেন, “বহি মেয়েটী সুন্দরী হয়, তবে একবার দেখা বাউক।”

এই স্থির করিয়া কন্যা দেখিতে গেলেন। কুলীনের মেয়ে, একটু শেরানা হইয়াছে, দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দরী, গৌর বর্ণ, রক্ষীন বসন, তাহার উপর স্বর্ণালঙ্কার, নারীদোষনের সঙ্গে এই তিন বন্ধন মিলিত হয়, তখন রূপভূষিত চক্ষু আর মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। ভিতরে কি আছে না আছে মন তখন তাহা দেখিবার অবসর পায় না। দর্শন মাঝে চক্ষুর উপর বাহিরের উজ্জ্বল ছবি ধানি মুদ্রিত হইয়া যায়। এ কাকট্য বিচার চিন্তা গবেষণার উপর তত্ত নির্ভর করে না, অজ্ঞাতসারে ইহা মানব-চিস্তে আপনার অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে। ইহা এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া, মানুষকে ইহাতে একটু ভাবান্তরিত করিয়া বেলে; বিশেষতঃ যেখানে পুরুষ প্রকৃতির মিলন, সেখানে একটা অজাবনীর হৃদয়মনীয় কার্য সম্পাদিত হয়। হৃৎকের সহিত বলিতে হইতেছে, ব্রতধারী ত্যাগী সংব্রতমণা বনমালী এই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন, ঠিক যেন বালির বাঁধের নিম্নে একটু বন্যার জল প্রবেশ করিল, স্বর্ষ্যপ্রতি নিমেষের মধ্যে শিথিল হইয়া গেল, জীবনের মূলে আঘাত

লাগিল। এ সকল কার্য এত শীঘ্র আরম্ভ হয় যে লোকে সহসা ধরিতে পারে না। প্রত্যেক কার্যই এইরূপে অলক্ষিত ভাবে প্রথমে আরম্ভ হইয়া থাকে। মানসিক যৌর আন্দোলনের মধ্যে ইহার কার্য প্রথম আরম্ভ হয়, এই জন্য আসল ব্যাপারটা কি তাহা সহসা লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরিণামে তাহা মূর্তিমান আকার বধন ধারণ করে তখন বুঝা যায়। এমন অবস্থায় বুঝা যায় বধন আর তাহাকে ডাড়াইবার কোন ক্ষমতা থাকে না।

বনমালী মায়ার কাঁধে পড়িয়া গেলেন। শান্তডীর প্রস্তাবটাই তখন মনে সর্বপ্রায়ে উদ্ভিত হইল। যে সময় প্রস্তাব প্রথমে শ্রবণ করেন তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, বুঝি বা কথাটা ভাসিয়া গেল, হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পাইল না; বাহ্যাবস্থা দর্শনে এরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহা একবারে ভাসিয়া যায় নাই, হৃদয়কে স্বেচ্ছা স্পর্শ করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া এক্ষণে মস্তক উত্তোলন করিল। তখন বনমালীর মনে এই যুক্তির আবির্ভাব হইল যে, “শোকাভুরা স্বর্গ ঠাকুরাণীর অনুগোণ উপেক্ষা করাটা কি ঠিক? অন্যান্য যুক্তিও আসিয়া জুটিল। ইচ্ছা দেখানে প্রবল প্রযুক্তির অধীন, দেখানে আর যুক্তির অভাব কোথায়? পুত্রের জন্য অপর স্থানে পাত্রী অন্বেষণ করিব, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আপনি পুনর্বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কন্যার অভিভাবকদ্বিগকে মনের কথা তখন ভাসিয়া বলিলেন না, বলিলেও তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না। বাহা হউক, মনের ভাব তখনকার জন্য গোপন রাখিয়া সেই বাড়ীতে আর একটি অনুঢ়া বালিকা ছিল তাহারই সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অভিভাবকদ্বিগের যে একটু আপত্তির সম্ভাবনা ছিল তাহা ইহাবারা খণ্ডন হইয়া গেল। কেন না, তাহার। সামান্য কথাবার্ত্তা আর একটি কন্যা দিয়া বাহ্যারামের মত উৎকৃষ্ট জামাতা লাভ করিল। বনমালী ইহাতে লাভবান হইলেন। হৃদয়ী স্ত্রীরও এবং কিছু নগদ টাকা পাইলেন। কন্যাটী বাহ্যারামের মনোনীত হইবে কি না, সে বিষয় ভাবিবারও আর তখন তাহার অবসর রহিল না। বাস্তবিক মেয়েটী বিবাহের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বয়স কম, নিভাত ক্রমাকী, মাথার চুল নাই, বর্ণ বহিঃ কাল

নয়, কিন্তু সৌন্দর্যের বড়ই অভাব, পেটে বোব হয় এক আণ্টু পিলেও ছিল। বনমালী যদি নিজের বিবাহের অশ্রু ব্যস্ত হইয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে এরূপ পাত্রীর সহিত খাঁয় পুত্রের বিবাহ দিতে কখনই পারিতেন না। এক্ষণে পূর্বোন্নিবৃত্ত বয়সে হৃদয়ের প্রতিমূর্তি তাঁহার মনে আগিতেছিল, সুতরাং এ দিকে আর বেশী দৃষ্টি রহিল না। সেই মেয়েটিকে পুত্রের জন্য রাখিয়া প্রথমটি আপনি বিবাহ করিলেন।

বনমালী বাবু এ কাজটী ভোমার পক্ষে বড় ভাল হইল না। আপনিও একটা কুদৃষ্টান্ত দেখাইলে অধিকন্তু পুত্রের ভাবীসুখের পক্ষে চিরকালের অশ্রু কটক রোপণ করিলে। নিজে তুমি পুনর্বার এ বয়সে বিবাহ করিয়া যদি সুখী হইতে চাও হও, কিন্তু ভোমার বিবাহযজ্ঞে নির্দোষ মেঘ তুল্য সন্তান বাস্তবামকে কেন তুমি বলিধান করিলে? কলতঃ বনমালী বড় হুর্জলতার পরিচয় দিলেন। আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শান্তির আশায় বঞ্চিত হইলেন। বৈদগ্ধ্য সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাহার বিপরীত কার্য করিয়া বসিলেন। এমন কার্য্য করিলেন যে না করিলে কিছুতেই আর তাহা হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। পাঠক মহাশয় এখানে শিকা করুন, এক বার বন্ধন শিখিল হইলে মানুষ কোথায় গিয়া শেষ বঁড়ায়। সাধনের অপরিপক্ববয়স অন্য দিকে একবার যদি মন পেল, তবে জানিবে যে আর তাহাকে পূর্ব স্থানে সহজে কিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বনমালী সেই বে-ভাগী রামমণির প্ররোচন বাক্যে সন্তানের ভাবীসুখের আশায় মোহমস্ত হইয়া পড়িলেন, ইহাই তাঁহার পতনের মূহুর্ত্ত পক্ষে প্রথম পদ নিক্ষেপ হইল; তার পর বাহা বাহা ঘটিল সকলেই দেখিতে পাইলেন। এইখানেই শেষ হয় নাই, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, চর্য্যপাত্রে বাধ একটী মাত্র ভিজ থাকে, তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত জল বিনিঃসৃত হইয়া পড়ে। মনের বন্ধন ঠিক তেমনি, এক স্থানে একটু আলগা হইলে ক্রমে সমস্ত বুলিয়া যায়। ধারণা শক্তি আর আদৌ থাকিতে পার না। চপলা হৃদয়ী চকলা নারী, কিন্তু সে বাহা বলিয়াছিল ঠিক তাহাই ঘটিল। স্রীজাতির স্বভাব এ বিষয়ে মুক্তির হুর্জলতা কেমন যেন আপনা আপনি বুঝিতে পারে। ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দাম্পত্যপ্রেমপীড়ন ।

বাথারাম এখন আর বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন। বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া একপে গৃহে বসিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাসাদি তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংসারে পাকিয়াও যেন নাই। যুবা প্রকৃতি বশতঃ সমবয়স্কদিগের সহিত এক আধ বার মিশিডেন এবং তাহাদের নানা রস রত্নের কথা বার্তার কিছু কিছু আমোদও অনুভব করিডেন। কিন্তু সেটা আপনা হইতে আর বড় দিটিত না। অধিক ক্ষণ লোকসঙ্গে থাকিয়া আসার আমোদ কোত্থকে যোগ দান করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। তাহাতে মনে বিরক্তি এবং অশান্তি বোধ হইত। সুবকল সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে বেশী সময় থাকিতে ভালও বাসিত না। তরল চিত্ত চপল মতি অন্তর স্বভাবের লোকেরা পস্তুর চিন্তাশীল নির্জনতাপ্রিয় লোকের সহবাসে বড় কষ্ট পায়। তাহাদের হাস্য পরিহাস বাচালতার যে যোগ দিতে পারে না তাহাকে অরসিক বলিয়া তাহারা ঘৃণাও করে।

বনমালী বড় দিন উদাসীনের ন্যায় ধর্ম সাধনে ব্রতী ছিলেন, নির্জনে বাস করিডেন, তত দিন তাঁহার প্রতি বাথারামের আত্মরিক প্রজ্ঞা ও সহানুভূতি ছিল। যখন তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন সে মনে মনে বীতপ্রজ্ঞ এবং ক্ষুর হইতে লাগিল। পিতা উৎসাহের সহিত বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অথচ যে বিবাহ করিবে তাহার তাহাতে কিছু ব্যয় অনুরাগ নাই, এটা বড় ক্ষুণ্ণের অবস্থা হইল না। বনমালী ইহাতে একটু ভিতরে ভিতরে চটি লেন, হুই একটা শব্দ কথাও পুত্রকে বলিলেন। শেষ আপনিই সীমালী করিয়া লইলেন, “বাথারাম কোন কালেইত আমার সম্মুখে যুব হুটিয়া

কথা কর না, সুতরাং এ সবকে উহার সঙ্গে কি আর পরামর্শ করিব ? আমি বাহা ভাল বুঝিতেছি তাহা করিয়া বাই।”

এরূপ সীমান্তসার যে তাঁহার কিছু গুঢ় বার্ষ ছিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। পুত্রের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া পূর্বেই বধন সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন তখন আর ভাবিবার বা পরামর্শ করিবার পথ কোথায় ? এরূপ হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বিবাহ হইতে হইলে তাহাকে লইয়া একটা পরামর্শ করিতে হয়, ইহা যে বনমালী বুদ্ধিতেন না তাহা নহে ; কিন্তু ইদানীং দ্বিতীয় দ্বারপরিগ্রহের পর হইতে তাঁহার বুদ্ধি কিছু বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

বাহারামের মুখে হাঁ, কি না, কোন কথাই নাই ; পিতা বাহা করিতে বলিবেন তাহা সে নিরাপত্তিতে করিবে তথা জানাই আছে। কারণ, পিতৃবাধ্যতা তাহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। সে ব্রত সে নিজে যেমন দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পালন করিত, তেমনি অন্য পাঁচ জন সহচরকে তদ্বিবয়ে উপদেশ দিত। বাহারা কনিষ্ঠ, অধীন, পুত্র, শিষ্য, ছাত্র, ভৃত্য, বাধ্যতাই তাহাদের পরমধর্ম, এই তাহার সংস্কার। কিন্তু বাধের বিব, অনীতির পরল যেখানে, সেখানে এ বাধ্যতা কত অণু থাকিতে পারে ? স্বভাব অগনি আপনার প্রতিশোধ লয় এবং ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে। বাহারাম মুখে কিছু বলুন, না বলুন, তাঁহার কুর্তিবিহীন বিশ্বাসন, নির্দ্বন্দ্ব রসনা, অচঞ্চল চক্ষু, এবং ঐশাসীনা ভাব এ বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছিল। অবশ্য সে নির্দোষ শিশুপ্রকৃতি যুবা, অকালপক যুবকবিশেষ ন্যায় বিবাহতত্ত্বের নিপুণ রহস্যের ভিতর কখন অবতরণ করে নাই, তথাপি এ বিষয়ে মোটা মুঠি একটা সাধারণ জ্ঞান ছিল। জীবনসঙ্গিনী কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সে বুঝিত। কিন্তু তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সচি ও বিবেচনা শক্তি এখানে হাঁড়াইতে পারিল না। পিতার কর্তৃত্বের পেষণে, আর রাস-মণি পিসীর সাথ আফ্রাবের ভূকানে বাহারামের অস্তিত্ব একবারে উড়িয়া গেল। তাহার মাতৃশোকবদ্ধ হৃদয়, সান্তিরসপিণ্যাত্মক স্বপ্নের আশ্রয় আপনায় ভাব চিন্তা হৃৎস্রব সন্তাপ লইয়া তখন আপনার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে বাহিরে বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

একে অসময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ প্রস্তাব, তাহার উপর আবার আত্মীয় পূর্ববাসী প্রতিবাসীদিগের আয়োজিত কোলাহল, ইহাতে বাহ্যারাম বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন । এ সকল সামাজিক অভ্যাসের উৎপত্তির কোন প্রতিবিধান নাই, বিচার নাই । তাঁর সংবাদ শুধন আর কে লয় ? সমাজচক্রে যখন তিনি পড়িয়াছেন তখন ইচ্ছার হটক, অনিচ্ছার হটক, কাদিয়া হটক, বা হাসিয়া হটক তাহাতে ঘুরিতে হইবে । কোন বন্ধুর ভিতর বহি কাহারো পরিবেশ বসনের কোন এক অংশ জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত নিম্পেষিত হইয়া থাকে । (সমাজবন্ধ ঠিক উজ্জ্বল, তোমার বিবাহে তুমি আহ্লাদিত হও আর না হও, তাহাতে তুমি মর আর বাঁচ, কিম্বা সর্বস্বান্ত হও, আত্মীয় বন্ধন বন্ধ থাকবে) আপনাদের প্রাপ্যপত্রা ছাড়িবে না ।

বাহ্যারামের মেয়ে ছেলের উদ্ভাহ ক্রিয়াটা অনেক স্থলে একটা সামাজিক জুলুম বিশেষ । বাহারা বিবাহিত হয় তাহাদের স্ত্রী-স্বামী মতামত পছন্দ না পছন্দের বিষয়টা আত্মীয় অভিভাবকগণের পক্ষে তত গম্ভীর্য নহে, লোকলজ্জার ভয়টাই সর্বোপরি । (দাম্পত্য জীবনের ভাবী শুভাশুভ কল কেহ ভাবিয়া দেখে না । বর বা কন্যাকর্তা অপরিমিত ব্যয় করিয়া পরিণামে কারাবাস করুক, কিম্বা ঋণদ্বারে উদ্ভাহ হইয়া যাউক, প্রতিবাসী কুটুম্ব-গণ সে জন্য কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নহে । আয়োজিত মাতাইয়া, স্ত্রী-স্বামীর পাইয়া, ভোজ কলার পান তামাক ধাইয়া তাহার সন্নিবিষ্ট পড়িবে, ক্রিয়াকর্তা বাবাজীবন স্ত্রী-স্বামীর পক্ষে থাকুন । বাহ্যারাম এই সকল অনিষ্ট চিন্তা করিয়া স্তিরমান হইয়া রহিলেন । শুধু একে মহৎ-ওলালা শুভ শুভ নাহে ধরায় ভাল বাজাইল, রসনচৌকীর সানাইকার সাহানা বাহারে তান ধরিল, তুলি মহাশয়েরা মাথার পাগড়ি বাধিয়া নানা রঙ্গ ভঞ্জে ঢোলে কাটি হিলেন, কানির কাঁই কাঁই শব্দে কান কালা পালা হইয়া উঠিল, গায় হরিজ্ঞান ধ্বনি লাগিয়া গেল । ব্রহ্মবাহ্য প্রবণে বোদ্ধাগণ যেমন নাচিয়া উঠে, বিবাহবাহ্যে তেমনি নরনারী বালক বালিকা কেপিয়া উঠিল ।

বাড়ীর অপর বাহিরের উঠান সামিয়ানা চাকা অহকার, তাহার নিম্নে কোথাও কলার পাতা, বাড়ীর খেলার বুরী, কোথাও নৃতন খেলে হাঁকার রাশি,

দাম্পত্যপ্রেমপীড়ন।

২১

কোথাও বাধ্যকরবিষের দরদা আসন, কোথাও বড়ি বড়কি হুড়ান।
দশদিক্ হইতে বিবিধ সামগ্রী সম্ভার আসিয়া ভাণ্ডার ঘূষে কুপীকৃত
হইতেছে। স্ত্রীশক তাম্রবর্ণ ধোলকুল সারি বাঁধিয়া ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে দাঁধি হুড়
কীর চানা মাখন পনীর ইত্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। বাজার
হইতে বাহকগণ কচু কুম্বাও কবলী বার্তাকুপূর্ণ করতিকা সকল আনিয়া
রোয়াকের উপর ফেলিতেছে। মসিবরণা সুলোভরী বীবরণরী স্বর্ণবিপ-
লিতবেহ বর্ণলিঙ্কারে ভূষিত করিয়া গর্জের সহিত বড় বড় মংস্য সকল
বাহির করিয়া দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন, “আজ কালের বাজারে
এমন মাচ আর কেউ দিতে পারিবে না।” সমাগত কুটুম্বিনীগণ নীল পোড
লোহিত ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের বসনে এবং নানাতরনে ভূষিতা হইয়া পর-
স্পরের বস্ত্রালঙ্কারের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কি চাকরাণীর হল হাসির
গোল তুলিয়া গগন কাঁপাইতেছে। কেহ বটি নৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক করালবদন।
মহিরাশুরমর্দ্দিনীর ন্যায় মংস্যমুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করত শোণিতশ্রোতে ধরাডল
ভাসাইতেছে। রক্তনগ্নে পাচিকাগণ কটিতে অকল, মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া
বিবাহযজ্ঞের চতুর্কিধ হবনীর প্রস্তুত করিয়া ধরে ধরে সাজাইয়া
রাধিতেছেন। তেল মসলা দ্রুত ইত্যাদি দ্বারা ভর্জিত ভক্ষ্য দ্রব্যের গন্ধে
আকাশ পরিপ্রাণিত। এই তো পেল রান্নাবাড়ীর ব্যাপার।

অন্তঃপুরমহলে তরুণবরুন্না কি বউ এবং অর্দ্ধপ্রাচীনগণ চুপে হলুদের
গোলা লইয়া পরস্পরের অঙ্গের বসন রঞ্জিত করিতেছে, আর ধিল ধিল
শব্দে হাসিতেছে। কেহ আলপনা দিতেছে, কেহ পান সাজিতেছে, কেহ
বা নবানুত কুটুম্বিনী ও জামাই বিহাই বিহানের সঙ্গে হাসা কৌতুকে
মাতিয়াছে। তার সঙ্গে খত রাতোর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুল ছুটা
ছুটি, হটোপুটি আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কেহ ভোজন, কেহ জ্ঞান, কেহ
বিবাহ কলহে বাস্ত সমস্ত। কেহ কুহুর ঠানাইতেছে, কেহ বিড়ালের
গলায় মালা, কপালে সিন্দূর পরাইয়া তাহার ল্যাঙ্গ বরিয়া টানাটানি করি-
তেছে, কেহ ঢোলে চাটি দিয়া পলাইতেছে, কেহ ভাণ্ডারীর নিকট বার
বার জলপান বেঠাই চাহিতেছে, কেহ কাছা ছিটাইতেছে, কেহ কেহ বা
অন্যবিধ কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রানবণি পিসৌই এখন বাড়ীর গিন্নী।

তার সারা আত্মাশ্রয়ের সীমা নাই। তিনি একবার ঘামা করে, একবার
অপস্মার করে, একবার বিবেচনার নিমিত্তভাবের নিকট ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়ে
দেখেন। সকলকে আবার মন করিতেছেন আর বলিতেছেন, "বোহা, এ
তোমারাই বর খাওয়া। আগমারা নিয়ে ঘুরে করে কর্নে বাও লাভ, দেখে
শোনো, পরের মত কেউ মুখ লুকিয়ে বেঁক নয়। আচ্ছা বাহ্যারামের আবার
না লাই, তোমরাই তার মা খোন, সকলে তাহাকে আদীর্ষ্য কর।"

বনমারীর সববিবাহিতা পত্নী এই উপলক্ষে বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন।
আগন্তুক স্ত্রীলোকেরা মণ বাঁধিয়া তাঁহাকে বেধিতে গেল। বেধিয়া তাঁহার
বসন ভূষণ নাক মুখ চোখ কান কপাল হাত পা চুল নখের সমালোচনা
আরম্ভ করিল। কেহ নাক বাঁকাইল, কেহ জ্র কুঞ্চিত করিয়া মুখ টিপিল।
অনেকে অনেক প্রকার ধুঁত ধরিল। কেহ বা অহঙ্কারের হাসি হাসিল।
ইহারা বধন অপরের রূপের দোষ গুণ ব্যাখ্যা করে, তখন নিজের মুখপানে
চাহিয়া বেঁধে না। বেধিলেই বা কি হইবে, নিজে কুরূপা হইয়াও অপরের
মিন্দা করিতে হাড়িবে কি? মেরেটী বরসে শেরানা, তাই সব ছোষ তখন
চাকা ছিল। বাই হউক, পরিশেষে ভাল মন্দ গড়ে সকলে একটা রফা
করিয়া লইল।

বীথারাম স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, যেখানে লোকসমারোহ, নাচ গান
আমোদ তামাসা, কিন্ধা স্বয়ম্ভূত কপট সামাজিকতা সেখানে তিনি কোন
কালে ভিত্তিতে পারিতেন না। বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীর ভিতর মহা হুট্টোগোল
আরম্ভ হইয়াছে। বাচের আঁলুটে গন্ধে, ঘেঁকি কুকুরের খেঁউ খেঁউ
শব্দে, কাকের চিংকার, ছেলেদের চেঁচামেচি, মাটির ভেদ ভেদানি
এবং চাকরাণীদের পিশাচবৎ হাস্যধ্বনিতে, বহু লোকের কোলাহলে
অস্থির হইয়া তিনি বহির্কোণীতে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও নিরাপদ
হইলেন না। বরসায় সুবকগণ আসিয়া ঠাট্টা তামাসা উদ্ভূত হুট্টা
করিল। তোমার মনের ভিতর কি ঘটিয়াছে না ঘটিয়াছে, তাহা জানি-
বার জন্য ত কেহ দ্বারী নহে। বাহিরে বধন বিবাহের উৎসব তখন তাহার
ভোগ তোমাকে ভুগিতেই হইবে। ঘটনাচক্রে অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, ব্যক্তি-
বিশেষের সুবিধা অসুবিধা মুখ হুঃখ সে ভাবিতে পারে না। খোঁকের

দাম্পত্য প্রেম-বন্ধন ।

আজ্ঞানায়, বিবাহের প্রস্তাব এক উৎসবের আদায় হওয়ায় পায়শাখার
বাড়ায়ই আপ্যায়ন অভিনয় করিয়া চলিয়া গাইয়েরে ।

বাগ্গারামকে প্রকৃত করিমার মত সহচর হৃৎকণ্ঠে বলিয়া দিয়া রক্তের
কণা পাড়িল । কেহ বলিল, "প্রতিজ্ঞা বিবাহ করিতে গাইয়েরে তা' করি-
তেছ না কেন ? বিবাহ কি তোমার একটা বৈজ্ঞানিক গণের সীমার
না শরীরতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ ? না বর্ণিতের সিদ্ধান্ত ?" আর এক জন বলিল,
"ওহে ভাই, তুমি আমার পরামর্শ নোনা । বিবাহের পর তোমার স্ত্রীর সঙ্গে
একবার চমকা লাগিলে, হাতে একবার বিজ্ঞানের শূন্যক দিয়ে, ঘরের কোনে
বসিয়ে রেখ ।" আর এক যুবক বলিল, "না কে না, দেখিতেছ না, ও'র এ সব
কিছু ভাল লাগিতেছে না । বেশী পীড়াপীড়ি করিলে এখনি হয়তো উঠে
চলে যাবেন । বাগ্গারাম, শুন্ডে পাচ্ছ কি সব কথা ? না আর কিছু ভাবছ ?"
বাগ্গারামের চিত্ত হৃৎকণ্ঠে আক্রান্ত, কোন কথারই উত্তর দিলেন না, কিন্তু
ভিতরে ভিতরে বড় ক্রেশ অনুভব করিতে লাগিলেন । তখনস্তর অপর এক
রসিক ব্যক্তি বলিল, "ভাই যদি তোমার এতই কষ্ট বোধ হয়, তবে না হয়
আমাকে ভার দাও, আমি তোমার হইয়া বিবাহ করিয়া আসি ।" এ কথাটা
শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল । বাগ্গারাম নিজেও মুখ মুচ্কিয়া একটু
হাসিলেন । হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তা হলে আমি এ যাত্রা বেঁচে বাই ।
তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া যদি আমাকে এ বিশেষ হইতে উদ্ধার করিতে
পার, তাহা হইলে আমি বাস্তবিক বড় সুখী হই, তোমাদিগকে একটা সুব
বড় ক্রিষ্ট দিই ।" বলের মধ্যে ইঁচড়ে পাকা ডেপো রকমের দুই একটা
ব্রহ্মজ্ঞানীর ছেলেও ছিল । তাহারা নিরীহ বাগ্গারামকে বাল্যবিবাহ দোষে
দোষী, পিতার অল্প অমুগত ভীক সন্তান বলিয়া নিন্দাবাদ করিল । বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতবিদ্যাম্প্রসিক্ত হইয়া অসত্য বর্ষের মত বালিকা
কন্যার সহিত না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করাটা যে অভ্যস্ত মহাপাপ ভবি-
ষ্যে তাহারা দীর্ঘ উপদেশ ও বক্তৃতা আড়িল । বাগ্গারাম বিচক্ষণ ব্যক্তি,
সে কথাগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, মনে মনে আপনাকে একটু হের
অপরাধ জ্ঞান করিলেন । কি করিবেন, পিতার বাধ্য সন্তান, হাত পা বন্ধ ।
তিনি অথোবধনে তাবিতে তাবিতে অল্প এক নিদ্রা হানে চলিয়া গেলেন ।

“আর যিহে তার মরে নাই, পাড়া পড়ানোর মন নাই।” বাড়ীর ভিতর
 আসে হোলে তল আনোবে যাক্সা মাতি করিতেছে, তাহারে ঘেন শিখেরই
 জিহায়ে । খেলা হই প্রহর একটা বাজিয়া গিয়াছে, বরকে আইবুড় আস্ত
 কাক্সাইবার কস্ত মহা মন পড়িয়া গেল । কিছু বর কোথায় তার তিক নাই ।
 আহার বাড়ী ভিতর বাড়ী সকলে অব্যেগ করিতে লাগিল, কোন বাসেই
 বাহ্যারামের কথা পাওয়া যায় না । শেষ রামরানি গিনী ছাঘের উপর
 সিঁড়র ঘরে গিয়া তাহাকে বরিলেন এবং বরিয়া আনিয়া আহারে বসাই-
 লেন । বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর উপর মেয়েদের অত্যাচার জুলুম করি-
 বার ঘেন একটা বিশেষ অধিকার আছে । ভারতের স্বাধীন নৃপতিবর্গের উপর
 স্বানীর পলিটিকেল এজেন্টের যেমন একাধিপত্য, গরিব কলুর ছেলের
 বাপের প্রাণের সময় পুরোহিত ঠাকুরের যেমন প্রভুত্ব, বৃদ্ধ কালের বিবাহের
 ঘটকের যেমন বিবাহকর্তার উপর অধিকার, বিবাহের সময় বরের উপর
 পাড়া প্রতিবাদী আশ্রয় পুরনারী ও কুটুম্বনীগণের তেমন অধিকার ।
 জুমি বি, এ, এম, এ, ই পাস কর; আর ডেপুটী মেজেষ্টর সদর আলাই
 হুজ, সুবা বৃদ্ধ তেলনী গস্তীর যে পদের লোক হও না কেন, বিবাহ কালে
 নারীগণের নিকট তোমাকে বশীভূত হইয়া চলিতেই হইবে । বাহ্যারাম
 ঘেন হাড়কাঠে গলা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, যে বাহা পারিল তাঁর মুখে
 ওঁজিয়া দিল । বাহা হটক, বিবাহের ক্রিয়া সমস্ত এইরূপে সম্পন্ন
 হইয়া গেল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

দুঃখে স্থখ ।

বিবাহের পর কিছু কাল বাহ্যারাম অভিশয় দুঃখের অবস্থার কালাতিপাত
 করেন । পাড়া শুনা আর ভাল লাগিত না, কেবল একলা বসিয়া ভাবিতেন,
 আর দীর্ঘ নিদ্রাম ত্যাগ করিতেন । যে বিবাহবন্ধন বহুব্যয় পার্শ্বিক এবং

অধ্যাপক জীবনের পরম সুখের কারণ, তাহা যদি হইত এক কালের জন্য নিশ্চিত উপায়, তবে আর সে ব্যক্তি কি হইয়া সংসারে সুখ ভোগ করিতেন? সবসে সবস কথাকি বাহির হইয়া পড়িল। বাহ্যারাম বিবাহিত পক্ষী কণাকার শ্রীল কল পক্ষীর বেথিয়া অভয়ে বড়ই ব্যাধা পাইলেন। সেই দিনের সময় অনন্যাংলোকন ভালে তাহাকে বাহা বেথিয়াছিলেন সেই পর্বাত, তাহার পর আর বড় দেখা শুনা হয় নাই। যদিও তিনি পণ্ডিত মানুষ, জগৎ রস সুখ বিলাসের দ্বার খেলি পারিতেন না, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যভূষণ কুচি একটু ছিল; সে কুচিতে বড় আঘাত লাগিল। উদ্যতীত পিতার দ্বার-পরতার কথা বদন তুলিলেন তখন আরও মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, “মহুবার বাধীনতা তবে আর কই? আমরা বাস্তবিকই অকৃত্য দাস। সামাজিক শব্দ সহস্র বন্ধনে বন্ধীভূত। পুরাতন এচনিও প্রথার চক্রে বিদ্বর্ষিত। আত্মকুচি চরিতার্থের তবে আর আশা কোথায়? বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া সংগ্রাম করিলে তবে এ সকল হুপ্রথার উন্মূলন হইবে। সত্য সত্যই মানুষ জড়ের ন্যায় পরাধীন, পূর্ববর্তী কারণের অবশ্যাস্তাবী কল; সমাজ-শক্তি তাহার পরিচালক।”

বনমাণীকে অবশ্য এ জন্ত সমাজমধ্যে নিশ্চিত হইতে হইরাছিল। বাহারা বাহ্যারামকে এ বিষয়ে সহায়ভূতি করিত, তাহারা এই বলিয়া তাঁহাকে এবং আপনাবিগণকে বুকাইল, যে কুলীনের ভেলে, তাহাতে আবার বিদ্বান্ পুত্ৰ, আর একটা সুন্দরী বেথিয়া বিবাহ করিলেই হইবে। কিন্তু তাহারা জানিত না যে বাহ্যারাম একাধিক বিবাহের বিরোধী। কুলীন পক্ষীগণের দুর্দশা বেথিয়া বাহ্যারাম পূর্ণ হইতেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক-টীর অধিক বিবাহ করিবেন না। সুতরাং তাহার এ হুপ্রদূর হওয়ার আর উপায় ছিল না। বিবাহ হওয়া না হওয়া তাঁর পক্ষে সমান হইয়া পড়াইল। অধিকন্তু একটা নিত্য অপ্রীতিকর কঠোর কর্তব্যের বোকা আসিয়া মাথার পড়িল।

বাহ্যারাম কতকটা অকূটবাহীর মত, সুতরাং গীর প্রকৃতি, কোন ঘটনাতেই সহজে উত্তেজিত হন না, সকল বিষয়েই গভীর ভাবে বিচার করিয়া কার্য্যকারণের অবশ্যাস্তাবী কণাকল নির্ধারণ করেন।

একপে তিনি ভাবিতে বসিলেন, এবং এত দিন পরে মনে মনে বুঝিলেন, “ব্যক্তিত্বের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অন্যের ইচ্ছার অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নয়; কারণ, তাহাতে জ্ঞানে দোষ পড়ে এবং সত্যের বিকাশ হয় না। পুত্রের উপর পিতার অধিকার আছে সত্য, অনেক স্থলে তরলমতি যুবক সন্তানকে বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে অনিষ্ট ঘটে, সুতরাং সেই সেই স্থলে অভিভাবকের হস্তে সে ভার ন্যস্ত থাকাই প্রার্থনীয়। কিন্তু যেখানে অভিভাবকের কোন স্বার্থ আছে, যখন তিনি নীচ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, কিম্বা বিবেচনা শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তখন তাঁহার দোষ ত্রুটি মোচনের জন্ত অন্য কর্তৃক বাধা পাওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভুক্তভোগী যে ব্যক্তি তাহার ইহাতে হস্তক্ষেপ করা কিছুই অন্যায় নহে। এত দূর অনুগত্য বশ্যতা স্বীকার আমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি আমার প্রজ্ঞা বিবেক সূচি এবং শিক্ষা সংস্কারের অবমাননা করিয়াছি। প্রচলিত প্রথার অন্ধানুগমন কখন ধর্ম নয়, সে কেবল আমার লৌকিক ব্যবহার। কেন আমি আমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিলাম না? যাহা বিধিনির্দিষ্ট তাহা হইবেই, সে জন্য আমি দুঃখ করিব না; কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়তির পথে অন্ধভাবে কেন চলিব? স্বাধীন চিন্তা, বিবেক বুদ্ধি আমাকে সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে সেই দিকে লইয়া যাইবে। নিয়তি এবং কর্তব্য দুই এক হইবে। এক্ষণে আমার সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ধর্ম্যধর্মের ভাগী কে? নৈতিক জীবনের দায়িত্ব এবং শুভাশুভ কাৰ্য্য ফল সম্পূর্ণরূপে যখন আমারই উপর নিক্ষেপ করিতেছে, তখন কেন এ গুরুতর বিষয়ে সতর্ক হইলাম না? এক্ষণে আর ইগরতো কোন প্রতিবিধান দেখি না। যাহা হউক, স্বাধীনতা আর আমি কাহারো হস্তে দিব না।”

বাহ্যরাম স্বভাবতঃ তত্ত্বদর্শী, এবং নিস্পৃহ বৈরাগী, এই জন্য এই দুর্বটনায় তাঁহাকে একবারে নিজীব হতাসাস করিতে পারিল না। সূক্ষ্মবিচার-বলে সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের অপ্রতিবেশ্য কারণ সকল বাহির করিয়া তিনি আপনার মনকে কণ্ঠকিং সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাঁহার ধর্মমত কোন প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত ছিল না, জ্ঞানকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড কোন নির্দিষ্ট আকার তখনও প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত বিশ্ব এবং তাহার বিচিত্র ক্রিয়ার

অভ্যন্তরে এক অবিভাষা হৃদয়ের অদ্বিত মগাশক্তি স্থিতি করিতেছে তাহাই কেবল তিনি বুঝতেন। দৃশ্যমান বাগ্যক্রিয়া সকল বিশেষ এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তৎসমুদায় মায়ামরীচি সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, মরণশীল, তাহার ভিতরে যে অণু নিত্য সারবত্তা তাহাই স্থায়ী পদার্থ। ফলতঃ বাগ্যারামের মত কতকটা মায়াবাদী অবৈতবাদীর ন্যায় ছিল।

তদনন্তর ভাবিতে ভাবিতে বিচার করিতে করিতে শেষ তিনি উপস্থিত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ স্থির করিলেন;—“আমি মায়াবিকারগ্রস্ত শারীরিক বিবাহকে যথাগ বিবাহ বলিয়া কখনইত স্বীকার করি নাই। আত্মা আত্মাকে বিবাহ করে, এবং আত্মাই আত্মাতে মিলিত হইয়া উভয়ে শেষ অনন্তে গিয়া নিত্য কাল স্থিতি করে; তবে কেন আমি শরীরের সৌন্দর্যের বিষয় ভাবিব? রূপত চক্ষের বিকার, প্রতিফলনে পরিবর্তিত হইয়া বাইতেছে, দেখিতে দেখিতে মুক্তিকায় পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। যৌবনওত জরা বার্দ্ধকোর প্রারম্ভ মাত্র। অতএব রূপ যৌবনকাল কর্তৃক প্রতিনিয়ত যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সময়ে বিকৃত এবং অদৃশ্য হইয়া মহাকাশে মিশিয়া যাইবে, তখন আমি এ জন্য কেন শোক করিব? যে পদার্থের ধ্বংস নাই, অংশ নাই, পরিবর্তন বিবর্তন নাই, চিরকাল যাহা অণু অবিকৃত অটল উজ্জ্বল, আমি তাহারই সহিত প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকিব। এ ভাবে আমি প্রত্যেক মহাব্যয়ের সহিত উদ্ধাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারি। প্রেমের চিরমিলনই আমার প্রকৃত বিবাহ।”

এইরূপ অধ্যাত্ম চিন্তা এবং জ্ঞানবিচারবলে বাগ্যারাম শোক দুঃখের পরিবর্তে শেষ মহা আনন্দে উল্লসিত হইলেন। ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী যুবকেরা স্ত্রী পাইলে যে রূপ আনন্দিত হয় তদ্রূপ আনন্দে তিনি ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মন উদাস হইয়া আকাশে মিশিয়া গেল, ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, জড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সারগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী আত্মা অনন্ত জ্ঞানালোকে বিচরণ করিতে লাগিল। গভীর চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তাসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যে অনির্করচরিত্র আরাম সম্ভোগ করেন, বুদ্ধ, সঙ্কেটশীল, কারলাইল, ইমার্সন, ক্যান্ট, কুজিন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন তাহার প্রমাণ। চিন্তাশীলতা এবং বৈরাগ্য, এই দুইটী মহাব্যয়ে পার্শ্ব

মোহবন্ধন হইতে প্রমুক্ত রাখিয়া পরম শান্তি বিধান করে। বাঙ্কারামের পক্ষে এ দুইটাই বিশেষ সহায় ছিল। অনন্তর তাঁহার জন্মের ভার চলিয়া গেল, চিন্তা প্রসন্ন হইল ; পৃথিবীর সুখ দুঃখ মায়া মমতার অসারতা দিব্য-জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং নিত্য অথও অনন্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য যোগবলে সমস্ত বিকারের কারণকে উড়াইয়া দিলেন। স্বাধীন চিন্তার বল, ইচ্ছার পরাক্রম শক্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ঐদৃশ শক্তি যাহার হস্তগত, পৃথিবীর বুর্খটনায় তাহাকে অধিক কাল মুহূমান করিয়া রাখিতে পারে না। অতঃপর মানসিক মহাবলে বাঙ্কারাম ভোগস্পৃহা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্রোতকে সংযত এবং নিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ তাহার গতিতে অঙ্গে অঙ্গে ফিরাইয়া বিবেকাধীন সাধু ইচ্ছার অধীন করিয়া ফেলিলেন। পরে নিয়তিকে বিধিনির্দিষ্ট পথে অনন্তের দিকে এমনি বেগে চালাইলেন, যে দ্বৈতজ্ঞান বিকল্প বুদ্ধি আর রহিল না, কিছু সময়ের জন্য তিনি অভেদাত্মা হইয়া আত্মায় জগতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ মুক্তাবস্থাকে তিনি স্বর্গসুখ মনে করিতেন। অভ্যাস ওপে এইটী ক্রমে তাঁহার আয়ত্বাধীন হইয়াছিল। বিপদ আপদ বা মানসিক উদ্বেগের সময় এইরূপে অনন্তের বিশাল বক্ষে জীবন ডাঙাইয়া দিয়া তিনি নির্দিকার নিশ্চিন্ত মনে নির্কামের শান্তি উপভোগ করিতেন। বিবাহবিভাতজনিত ক্লেশ সম্ভাপ দুঃখ বিষাদ এইরূপে শেষ নির্কামের শান্তিতে পরিণত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সুখে দুঃখ ।

বাঙ্কারামের পিতা বনমালী মোহের ছলনে দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়া সংসারে স্থগী হইলেন। সে সুখ কি প্রকার, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে অনেকের চৈতন্যোদয় হইবে। নবপত্নীর প্রথম যৌবনের রূপ লাভে অকুপ্রায় হইয়া আট দশ বৎসর কাল তিনি সংসারে এমনি

দুবিসাছিলেন, যে কেহ আর তাঁহার মাথার টিকী দেখিতে পাইত না । একবারে যেন আত্মবিস্মৃত । মনুষ্য কার্যাদোষে জন্মান্তর লাভ করিয়া পশু উদ্ভিদ জড় পাষাণে পরিণত হয়, এ কথা মানি আছে । এক জন্মেই পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে । পুরাতন পত্নীর তীরোভাবে স্থানান-বৈরাগ্যের উদয়, আবার নবপত্নীর আবির্ভাবে সমুদ্রে তাহার বিনাশ, ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় । তাঁহার সেই নির্জ্বল উদ্যানের ভ্রমরকুটীর এক্ষণে মুলীর ঘরে পরিণত হইল । গেরুয়া বসন গুলি দ্বারা বাড়ীর মেহেরা লেপ ভোষক প্রস্তুত করিয়া ফেলিল, গীতা ভাগবতে উই ধরিল, মৃগচন্দ্রা বর্ষার জলে ভিজিয়া পচিয়া গেল ; শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষ মিশ্র শ্রাব্ণ রাশি এত দিন গোলে মালে লুকাইয়া কোনরূপে জীবিত ছিল, শেষ ক্রমশঃ শুক্ল পক্ষের সীমা প্রসারিত হওয়াতে গৃহিণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । তখন আর কার সাধ্য যে তাহাকে রক্ষা করে । বনমালী স্ত্রীর অমুরোধে দাড়ি মুড়াছিলেন, হবিস্য ছাড়িয়া মংস্য ধরিলেন, খান হুতির পরিবর্তে পাড়ওয়াল। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে লাগিলেন । অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় সংসারী হইয়া বিষয়মাদিগা পানে দিবা নিশি প্রমত্ত রহিলেন । কয়েক বৎসরের যাহা কিছু বাকী পড়িয়াছিল একশুদ্ধ তাহা আদায় করিয়া লইলেন । এই স্ত্রীর গর্ভে কয়েক বৎসরের মধ্যে উপর্যুপরি তাঁহার প্রায় ডজন ধানেক ছেলে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে । তাহার মধ্যে আবার ঘোড়া দুই তিন যমক । এই সকল লিপলটিয়ান গুড় ভেড়ে সিপাই পণ্টনের রসদ যোগাইবার ভাবনায় এক একবার বনমালীর গায়ের রক্ত শুকাইয়া যাইত, মহা ভয় উপস্থিত হইত, কিন্তু উপায় কি । অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটবেই । পেনসেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে সংসার আর চলে না, ব্যয় করিবার লোক অনেক, আয়ের লোক নাই, ধার কর্ত্ত্ব হইল, বিষয় বাধা পড়িল । সকল দিকেই তিনি জড়াইয়া পড়িলেন । স্ত্রীর ভয়ে মুখ কুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না । কিন্তু যষ্ঠী দেবীর অত্যন্ত অমুগ্রহ দেখিয়া মনে মনে তিনি মা ওলাদেবীকে নিজগৃহে আস্থান করিতেন, এ কথা আমরা অবগত আছি ।

সন্তান গুলি গৃহিণীর কাছে আদৌ ঘেঁসিত না, তাঁর অঙ্গদরও বড়

কম ছিল। থাকিলেও এ বিষয়ে তিনি আপনাকে তত দায়ী মনে করিতেন না। দ্বিতীয় দ্বারপরিগ্রহের বোধ হয় ইহা একটা বিশেষ সূর্ত্ত, যে সম্ভা-
নাদি বাহ্য কিছু অস্থিবে তাহাদের লালন পালনের ভার পিতার উপর।
কাজেই ছেলের পাল এক দণ্ড বনমালীর কাচছাড়া হইত না। তাহার
কাঁদিবার সময় মা মা না বলিয়া বাবা বাবা বলিয়া কাঁদিত। বনমালী এখন
প্রত্যহ তিন চারি বার বাজারে যান, জিনিষ পত্র ভাল না হইলে স্ত্রীর মুখ-
নাড়া খান। কিন্তু সেটা খাইতে নিহাত মন্দ লাগিত না। একবার
হামি মুখ দেখিলেই আবার সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। সংসা-
রের এত যে কঠোর যন্ত্রণা ভাবনা হুঁশিয়ার গ্রহণীয় প্রসন্ন বদনের এক
হাসিতে সে সব নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইত। তবু গিন্নীর
মুখ খানা তত ভাল ছিল না। রোঁড়ে রোঁড়ে ঘুরিয়া পথের ধূলা
খাইয়া শুক কঠে গলদষণ শরীরে যাই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, অমনি
কোন ছেলেটা পাঁঠে চড়িয়া বাসল, কোনটা গলা জড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল,
তাদের দেখাদেখি “আমার বাবা, আমার বাবা” বলিয়া আর গোটা কতক
ঘাড় পড়িয়া পরস্পরে জড়ামড়ি আরম্ভ করিল। স্বর্ণবিপ্লবিত দেহে
ধূলায় ধূসরিত সন্তানগণের আলিঙ্গন কেমন সুখকর তাহা সকলে কল্পনা
করেন। বনমালী দেখিলেন, একটা ছেলে হঁকা কলিকা প্রভৃতি তামাকু
সেবনের সরঞ্জাম ডব্যাগুলি লইয়া বাহুবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির
সম্বন্ধ বিচার করিতেছে; তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে সেই হঁকাটা মুখের
কাছে আনিয়া ধরিল। কোনটা চোংকার রবে, কোনটা দমকে দমকে নানা
পর ভঙ্গীর সহিত কান্না মুড়িয়া দিয়াছে, কেহ কেহ কিলোঁকিলি আরম্ভ
করিয়াছে। সেই সময় আবার গয়লা মিন্‌সে হুধের দেনার জন্য দরজায়
দাঁড়াইয়া বকিতেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিখারী বৈষ্ণব “বেলা হল
আয়েরে কানাই গোষ্ঠে যাই” বলিয়া গান ধরিয়াছে। বনমালী নাকি কিছু
দিন গীতা ভাগবত পড়িয়া কিছু কিছু চিত্ত সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন,
তাই এ সব দৌরাত্ম্য সহ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সংসারমধ্যে যেরূপ
অগাধ বৈষ্ণ্য সহকারে সন্তানগণের উৎপাদন এবং অন্য সহস্র প্রকার
কষ্টাট সহ করে, মহা জিতেন্দ্রিয় সংযত আত্মা যোগীও তেমন পারেন না।

একটা চেলের একবারকার খুব জোরের কান্না যদি তাঁহার কানে প্রবেশ করে, তাহা হইলে হয়তো তিনি কোপীন কাঁধা কন্থল কমণ্ডলু ফেলিয়া আরো দূর বনে গিরিগর্ভে পলাইয়া যান । কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে গৃহী ব্যক্তির এ সহ গুণের কোন অপার্থিব পুরস্কার নাই । সে ভাবে সহ করে না বলিয়াই পুরস্কার পায় না । বনমাণীর মস্তিষ্ক এ অন্য এক এক বার বিচল-প্পন্ন হইত, দুঃখেতে চক্ষে জল আসিত । কিন্তু তা বলিয়া কি যমে ছাড়ে ? এত্ননি হয়েছে কি ! হাড় মাস চিবাইয়া খাইবে, তার পর চিঁ চিঁ করিয়া ডাক ছাড়িতে হইবে । সাধ মিটেছে কি ? আর বিষে করবে ? না গরল হইতে অমৃত উদ্ধারের চেষ্টা দেখিবে ?

যখন তিনি এইরূপে সন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাতর স্বরে “হায় আমি কি করিলাম এসে ভবে” বলিয়া গীত গাইতেন, তখন তাঁহার নবীন গৃহিণী লক্ষুণী ও তর্জুন গর্জ্জনের সহিত “ইহা নাই, উহা নাই, এটা চাই, সেটা চাই, বাজারে গেলেন তা চাই করে আনুলেন” ইত্যাদি কথার অব-তারণা করিতেন ; আর ঘ্যান ঘ্যান ক্যান ক্যান প্যান প্যান করিয়া কানের কাছে অবিশ্রান্ত বকিয়া বকিয়া কানের পোকা বাহির করিয়া দিতেন । ইহাতে বনমাণীর মনে কীদৃশ অশান্তি উপস্থিত হইত তাহা সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন, বেশী বলা বাহুল্য ।

গৃহিণী ঠাকুরাণীর কাজের মধ্যে কেবল শ্রমীর কানের কাছে গজর গজর করিয়া বকা আর ভাবন করা, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত দিন প্রায় অতি-বাহিত হইত । সন্তানগুলিকে কোলে লইবার কিম্বা পরিষ্কার করিয়া দিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, তাহার অবসরও পাইতেন না । এক ধানি আয়না আর চিত্রণি সর্বদা কাছে আছেই । বিবিধ প্রকারে কেশ রচনা করিয়া তাহাতে গন্ধদ্রব্য, সুবাসিত তৈল মাখাইয়া কবরী বন্ধন করিতেন । কখন কখন ছুই তিন ঘণ্টা ক্রমাগত আয়নায় মুখ দেখিতেন । মুখ দেখিবার সময় তাঁহার চক্ষু নাসিকা ললাটি এবং গণ্ডস্থল ওষ্ঠাধরে লক্ষ্যগলে বহুবিধ ভঙ্গী রঙ্গী প্রকাশ পাইত । গাল দুটি গোলাপ ফুলের ন্যায় লোহিত রাগে রঞ্জিত করিবার জন্য কত যে উৎকর্ষিত হইতেন তাহা আর বলা যায় না । এক বার ঘুছিতেন, আবার লাগাইতেন, কিছুতেই আর মনের মত হইয়া উঠিত না ।

ঠোটে আলতা, হাত পায়ে আলতা, গালে আলতা মাখিয়া, চুলটি বাঁধিয়া, পানটী খাইয়া, জিহ্বাটী বাহির করিয়া দর্পণে নিজ মূর্তিটী অতি মনোযোগ-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেন। কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো বসিয়া, কখনো বাকা হইয়া নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত আপনার রূপ আপনি দেখিয়া মোহিত হইতেন। এ বিভাগের কার্য্য নিত্য সামান্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। গ্যাডেটোন প্রভৃতি মহানভার সভ্যদিগকে যেমন রাজ-কাধ্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, ভাবনকারিণী বিলাসিনীরা তেমন এ কাজে অনেক চিন্তা এবং পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মুখে সৰ্ব্বদা মাখিয়া তাহার পর বেশম দিয়া গা ধুইতে মাখিতে ঘসিতে, চুল শুকাইতে, তাহার পরিচর্যা করিতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। তদনন্তর গায়ে রং ফলাইতে, কাপড় গহনা পরিতে, খুটি নাটি মাথা মুণ্ড পিণ্ড দান করিতে করিতে সজ্জা হইয়া আইসে। বাস্তারামের মত অধ্যয়নশীল কৃতবিদ্য ভদ্র যুবর মনে হইতে পারে, এ সব কাজে কেবল সময় নষ্ট আর অসারতা বৃদ্ধি। কিন্তু মহিলাকূলের সম্বন্ধে তত বৈরাগ্য সম্ভবে না, কেন না, তাহার গৃহের শ্রীস্বরূপ। সুসজ্জিতা রমণী গৃহের লক্ষ্মী। অবশ্য যাহার কথা আমরা বলিতেছি, একরূপ সৌন্দর্য্যানুরাগ অতিশয় নিন্দনীয়। এই ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ছিল না বলিয়াই সাজ সজ্জার এত বাড়াবাড়ি। অভিনয়কারী সুবকগণ আপনাদিগকে নারীবেশে সজ্জিত করিবার সৰ্ব্বদা যেমন হাব ভাব প্রকাশ করে, বনমাণীর স্ত্রী প্রতি দিন তাই করিত। তিনি অভিনেত্রীর বেশে সাজিয়া শুজিয়া আপনার গরবে আপনি কাটিয়া মরিতেন।

বনমাণী বাবু হইতে তত বিরক্ত ছিলেন না, বরং মনে মনে খুসী হইতেন। কিন্তু যখন তিনি কোন রূপ বস্ত্র বা অলঙ্কার দ্বারা কিছুতেই গৃহিণীর মনস্তত্ত্ব সাধন করিতে পারিতেন না, তখনই বড় বিপদ উপস্থিত হইত। তাহার স্ত্রীর এ বিষয়ে পরিশেষে একটা যেন রোগের মত জন্মিয়া গিয়াছিল। স্বামীর বেশী ব্যয়ক্রম বলিয়া তিনি অনেক প্রশ্রম পাইতেন, সেই জন্য কিছুতেই আর তাঁর কোন সামগ্রীতে মন উঠিত না। তাহার ভাবন আর পঙ্কজের জ্বালায় ব্রাহ্মণের মাথা এক একবার ঘুরিয়া যাইত,

এবং তিনি হতাশ হইয়া সময়ে সময়ে চক্ষে সরিষার তুল দেখিতেন । ওখাপি চেষ্টার ক্রটি কখন করেন নাই । জীবন স্থখের উপর বাহাদের স্থখ শান্তি নির্ভর করে তাহাদের কি বিষম বিড়ম্বনা ! বনমালী জীবন সেবার জীবন চালিয়া দিয়াও তদ্বিবয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই । তৈগণ পাঠিকগণের এ কথাটি বেন মনে থাকে ।

এরূপ বিলাস আমরাও ভাল মনে করি না । এমন কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল না বাহাতে তিনি সারা দিনটা কেবল অহরহে আর বেশ বিন্যাসে কাটাইয়া দিতে পারেন । বর্ণটা পৌর বর্ণ ছিল তাহা আমরা মানি, কিন্তু কেবল পৌর বর্ণই কি রূপের পরাকাষ্ঠা ? পাঠিকা-গণ ক্রমা করিবেন, আমরা স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইতেছি, এই রূপসৌর নাকটী ভাল ছিল না । তাহা ছাড়া গাল দুইটা বস, চোখ ছোট, হৃৎ লম্বা, মাথাটা আকা বাঁকা, চুল পাতলা এবং ষাট, কোন রূপে কায় ক্লেশে ছেঁড়া চুল পরচুলের সাহায্যে খোঁপাটী বাঁধিতেন । স্বভাব বেষণানে প্রতি-কূল, কৃত্রিমতার সেইখানে আভিষয়া । কিন্তু তাহাতে কি স্বভাবের কতি পূরণ হয় ? হটক আর না হটক, এই ব্রাহ্মণকন্যা প্রাণপণে তজ্জন্য চেষ্টা করিত : কিন্তু এক মুখের দোষেই তাঁহার সকল আয়োজন নিষ্ফল করিয়া রাশিয়াছিল । যিনি বাহা মনে করুন আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, বনমালীর পত্নী ঘোটকবদনী, ভেকগামিনী এবং বিড়ালকী ছিলেন । সুতরাং তাঁহার শ্রী সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এত যে চেষ্টা সে সমস্ত কেবল ভ্রমে বি ঢালা হইত । কাহারো নিন্দাবান্দ্য করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বিশেষতঃ ভদ্রলোকের বরের কুলবধূর রূপের দোষ গুণ বর্ণনা আমাদের পক্ষে নিহাত অনধিকার চর্চ্চা । ওখাপি বাহা সত্য তাহা বলা ভাল । যার রূপ নাই, অথচ যিনি রূপের বড়াই করেন, কিম্বা এক গুণরূপ আছে ত্রাহাকে দশ গুণ করিতে চাহেন, তিনি যেই কেন হটন না, তাঁহার সবল স্বরূপ কথা না বলিলে আমাদের বর্ষ থাকে না ।

বনমালী বাবু কি দেখিয়া যে এত মোহিত হইয়াছিলেন তাহা যদি ছাই আমরা কিছু বৃক্ষিতে পারি । মেয়েটা শেরানা ডাগর ডোগর, আর গায়ের চামড়া খানি ফর্সা ; দূর হইতে রঙ্গীন কাপড় গহনার সঙ্গে ইহা দেখিয়া

তিনি একঝারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এটাকে অবশ্য মোহেরই কাজ বলিতে হইবে। মোহে বধন চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, তখন চক্ষুও কি দেখিতে কি দেখিয়া ফেলে। যে বাহ্য বাস্তবিক নয় তাহাকে তাহা মনে করে। শ্রী সৌন্দর্য্যের ভিতর শতকরা নিরানন্দই জনের শ্রী কৃত্রিম। তাহারায় বেরং কাপড় গহনা পরিয়া এমনি সাজে, যে কত টুকু সৌন্দর্য্য তাহাদের নিজের এবং কত টুকুই বা ধার করা তাহা ধরা বড় কঠিন। (আপাতদৃষ্টিতে যিনি পরমাসুন্দরী, বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাঁহার রূপের ভিতর অনেক গলপ বাহির হইয়া পড়ে। যুবকগণ, তোমরা সাবধানে আপনাপন উত্তমার্জ্জকে নির্দোষ করিবে। কেবল শাদা চামড়ার উপর সমস্ত মূল্য স্থির করিও না, তাহাতে ঠকিবে। বরং একটু ময়লা হইলে কিছু যায় আসে না, গঠন সুপ্রণালীভূত কি না, আর জ্ঞান চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষের আত্মা তার মধ্যে আছে কিনা, এটাই অগ্রে দেখিও। এ সব তাড়া তাড়ির কাজ নয়, স্থির শাস্ত মনে শ্রীনির্দোষ করিতে হয়। তবিষাতে কার কপালে কি দাঁড়াবে কেহ জানে না, শ্রীভাগ্য সকলের সমান নয়। কিন্তু এঁজিনিষ কাঁকড়ে মিলে না, একবার ঘরে আনিলে আর ফিরবে না। এই জন্য বলি, সাবধান! হসিয়ার! আর যদি বন-মালীর মত পিতার হস্তে ভার্য্যার্পণ কর, তাহা হইলে আর এ বিষয়ে কোনই ভাবনা থাকিবে না।

মানুষ কি দুর্ভাগ্য! যদি কোন ঘটনার পড়িয়া তাহার মনে এক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, কোথা হইতে এমন একটা উপসর্গ আসিয়া জুটিবে, যে তাহাকে এককালে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। ভ্রান্ত মতি বিপ্লবের এক একবার মোহনিদ্রা ভাঙিয়া বাইত। বধন পরিবারবর্গের উৎপীড়নে, সংসারের দুর্ভাবনায় নিত্য ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন সেই শূন্যবৈরাগ্যের প্রতি তিনি অতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু সে শুভ লোক তখন আর কি করিবে? শ্রী মরিলে সে এক আধ বার দেখা দিতে পারে, তার বাহা কিছু পরাক্রম বিক্রম মৃতপত্নিকের নিকট, অস্বস্ত মেয়ে মানুষ বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের শ্রী তাহার পক্ষে সম্ভবরূপ। তাহার ভয়ে সে নিজীব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বনমালী বার বার ডাকিয়াও আর

তাঁহার মাড়া শব্দ পাইলেন না । অগত্যা শেষ জীবন তাঁহাকে শেয়াল কুকুরের মত অভিবাহিত করিতে হইল । পূর্বজীবনের তপস্যা আর পুন-
জীবিত হইল না । হার কত কত অমূল্য মানব জীবন যে পরিণামে এই-
রূপে অধঃপতিত হয় তাহা কে গণনা করিবে ?

নবম পরিচ্ছেদ ।

নির্কাসন ।

যে সময়ের কথা আমরা এত ক্ষণ বিবৃত করিলাম তৎকালমধ্যে বাহ্যিক-
মের জীবনেতিহাসে দুই তিনিটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় । (১) স্ত্রী-
বিরোধ, (২) গৃহ হইতে নির্কাসন, (৩) মৃত পরিবর্তন । তাঁহার সেই
চিরকল্প প্রীহাশ্রুত সংক্রামক জরাক্রান্ত স্ত্রীর পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইল ।
তাঁহার রূপ যৌবন বয়স আর বাড়িল না, কেবল রোগই বাড়িল । পিলে
অধমাস কাঁসর ইত্যাদিতে পেট পুরিয়া গেল, পা ফুলিল, চক্ষে নানাবা হইল,
অষ্ট প্রহর জরভোগ, অরুচি, মুখে ঘা, নানা রোগে তাহাকে ঘেরিল । শেষ
ভুগিয়া এবং ভোগাইয়া দেহলীলা সম্বরণ করিল । বাহ্যরাম একাই তাঁহার
সেবা করিতেন । তাঁহার পিতা নিজের ছেলে মেয়ে লইয়াই বিরত,
বিমাতা আপনার অক্সরাগেই ব্যতিব্যস্ত, ক্রম বহুতর প্রতি তাঁহার একবার
কিরিয়া চাহিতেন না । বাহ্যরাম বিবাহ করিয়া চির অসুখী হন, অধিকতর
ক্রম স্ত্রীর সেবা করিতে করিতে তাঁহার হৃৎকম্পিত জীবন আরো ভাঙ্গা-
ক্রান্ত হইয়া উঠে । কি করিবেন, জীবের দয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম,
বিশেষতঃ অসমার নিরাশ্রয় রোগী চক্ষের সমক্ষে কষ্ট পাইতেছে ইহা
দেখিয়া কোন স্তব্ধবান পুরুষ স্থির থাকিতে পারে ? বাহা হউক, এইরূপ
নিম্নার্ধভাবে স্ত্রীর সেবা করিয়া তাঁহার কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া-
ছিল ; বাস্তব জীবনের এই টুকু মাত্র কেবল তাঁহার পূরকার ।

বনমালী যে সময় সংসারচক্রে পড়িয়া নিরন্তর বিষম্বর্তিত হইতেন,
সেই সময় বাহ্যরাম বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র পাঠে প্রাণ মন একবারে উৎসর্গ

করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংসারের সকল প্রকার দুঃখ শোক তিনি এইরূপে ভুলিয়া থাকিতেন। কিন্তু বনমালী তাহাতে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপযুক্ত সন্তান, বাহাকে এত দিন যত করিয়া লেখা পড়া শিখাইলেন, এক্ষণে সে অর্থ উপার্জন দ্বারা পরিবারের সাহায্য করিবে মনে মনে এই প্রত্যাশা। তাহা পূর্ণ না হওয়াতে ক্রমশঃ অসদৃশি বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। অনন্তর সেই বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। গৃহিণীর অত্যাচার উৎপীড়ন, উত্তমর্ঘদ্বিগের তাড়না গঞ্জনা, সন্তানগণের দৌরাভ্যাস সহ করিয়া করিয়া সঙ্কিত অপরিভৃষ্ট রাগ টুকু শেষ এখন বাহ্যারামের উপরেই তিনি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীতে কোন শক্তির বিনাশ নাই; আপাততঃ বাহ্যারাম অশ্রুকাশিত, সময়ে কার্যান্তরে অন্য কোন উপলক্ষে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যখন বাহির হয় তখন আবার সে সুদ শুদ্ধ আদায় করিয়া লয়। সেই যে বনমালী স্ত্রীর নিকট নানা প্রকারে লাঞ্চিত অপমানিত হইয়া, পুত্র কন্যাগণের জ্বালায় জলিয়া পুড়িয়াও কিছু বলিতেন না, চুপ করিয়া থাকিতেন, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ বিরক্তি জীর্ণ প্রাপ্ত হইত না; বরং সময়ে এখন তাহা মহা বেগের সহিত বাহ্যারামের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। নিরীহ বাহ্যারাম যেন পিতার প্রত্যেক উত্তেজিত নিকট প্রবৃত্তির প্রসন্নতা সম্পাদনের বলি-স্বরূপ ছিলেন। বনমালী প্রথম বিবাহে কিছু অর্থ লইয়া কুপ কুৎসিত জরাজীর্ণ বধূকে গৃহে আনেন। পরে তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রিয়া পুনরায় অর্থ লালসার পুত্রকে বিবাহ করিতে অনুবোধ করেন।

বহুসময়ে এক্ষণে কৃতবিদ্যা সুপাত্র বৈরাগ মূল্যবান সামগ্রী তাহাতে বাহ্যারামকে আমরা প্রথম শ্রেণীর পাত্র মনে করিতে পারি। বিবাহ হিলে নগদ দুই হাজার টাকাত অনায়াসেই পাওয়া যায়। পরিবার বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কষ্টের সমস্ত একরূপ লাভজনক কার্যের লোভ সম্বরণ করা বড় সহজ কথা নহে। নিরাজ্ঞ বার্ধক্যের মোহাদ্ধ বনমালী পুত্রকে একবার বলিহীন করিয়া ফাত্ত হইলেন না, দ্বিতীয় বার বলিহানের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহ্যারাম এ বিষয়ে এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছে। লোকের দোষিয়া ভনিয়া বিবাহের প্রতি তাহার স্থা অস্থিরাছিল। অধিকন্তু পিতার নীচ বার্ধক্যতঃ

বুঝিতে পারিয়া সে আরো সাবধান হইল। বনমালী তজ্জন্য অনেক খাপ মুনি্য দিলেন, কটু কাটায় বলিলেন, কিছু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাহ্যারাম গ্রন্থ অধ্যয়নে দ্বিবা নিশি মগ্ন থাকিতেন, সে সকল কথা কানে করিতেন না। বরং সংসারভূতগ্রন্থ পিতার চুর্দশা দেখিয়া তিনি আপনাকে সুখী ও নিরাপদ ভাবিয়া মনে মনে একটু আচ্ছাদিত হইতেন।

চারিদিকের অবস্থা যেরূপ অশান্তিজনক হইয়া উঠিল তাহাতে বাহ্যারাম পণ্ডিত আর বাড়িতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একে পিতার ক্রোধ অস্তিসম্পাত অভিমান, তাহার উপর পরিবার মধ্যে দ্বিবা নিশি কোলাহল বিবাদ, ইহাতে তাহার চিত্ত অধ্যয়নের সমূহ ব্যাঘাত অস্থিতে লাগিল। বাস্তবিক বনমালীর বাসভবন যেন পিশাচগণের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। সর্সদা কেবল পান ভোজন বস্ত্র অলঙ্কারের কথা, আর অসার কুটুমিতার লৌকিক আড়ম্বর। প্রতিদিনের আহারের সময় যেন একটা ভূতের বস্ত্র অনুষ্ঠিত হইত। এক পাল ছেলে মেয়ে, এই খাইয়া উঠিল, আবার খাইতে বসিল। কেহ এক খান বেশী মাচ পায় নাই বলিয়া বাড়ের মত চীংকার করিতেছে, সেই অবসরে আর একটা আসিয়া তাহার পাতে বাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়া প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছে। কেহ বিবস্ত্র বিকটবেশে পেট মোটা গণেশের মত শুইয়া শুইয়া আঁবের আঁটি চুসিতেছে, কোনটা বা ভাত ডাল তরকারি লইয়া চারিদিকে ছিটাইতেছে আর সর্সাদে মাধিভেছে। আচার করিতে করিতে কেহ বা তাহার বিপরীত কার্য্যও করিয়া বসিয়া আছে। একজন আর এক জনের মুখে ভাত তুলিয়া দিতেছিল, সে তাহার আঙ্গুল কামড়াইয়া লটরাইছে। একটা আপনার ভাগ খাইয়া আবার অপরের অধিকৃত অংশ আনুসাতের উদ্যোগ করিতেছিল তজ্জন্য তাহাকে সে চুলে ধরিয়া কিলাইতেছে; এবং নিদাক্ষণ নখাঘাতে তাহার গুণ্ডুল অক্ষিত করিতেছে। ইহা বর্ণন করিয়া গিন্নী চোঁচাইতেছেন, কঠা চোঁচাইতেছেন, চাকরাণী ব্রাহ্মণী চোঁচাইতেছে, মহা চীংকারের রোলে গৃহ পরিপূর্ণ। ভিলার্ড কালের অন্য বাড়িতে শান্তি নাই। বাহ্যারাম নানা প্রকারে আলাতন হইয়া পরিশেষে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বনমালী এবং তস্য পত্নীর হাড়ে বাতাস লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

বিজ্ঞানবিকার ।

বাৎসারাম বর্দি অগভীর চিত্ত চিন্তাহীন কোমল ছদ্ম স্বক হইতেন তাহা হঠলে নিশ্চয় গৃহ পরিত্যাগ কালে তাঁহাকে কাঁদিত হইত। অতিরিক্ত অধ্যয়নজন্য এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনায় তিনি ইহাণী কিছু কঠোর জ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারমধ্যে যে তাঁহাকে কেহ একটু স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়া কাঁদিত এবং কাঁদিয়া কাঁদাইবে এমন এক জনও ছিল না। 'ভালবাসিবার লোক এক রামমণি পিসী, তিনিও কিছু দিন পূর্বে পরলোক চলিয়া গিয়াছেন। নানাপ্রকার দুর্-বস্থা ও দৈব ঘটনায় মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার উপর বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠে চিত্ত এক কালে ঐক্যসিন্য ভাবধারণ করে। তদ্বিত্ত শিতার দুর্ব্যবহারে এবং বিবাহবিভ্রাটে বাৎসারামের ছদ্ম একবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল। বর্দিও মানসিক বল পরাক্রমে সে শোকাবেগ ফিরাইয়া তিনি মনকে কিয়ৎপরিমাণে আত্মবশে আনিয়াছিলেন, কিন্তু মর্মে যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা সম্যাকরূপে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই নিদারুণ মর্শ্ববেদনা ভুলিবার জন্য তিনি অতিশয় উদ্যমের সহিত কয়েক বৎসর ক্রমাগত গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই অধ্যয়ন এবং অতিরিক্ত চিন্তা গবেষণা বিচার তর্কে তাঁহাকে আবার আর এক প্রকারে গঠিত করিয়া ফেলিল। পূর্বের বিশ্বাস সংস্কার চিন্তাপ্রণালী আর এক নূতনবিধ পথে চলিতে লাগিল। প্রত্যক্ষবাহ অজ্ঞাত-বাহ এবং জড়বাহ মতাবলম্বী আধুনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে তাঁহাদের চিন্তা ও বুদ্ধি তর্কের ঘূর্ণাজলের মধ্যে তিনি পড়িয়া গেলেন। বাহ্যের মতামত এবং চরিত্র ভালরূপে গঠিত হয় নাই, তাহাদের তরল মন বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পরিবর্তিত হইয়া যায়। যখন যে গ্রন্থকারের গ্রন্থ তাহারা পাঠ করে, মনে হয়, ইহার ভূল্য বিদ্বান্ আর কেহ নাই।

ভরল পদার্থ পাত্রভেদে যেমন বিবিধ আকারে পরিণত হয়, সুবকগণের মনও তদ্রূপ। চতুর লোকবিশেষ বিকৃত মস্তিষ্কশ্রুত একদেশদর্শী বৈজ্ঞানিক মোহে প্রবর্তিত হইয়া তাহার বড়ই অস্থিরতা প্রকাশ করে। বাহ্যিক ভাষার মানসিক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত হইল। ভৌতিক জ্ঞানের চাকচিক্যে তিনি আত্মতত্ত্ব একবারে ভুলিয়া গেলেন। ইতঃপূর্বে কতকটা মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী বৈদ্যাস্ত্রিকের ন্যায় ছিলেন, এক্ষণে জড়বাদী অদৃষ্টবাদী অনাস্রবাদী হইয়া উঠিলেন। জগৎকারণের অসুসন্ধান, তাহার সহিত মনুষ্যের সাধারণ ও বিশেষ সম্বন্ধ নির্ণয়, এ সকল নিষ্ফল-বস্ত্র আনিয়া বহির্মুখ পথে ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হইলেন। পদার্থ ছাড়িয়া ছায়া, সত্য ছাড়িয়া মায়্যা, নিয়ন্তা ছাড়িয়া নিয়ম, ধর্ম ছাড়িয়া নীতি, ব্যক্তি ছাড়িয়া শক্তি, কারণ ছাড়িয়া কার্য লইয়া রহিলেন। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অদৃশ্য মহাশক্তির আলোচনা এখন আর ভাল লাগিত না, তাহা কবিকল্পনা, দুর্কৌণ্ড্য অনাস্রক অনাবশ্যক পণ্ডিত্য বলিয়া মনে হইল।

জ্ঞানচর্চা করিতে করিতে ইদানীং তাঁহার মনে কিছু তমোগুণেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অল্প বয়সে বি, এ, পরীক্ষার প্রথম হন, তাহার পর বিজ্ঞান বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ঠেহাতে মনটা একটু গরম হইয়া গেল। মনে করিতেন, “আমি সব বুঝিব, সমস্ত অমীমাংসিত তত্ত্বের মীমাংসা করিব। কেনই বা না করিব? এত লেখা পড়া শিখিয়াছি তবে কিসের অন্য? বিদেশীয় ভাষায় বড় এত বড় বড় কঠিন গ্রন্থের পরীক্ষার কৃতকার্য্য হইলাম; তবে অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞের ন্যায় হইয়া আর থাকিব না। বুদ্ধির আলোকে জ্ঞানের বিচারে সমস্ত তত্ত্ব বিতন্ন খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বুঝিব তবে ছাড়িব। কোন্ কালে সেই মাহাত্ম্যর আমলে নিউটন বলিয়া গিয়াছেন, জ্ঞান উপার্জন আর সমুদ্রের বেলাভূমিতে উপলব্ধিও সংগ্রহ দুই সমান, এখন এই উনবিংশ শতাব্দীতেও কি সেই কথা মানিতে হইবে? মানুষ না পারে কি? এই মানুষই জ্ঞানোন্নতি সহকারে ক্রমে ঈশ্বরপদ লাভ করিবে। তবে আর তার পক্ষে অসাধ্য কি আছে? আমি এত দিন ধরিয়া বাহা পড়িলাম বুঝি-

লাহ চিন্তা করিলাম তাহাত বড় সামান্য নয়, পর্কিত প্রমাণ গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছি। মূর্খ অস্ত্রদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপেক্ষা নাস্তিক জ্ঞানী হওয়া ভাল। অজ্ঞানান্দকারে সুখভোগ অপেক্ষা জ্ঞানে আত্মহত্যাও শ্রেয়স্কর।

তরুণবয়স্ক যুবকগণের বিদ্যার গরিমা হইলে যে দশা ঘটে বাহ্যারামের তাহাই হইল। তিনি খোদার উপর খোদগারি করিতে গিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের অনন্ত কার্যকারণের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষ না পারেন অগ্রসর হইতে, না পারেন ফিরিয়া আসিতে, মধ্যপথে পড়িয়া চক্রে আঁধার দেখিতে লাগিলেন, বুদ্ধির ক্ষুদ্র দীপালোক নির্ক্ষিপ হইয়া গেল। চারিদিকে অনন্ত অন্ধকার। স্বষ্টির গভীর রহস্য, নৈসর্গিক নিয়মাবলীর দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা মীমাংসা করিতে গিয়া শেষ আপনাকে পর্য্যন্ত আর-খুঁজিয়া পান না। ভগবানের দূতেরা বেন গলা ধাক্কা দিয়া এক বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। কোন দিকে কূল কিনারা দেখিতে না পাইয়া, অনেক নাকানি চোবানি হাবু ডুবু খাইয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, যে “অপরিস্কেয় তত্ত্বের অমুসন্ধানে কোন পুরুষার্থ নাই, যাহা দেখিতে শুনিতে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায়, যাহা আপাততঃ কাজে লাগে তাহা লইয়াই থাকা ভাল।” এই বলিয়া মৃত জড় পদার্থের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। লাভের মধ্যে এই হইল, অধিকার চর্চা করিতে গিয়া মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়া পড়িল। পূর্বে যে যে মতে বিশ্বাস করিতেন, যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন তাহার ঠিক বিপরীতদিকে চলিলেন।

প্রথমে ছিল যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর সে সমস্ত মারামরীচি স্বপ্ন কল্পনা, রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ মিথ্যা, কেবল নির্ভণ অবিভাষ্য শক্তিই সর্ব্বত্র, এক্ষণ কেবল জড় আর জড়ীয় নিয়মাবলী সার জ্ঞান করিলেন। আত্মা বিবেক জ্ঞান চৈতন্য ইচ্ছা ভাব এ সমুদ্রের অন্তিত্ব উড়িয়া গেল, রহিল কেবল পরমামুপুঞ্জ তড়িৎ ইথার অক্সিজেন নাইট্রজেন কার্বন কসকরাসু প্রোটোপ্লাজম ম্যোলকিউল, আকর্ষণ বিপ্লবণ আর সংযোগ বিয়োগ। এই নূতন পথে নূতন মতে দীক্ষিত হইয়া এক একবার বাহ্যারাম পণ্ডিত মনে ভাবিতেন, তিনি নিজেও বেন কেবল পরমামুপুঞ্জ, কতকগুলি জড়ীয়

পার্বিৰ উপাধানের সমষ্টি মাত্র, কতকটা যেন বস্তুপরিচালক বাপ্পের মত, এতদ্বিন্ন তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের স্বতন্ত্রতা কিছু নাই। কখন বা মনে করিতেন, “আমি নাই, ভৌতিক পদার্থপুঞ্জের সহিত আমি এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছি। পকে পক লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। জলের সঙ্গে জল হইয়া, আগুনের সঙ্গে আগুন হইয়া, ফুল ফল তরুলতার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াই সুখ, ব্যক্তিত্বের ভার বহন বড় কষ্টকর। আমি নাই, এই জ্ঞানই “শূন্য জ্ঞান” “আমি আছি, আমি ভাবিতেছি, চিন্তা করিতেছি” ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানেও সংশয় জন্মিল। সময়ে সময়ে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা মতা কষ্টকর হইত। দেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে পাঁচটা ভূত ছিল, তাহাদের জালাতেই লোকে জলিয়া মরিত, বিলাতি বিজ্ঞানের পঞ্চাশটি ভূত ঘাড়ে চাপিয়া ব্যাক্তারামকে ঘূবাইতে লাগিল। কোন্টা সত্য, কোন্টা অন্ততঃ ইহা স্থিরও হয় না, মনে শাস্তিও পান না, যেন আঁধারে ছুটা ছুটি অরস্ত করিলেন। অনেক প্রকার কুট শস্ত সংজ্ঞা নিঃসন্ন ব্যবস্থা যুগ্ম হইল, কিন্তু জ্ঞান জন্মিল না। জ্ঞানময়কে ছাড়িয়া জ্ঞানানুসন্ধান! হরি-ছাড়া কীৰ্ত্তন! ইহা কি কখন হইতে পারে?

পণ্ডিত এইরূপে জড় ভাবিতে ভাবিতে জড় ভরতের মত জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। শুক চিন্তার জ্বলন্ত লুকাইয়া গিয়াছিল, স্নেহ মমতা ভক্তি প্রীতির সমস্ত অনুভব করিতে পারিতেন না, ঠিক যেন এক বগু বদ্ধ দ্বারের ন্যায় নীরস মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যে যেমন চিন্তা করে, পরিণামে সে সেই ভাবে পরিণত হয়, এ কথা অতি সুসঙ্গত। চৈতন্যের রাজ্য ছাড়িয়া মনুষ্য হতচৈতন্য জড়ভূত হইয়া উঠে, তখন তাহার মনুষ্যত্ব পণ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিলে ভাব ভক্তি প্রেম আনন্দে প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় সে সুন্দর এবং সরস দেব প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। একে ব্যাক্তারাম স্নেহ বাৎসল্য দাম্পত্য প্রেম, বদ্ধ ব্যক্তিবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, তাহার উপর কঠোর চিন্তা বিজ্ঞানবিকার, ইহাতে তিনি একটী নিতান্ত দয়্যার পাত্র হইয়া পড়িলেন। সুবিধার মধ্যে এই জড়বাদ মতে সচরাচর লোকবিগত যেমন যথেষ্টাচারী করিয়া ফেলে তাঁহাকে সেরূপ করিতে পারে নাই। বরং জড়ের জড়ত্ব তাঁহাকে নির্বাপনশক্তিপরায়ণ শান্ত চিত্ত

করিয়া দিয়াছিল। তাহার অমুকরণে তিনি এক প্রকার সাম্যাবস্থা লাভ করেন। কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা ভাবাক্রান্ত বা জ্ঞানামুশীলনে তাঁহাকে পাপের পথে কখনো লইয়া যাইতে পারে না। জ্ঞান বিষয়েই যাহা কিছু একটু পাগলামি ছিল। তিনি যেন ছোট ষাট একটা লাইব্রেরি। যে সংবাদ শুনিতে চাহিবে তাহা এখানে পাঠিতে পারিবে। কেবল দুঃখের বিষয় এই, মিল্ কোমৎ স্পেনসার দারউইন হিউম বেকন বেন টিওল হস্টিংস, আরো কত কত (যাহাদের নাম এ কালের ছেলেরা বঙ্গতীর সময় ফড় ফড় করিয়া সচরাচর বলে ; আমাদের মত সেকলে লোকের মুখে যাহাদের নাম উচ্চারিত হয় না,) জ্ঞানীদিগের নাম যখন তখন উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু একটা বার ভুলিয়াও ভগবানের নাম মুখে আনিতেন না। সে বিষয়ে একবারে উদাসীন নির্লিপ্ত বৈরাগী। তিনি স্বষ্টির শোভা, প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খল কৌশল দেখিয়া কতকালে একবারে ভুলিয়া যান। কিন্তু ভদ্রতা সৌজন্য সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে চিরদিন ভূষিত ছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

পাথে ।

বাগ্গারাম বৎকালে পৈতৃকভবন হইতে নির্কাসিত হন তখন তাঁহার এইরূপ মনের অবস্থা। এই পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা লইয়া নন্দনগ্রাম পরিভাগ-পূর্বক তিনি বসন্তপুবাধিমুখে মাতৃগালয়ে যাত্রা করিলেন। পথের সম্মুখ কয়েক খণ্ড গ্রন্থ, আর পুরাতন সংখ্যার নাইটিছ সেঞ্চুরি রিভিউ। জ্যেষ্ঠ সাসের শেষ ভাগ, সম্প্রতি দুই পাঁচটা ব্লিষ্ট হইয়া রাস্তা ঘাট মাঠ বাগানকে ঘোঁত করিয়া গিয়াছে। হরিদ্র নবীন দুর্লভলশোভিত তটপ্রবাহিনী শ্রুতশৈবলিনী জাহ্নবী গৈরিক বসন পরিধানপূর্বক প্রেমোন্মাদিনী যোগিনীর বেশে শ্রমক মাকুত হিম্মোলে হেলিয়া ছলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া সিদ্ধর উদ্দেশে বাহিত হইতেছেন। তাঁহার সেই হাস্যময় শীতল বকবিহারিণী ক্রৌড়াশীল

উন্নীমালা চিত্র ভিন্ন করিয়া যেত পক্ষবিম্বিষ্ট শত শত তরলী শ্রেণীবদ্ধ রূপে
সবেগে ছুটিতেছে । অনার্থী নরনারী বালক যুবকের জনতার ঘাট পরিপূর্ণ ।
মহিলাগণ অর্জবসনে উজ্জ্বলবসনে আলুলায়িত কেশ কতাজলি পুটে স্ব স্ব
ইষ্টদেবতার পূজা অর্চনা করিতেছে, কেহবা নৈবিদ্য ফুল ফুল গন্ধাতুরণে
ভাসাইয়া দিতেছে । সত্তরপটু অভিজাবকবিহীন বালকগণ তাহা ধরিবার
জন্য জলজন্তুর আশ্রয় ডুবিতেছে উঠিতেছে ছুটিতেছে । মধ্যে মধ্যে এক
এক জন দীর্ঘশিখাপারী উন্নতনাসা লম্বোদর ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ কুটিল
কটাক্ষপাতের সহিত তার স্বরে গর্জিত ভাবে এমনি মন্ত উচ্চারণ করিতেছেন,
যেন শাস্ত্র তন্ত্র সমস্ত তাঁহার উদরস্থ ; তিনি যেন ধর্ম্মকর্ম্মের অম্বদাতা
পিতা ; তাঁহার বাড়ীতেই যেন ধর্ম্মবিদী সকল প্রস্তুত হয় । গুলিধোর
বাবু গামছা কাঁধে ফেলিয়া কিনারায় বসিয়া ভাবিতেছেন, স্থান করিবেন
কি না । পাছে নেশা ছুটিয়া যায়, ছয়টা গরুর আকিং লোকসান হয় এই
তাঁর ভাবনা । তিনি ইতিকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া শেষ অসুখী দ্বারা
একটু একটু জল মাথায় দিতেছেন, আর ঘন দৃষ্টির সহিত ভোজন কেমন
মুখের বিষয় মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতেছেন । যথা যুবকের দল
ঘাটে বসিয়া জটলা করিতেছে, পথ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না । ইহারা
প্রাতে উঠিয়া তাস খেলে, আবার স্নানের পর পাখা সত্তরক লইয়া বসে,
মুতরাং তত তাড়া তাড়ি নাই । বসিয়া বসিয়া বিলম্ব করিবার আরও একটা
মন্দ উদ্দেশ্য আছে । মুদি দোকানদার সরিষার তৈলে সর্পাস্ত্র অভিষিক্ত
করিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে জলে পড়িল, ডুব দিল, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া হাত
ঘোড় করিল, তিন অঞ্জলি জল তুলিয়া জলে ফেলিল, শেষ প্রণাম করিয়া
দোকানে ফিরিয়া গেল । নিজ ব্যবসায় ছাড়া তার অন্য চিন্তাও নাই, অন্য
দৃষ্টিও নাই ।

স্নানের ঘাটের উপরেই বোড়াগাড়ীর আচ্ছাদ । কোচমান আলিআন
মাটির আলবোলায় তামাকু বাইতে বাইতে আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দিতে
বান্ধারামের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি আরম্ভ করিলেন । দুই পাঁচটা ইংরাজি
কথাও তাঁহার জানা ছিল । আলিআন মিঞার শরীরটা গুলি বাইয়া
বাইয়া পোড়া কাঠ বানির মত হইয়াছে, গলায় এক গাছা গুত রত্ননীর

বাসি বেল ফুলের মালা, কোটরে প্রতিষ্ঠা ঈষৎ লোহিত চক্ষুর্দ্বয় মিট মিট করিতেছে। ষাড়ের চুল ছাঁটা, মাথায় সিন্টি কাটা, গায়ে একটা রঙ্গীন কাপড়ের ফুয়া আঁটা। হাসিতে হাসিতে নানা রঙ্গ ভঙ্গে নিজের গাড়ী ঘোড়ার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক গুণ ভাড়ার জায়গায় চারি গুণ হাঁকিলেন। তৎসঙ্গে অপরের গাড়ীর দোষ ঘোষণা করিলেন। বাস্তারাম জীবনের মধ্যে কেবল সেই এক দিন মাত্র বাজার করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, পিসী ঠাকুরাণীর গমক খাইয়া আর সে বিষয়ে কখন সাহসীও হন নাই। পৃথিবীর ব্যবসায়ী চতুর লোকদিগের ক্রটি মধুর কপট বাক্যের স্বার্থ অর্পণ অবধারণে তাঁহার ক্ষমতা আদৌ ছিল না। তবে ঐ মাত্র আনিতেন যে, যে যত দূর বলে তাহার অর্জ্জেকে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু আলিজান যে চতুর্গুণ দাম হাঁকিয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? বিশেষতঃ সে দামের কপাটা ইংরাজিতে বলে, এবং তৎসঙ্গে এরূপ তাঁহাকে আশা দেয়, যে ষোল মাইল পথ দেড় দণ্ডায় পৌঁছিয়া দিবে। ইংরাজি কথার সম্ভ্রম আছে, কারণ ইংরাজেরা মিথ্যা কথা কয় না, কাজেই বাস্তারাম ভাড়ার ঠকিয়া এক গুণের স্থানে দ্বিগুণ স্বীকার করিয়া গমনোদ্যত হইলেন এবং অর্জ্জেক মূল্য অগ্রিম দিয়া আলি-জানের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

আলিজান আস্তাবোলে প্রবেশপূর্বক প্রথমতঃ বদনার জলে গোসাল করিল, তার পর কুটী কাবাবের সামুক লইয়া নাস্তায় বসিল। নাস্তা করিয়া একথানা ভান্সা কাঠের চিকুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইয়া দুই চকের কিনারে জুমা লাগাইতে লাগিল, আর সহিস রহিমবক্সকে আলবোলায় তামাকু তৈয়ার করিতে জুকুম দিল। পরে তাহাকে ঘোড়ায় সাজ চড়াইতে বলিয়া সে আস্তা-বোলের বাঁহরের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। এ দিকে বাস্তারাম রৌজের উস্তানে বস্তু এবং গলদদর্শ্য হইয়া ক্রমাগত অপেক্ষা করিতেছেন। ভাগ্যে তাঁর চিন্তাশীল মন গণে ঘাটে যেখানে সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তায় সহজে মগ্ন হইতে পারিত তাই রক্ষা, নতুবা অন্য কেহ হইলে এত দ্রুণ চটিয়া লাল হইত সন্দেহ নাই। এক একবার গাড়ীর কথাটা স্মরণ হওয়াতে “কৈ হে, সময় যে গেল, নীড্র এস না?” এই বলিয়া ডাকিতেছেন। কেইবা

তাঁর ডাক শুনে ? কোচমান সাহেব তখনো নাস্তা করিয়া সুখী পরিয়া তামাক সেবনে মগ্ন আছেন। বাস্তারাম যেমন উত্তৃষ্ণতার অবশেষে বিজ্ঞোষ, অহিফেনেদেবী আলিঙ্গান ধূম পানে তাহা অপেক্ষা গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া আরনার মুখ দেখিতেছে, চুল ফিরাইতেছে, পরসায় এক তোলা যে আতর তাহা গোঁফ এবং দাড়িতে মাণিতেছে ॥ সন্দিগ্ধ রাহিমবক্স তখন গোড়ায় সাজ দিতেছিল। সে একটা হাড়পেকে মুসলমানের ভেলে, ন্যাংটে ডাল কুকুরের মত চেহারা, বুড় গরুর পাকা হাড় মাস চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার মুখে শিরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দেখিলেই বোধ হয় যেন যমের অকুচি; অথবা হজম করিতে পারিবেন না বলিয়া যমরাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার বাণ্য আকার যেমন কঠোর, আন্তরিক প্রভাবটুকু তেমনি কাঁকড়া বিচার মত বিষাক্ত। পাথরে আছাড় মারিলেও তাহার মরণ হয় কি না সন্দেহ। রৌদ্র বৃষ্টিতে কোচমানের চাবুক প্রহার এবং গলাগালিতে এমনি সে তৈয়ার হইয়া উঠিতেছে, যে ভবিষ্যতে সে যখন আবার কোচমান হবে, তখন ভদ্রদত্তানদিগের হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিবে।

প্রায় ঘণ্টা দুইকাল বাস্তারামের প্রচুর দৈর্ঘ্যরশিক শ্রান্ত ক্লান্ত অব-
সন্ন করিয়া আলিঙ্গান রথারোহণে বহির্গত হইলেন।

গাড়ী থানি নগরমধ্যে বহুকাল পথে পথে ঘোঁড়ের পুড়িয়া, অলে ভিজিয়া পাথরের খোয়া এবং ট্রামওয়ারের রেলের ধাক্কা খাইয়া অর্থাৎ ভীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি ঘূমের গুণে লাটসেন্স ইনস্পেক্টর বাবু কয়েক বৎসর রেজিষ্টার করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন; শেষ যখন নিত্যন্ত অচল হইয়া পড়িল, তখন সহরে সে আর স্থান পাঠল না, কাজেই সেটা নাগরিক ইচ্ছিত্ত একপে গ্রাম্য বাবুদের নিকট প্রসাদ রূপে উপস্থিত হইয়াছে। একে তৃতীয় শ্রেণী তাহাতে ভগ্ন ভীর্ণ পুরাতন, আলিঙ্গান মিশ্রা গোটা কুড়িক টাকায় তাহা কিনিয়া যেখানে যেখানে রং উঠিয়া গিয়াছিল সেখানে আলকাতরার পটী দিয়াছেন, ভগ্ন স্থান সকলে দড়ি জড়াইয়াছেন। আর পদো দুইটা, তার কথা বত কম বলা যায় ততই ভাল; সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তার অগ্রে ক্রম কাটিয়া ছোবড়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছোবড়া

মারিলে ধূলীয় গগন আচ্ছন্ন হয়। কত পচা ইলিস মাচ, আর বসন্ত ওলা-উঠার মতদেহ যে সে বহন করিয়াছে তাহা বলা যায় না।

পশ্চাদ্দেশে রহিমবক্স আলবোলা হস্তে দণ্ডায়মান, আলিজান ধীরে ধীরে বর্ষার বর্ষার ধনন্ ধনন্ ধনন্ ধনন্ নজ্ বজ্ হাঁকোচ কোঁকোচ শব্দে গাড়ী গইয়া বাস্তারামের অদূরে দাঁড়াইল, এবং “বাবু আহ্নন মহাশয়!” বলিয়া হুই একবার ডাকিল। বাবু তখনও চিন্তার ঘোরেই ছিলেন। প্রথম হুই একটা ডাক কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। তখন সেই সয়তানের অবতার কোচমান ধমক দিয়া বলিল, “কি মশায় আপনি দেরি করিতেছেন! ঘণ্টাভোর গাড়ী নিয়ে বসে আছি। এ সতো এস, নৈলে আমি দোঁসরা ভাড়া নিয়ে এখনি চলে যাব! এতক্ষণ বেফয়দা খাড়া করিয়ে রাখলে, এর জন্য আর আট আনা ভাড়া বেশী দিতে হবে।” এরূপ বেয়াদবি আর ছুষ্টমির কথা শুনিলে মরা মাছুয়ের ক্রোধের উদয় হয়। বাস্তারাম একটু চটিয়া বলিলেন, “তুমি আপনি বিলম্ব করিয়া শেষ আমার উপর দোষারোপ করিতেছ? কি রমক তোমাদের ধর্ম্ম হে বাপু?” আলিজান তখন আরো ছুষ্টমির সহিত গার্ব্বভ ভাবে বলিল, “আরে যাও মশায়, তোমার মত অনেক বাবু দেখা আছে। এখন জল্দি জল্দি এসত এস, আমার ঘোড়া খামছে না, গরম হয়ে উঠেছে।”

বাস্তারাম আর কোন কথার উত্তর না দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। উঠিবার সময় প্রেকের খোঁচা লাগিয়া গায়ে রক্ত পড়িল, চাদর খানি ছিড়িয়া গেল। অনন্তর কোচমান বোটকের রাসরজ্জু ধরিয়া টানিল, ঘোড়া নড়িল না; দ্বিতীয় বার টানিল তাহাতেও না; শেষ পুনঃ পুনঃ সজোরে টানাটানি আরম্ভ করায় তাহাদের নিছা ভঙ্গ হইল এবং তাহারা ষাড় কিরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত দস্তপাতি বাহির করিয়া যেন বলিয়া উঠিল, “আঃ কর কি! একটু ধাম না, যাওয়া যাচ্ছে! এত ব্যস্ত কেন?” গদ্যাগ্রয় কবিত্বরসহীন পাঠক পাঠিকাগণ হয়তো বলিবেন, ঘোড়া চতুর্দশ পত্ত। তারা কি কথা কহিতে পারে? আমরা বলি, কেন পারিবে না? সকলেই নিজ নিজ ভাষায় কথা কহিতে পারে। প্রেমিক জন তাহা শুনিতে পান। কথা কহা ছাড়া অনেকরকম ভাষা অগতে প্রচলিত আছে। ঘোড়া হুইটী দাঁতের

মাড়ি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া, ষাড বাকাইয়া, চারি পা ছুড়িয়া এক স্থানে দণ্ডা-
য়মান থাকিয়া আপনাদের দুঃখ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল । শ্রান্ত দুর্বল
কতক্স অশ্বষোজিত তৃতীয় শ্রেণীতে যাহারা আরোহণ করিয়াছেন তাহারা
ষোটকের ইঞ্জিনের ভাষার অর্থ অবশ্যই জানেন । অশ্বষয়ের একরূপ বির-
ক্তির বিশেষ কারণ ছিল । তাহারা পূর্ন দিবসে সমস্ত নিশি জাগিয়া বসন্ত-
পুর হইতে নন্দনগ্রামে আসে, একবারও নিদ্রা ঘাইতে পায় নাই, তার পর
শ্রান্তি দূর হইতে না হইতে আবার চলিতে হইবে, কাজেই ইহাতে বিরক্তি
হয় আর না হয় !

ঘোড়া দুইটী কুরুপ দুর্দশাপন্ন তদ্বিবরণ স্তনিসে অনেকের চক্ষে
জল আসিবে । একটী বড় একটী ছোট । বড়টী নূতন, একটু শাসে
জলে আছে । চাবুকের প্রহারে ছোটটীর গায়ের লোম প্রায় ছিল না বলি-
শেই হয় । মুরগীর ছোট ছানা গুলি যেমন, কিম্বা যে সকল শালিক
পাখীর পাখা উঠে নাট তালের যেমন দেখিতে, এই ঘোড়া দুইটীর চেহারা
ঠিক তেমন । পক্ষীরাজের হুই দকের ডানা বাহির হইয়াছে, ভুচর হইয়াও
সে যেন খেচর হইয়া পড়িয়াছে, গলায় এবং পায়ে যা দগ্ধ দগ্ধ করিতেছে,
চক্ষে ছানিভরা, তাহাতে মাছি বসিয়াছে, লাজুলটী গিরগটির ল্যাঙ্কের
ন্যায় নিলোম, তাহা সহস্র কীটের আবাস স্থান । উদরে দানা পানি নাই,
নিদ্রার ভারে চক্ষে জল ঝরিতেছে, এমনি কাহিল যে ঠেলা দিলে যেন
পড়িয়া মরে । তাহার উপর শত গ্রন্থিযুক্ত পচা চামড়ার সাজ । বাহাই হটক,
সোয়ার পৌছিয়া দিয়া ভাড়া লওয়া মাত্র কোচমানের প্রয়োজন, দয়া মায়া
করিলে তাহার ব্যবসায় চলে না; বিশেষতঃ তাসা গাড়ী মরা ঘোড়া তাড়াইয়া
সে নিক্ষেপে খেঁকি কুকুরের মত হইয়া গিয়াছিল । পুনরায় সে রাস ধরিয়া
সবলে টানিল, তৎসঙ্গে প্রথম দুই চারি বার মিষ্ট বাক্যে আশা ভরসা দিয়া
আদর স্নেহ দেখাইল; তদনন্তর দড়ির চাবুক মারিল, তাহাতে কিছু হইল
না, লাঠী শোটা বাহির করিয়া তাহা দ্বারা বত পারিল ঠেঙ্গাইল, অশ্রীল
দুর্ভাক্যে গালি দিয়া ঘোড়ার বংশের চতুর্দশ পুরুষের নিন্দা গ্রানি প্রচার
করিল; তবু ঘোড়া নড়িল না, ক্রমে পথপার্শ্বে ধানার দিকে যাইতে
লাগিল, আন্তাবোলের দিকে যথ ক্রিয়াইয়া রহিল । শতরা স্তুতি নিজ নিজ

স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে, কার সাধ্য তাহাদিগের দ্বারা কাজ করাইয়া লয় ? পরিশেষে আলিফান ঘোড়ার ঠ্যাংকে দড়ি দিয়া টানা টানি আরম্ভ করিল, এবং রহিমবক্স চাকা মারিতে লাগিল। যখন এত দূর পূর্ণাস্ত পৌঁড়াইয়াছিল তখন কনিষ্ঠ দুর্বল মোটরটী পূর্ণের মাঝে খানে একেবারে শুইয়া পড়িল। সে স্পষ্টই বলিল, “আমি একটু না ঘুমাইলে কিছুতেই আর যাতে পারিব না।” এই বলিয়া কাঁদিয়া সে ধূলায় গড়া গড়ি দিতে লাগিল। আমাদের পণ্ডিতজী ভিতরে বসিয়াছিলেন, সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই, দেখিলে হয়তো পশুর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি একটা বালস বিছানা তৎক্ষণাত তাহাকে আনিয়া দিতেন। অনেক চেষ্টা যত্নের পর শেষ গাড়ী খানি আস্তাবোল ছাড়িয়া গম্যস্থানের দিকে শনৈঃ শনৈঃ গমনে পদ্য হয় !

বাহারাম গাড়ীর ভিতরে চাহিয়া দেখেন, পায়ে নীচে কতকগুলো রস। রসি, কোচমান সহিসের বিছানা আসবাব, কাঁথা কস্মল, ও খাদ্য ; ঘোড়ার খরবা বুরুষ এবং ধলে পোরা ঘাসের রাশি। গাড়ীর দরজা জানালা নামাইতে ঠোঁটতে সরাইতে গেলেন তাহারা কেহ উঠিলও না, নামিলও না, এক আঙ্গুল সরিলও না ; অনেক ঠেলা ঠেলিতে যদিও দুই একটা নড়িল, কিন্তু স্থানচ্যুত হইয়া একবারেই নামিয়া পড়িল। তখন তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া আবার গাড়ীর মধ্যে সাবধানে স্থান করিয়া দিতে হইল। কোচমান হতভাগটা সে সময় বিমাইতেছিল, নতুবা আগ্রত থাকিলে নিশ্চয় কত কি বকিত এবং ভৎসনা করিত। মধ্যপথে আসিয়া মাঝে মাঝে ঘোড়া দুইটি ক্ষেপিয়া উঠে, তজ্জন্য বার বার বাহারামকে নামিতে হয়, এবং নিজেও চাকা ঠেলিতে হয়। পেটরোগা ঘোড়া, না পারে চলিতে, না পারে দৌড়িতে। দুই এক পা যায়, আবার থমকিয়া দাঁড়ায় ; ইহা বাতীত একটা উপসর্গ আছে যাহাতে পুনঃ পুনঃ নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিতে হয়। কখনো চাকা ঠেলিয়া, কখনও টানিয়া, কখন বা আরোহীকে নামাইয়া সারথী রথ চালাইতে লাগিল। এক এক বার খুব বেগে চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অন্য প্রকার বিপদ ঘটিল ; চাকা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ফলতঃ বাহারামের ইহা অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া অনেক

ভাল ছিল। তাঁহার চুংখের কাহিনী আর সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই, অবশিষ্টে কষ্টভোগ সকলে বুঝিয়া লউন। কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই।

বসন্তপুর পৌঁছিতে এক ক্রোশ পথ বাকী আছে, এমন সময় কোচমান বলিল, “বাবু, তুমি এইখানে নাও, আর গাড়ী চলবে না।” এত বলিয়া সে ঘোড়া গাড়ী রাসবজ্রু এবং আরোগীর উদ্দেশে আপন মনে বিভিন্ন বিভিন্ন করিয়া বকিতে লাগিল। দুই পাঁচটা গালাগালিও দিল। বাহ্যারাম তখন তাহার ভাবগতি দেখিয়া না হাসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।* শেষ দেখিলেন, বড় বেগতিক, পথের মাঝে মারিয়া ধারয়া কাপড় চোপড় কাড়িয়া লইয়া যদি বিদায় করে, অনায়াসে পারে।

চলিতে চলিতে পশ্চাত্তাগের এক খান ঢাকা যিগিয়া গড়াইতে গড়াইতে পথ-পার্শ্বে পড়িয়া পেল, আর তাহা আপন স্থানে সম্বদ্ধ হইল না। তিন চাকাতে ও গাড়ী চলিতে পারে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আরোহী তাহাতে থাকিতে পারে না। কাজেই বাহ্যারামকে নামিতে হইল। এ দিকে বেলাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় দৈবরূপায় আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে এক খান ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উঠিল, এবং দিগ্গ হইতে দিগন্তরে বিজলীর মালা চমকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিবিড় জলদঙ্কালে সমস্ত গগনমণ্ডল চাইয়া ফেলিল। খামল শস্য-ক্ষেত্র, ঘনপল্লবিত হরিষ্রণ আশ্রয়কাননের ছায়া, তাহার উপর গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ-মালা, এমনি অন্ধকার হইয়া উঠিল যে আর কোন দিকে কিছুই নয়নগোচর হয় না। ক্রমে স্রোত বাতাস বহিতে লাগিল। শেষ বিষম বৃষ্টি ঝড় তুফানে একবারে প্রাণিপুঞ্জকে আকুল করিয়া তুলিল। পথের উদ্ভীর্ণমান মূল্যবান শিঙাট চোটক ও সারথীর চক্ষুকে অন্ধপ্রায় করিয়া গাড়ী ঘোড়া কোচমানকে বায়ু-বেগে উড়াইয়া একবারে ধানার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। তাহার কিছু পূর্বে বাহ্যারাম নামিয়া পড়িয়াছেন এবং নিকটস্থ অমবাগানের অস্ত্রবিক্রেতাদ্বিগের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন আলিঙ্গনের তরু পাড়ী ভাঙিয়া গেল, মরা ঘোড়া খাবি খাটতে লাগিল, সে নিজেও নান্দা নাবুদ হইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া মহা বিক্রমের সহিত ঝড় বহিয়া গেল, গম গম

গুড় গুড় নাহে মেল গজিল, শেষ বৃষ্টির ধমকে আর বাতাসের ঝাপটে তাহার প্রাণকে ওষ্ঠাগত করিল ।

অনন্তর ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলে বাগ্জারাম অবিশিষ্ট পথটুকু পদতলেই গমন করিতে বাধ্য হন । এত অণ তাঁহাকে যেন মামুদ ভূতে পাইয়াছিল, শেষ ঝড় জলের সঙ্গে আপনার ভীষণ মূর্তি দেখাইয়া সে ভূত পলায়ন করিল । পূর্ন গগনে কাল মেঘ তখনও জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে ; তাহার শিখরাগ্রভাগে অন্তাচলগামী সূর্য্যের রশ্মিমালা নিপতিত হইয়া আকাশকে বিচিত্র বর্ণে সূচিক্রিত করিয়াছে । নিদাঘ কালের উত্তপ্ত মেদিনী বৃষ্টির শীতল জলে যখন স্নান করিয়া উঠে এবং তাহার উপর অন্তর্মিত তপনের হেম বর্ণ কিরণচ্ছটা এবং সন্ধ্যার শীতল ছায়া আসিয়া যখন পতিত হয়, তখন তৃণপ্রাক্ষাচিত ভূভাগ, বৃক্ষ লতা সমাকীর্ণ উদ্যান, বনভূমি এবং সরসী স্রোতস্বতী তরুরাজী সকল কি এক স্নিগ্ধ মূর্তিই ধারণ করে ! পথের দূলা উড়িয়া গিয়াছে, স্তরকির লোহিত বর্ণরঞ্জিত সরল রাজবস্ত্রী বারিধারা সংস্পর্শে সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহার দুই পাশে আত্মকাননশ্রেণী হরিহর্ষে পথপ্রান্ত জনের তাপিত চক্ষুকে শীতল করিতেছে, নিকুঞ্জ বনের মধ্যে বসিয়া দয়েল পাখী পরমানন্দে গীত গাইতেছে, বাগ্জারাম এই নয়নরঞ্জন শোভা সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । ইহা দর্শনে তাঁহার প্রথপ্রান্ত দূর হইল কেবল তাহা নহে, মনে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তার তরঙ্গ উঠিল । প্রকৃতি দেবীর অমুপম শোভা দেখিতে দেখিতে বসন্তপুত্র গ্রামে মাভুলত্ববনে তিনি প্রবেশ করিলেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শূন্য গৃহ নির্মাণ ।

. সন্তোষিনীকে আমরা পূর্বে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সে অবস্থায় আর তিনি এখন নাট, তাঁহার প্রেমকল্পনা অতিমাত্র তেজস্বিনী উদ্ভাবিনী হইয়া তাঁহাকে দিবা রাত্রি প্রিয়তমের জন্য মস্ত শ্রায় করিয়া তুলিয়াছে । হৃৎখিনী অবলার প্রেমে বাস্তবায়নের বিশুমাত্র সহানুভূতি নাই, কারণ সে তাঁহার সংবাদ কিছুই জানে না, অপরের নিকটতো সম্পূর্ণই গচ্ছন্ন, কেবল আপনার হৃদয়াধারে আবদ্ধ থাকিয়া সে প্রেম নিত্য নব নব কল্পনা পান ভোজন করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইতে লাগিল । সময়ে সময়ে কল্পনারবে চড়িয়া বিচিত্র কল্পনার রাজ্যে মহানন্দে সে বিচরণ করিত, কখন বা দৃষ্টিস্তা নৈরাশোর ঝঞ্জাবায়ুর আঘাতে অবশাদগ্রস্ত হইয়া বিষাদ অন্ধকারেই গভীর গহ্বরে শুইয়া পড়িত । বাস্তবায়নের সহিত সন্তোষিনীর ইতঃপূর্বে বসতপুরে অল্প দিনের জন্য দুই একবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার পর বিচ্ছেদ সময়ে দুই একখানি পত্রও তিনি প্রাপ্ত হন । এই চাক্ষুষ দর্শন এবং পত্র কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সুখকল্পনার মনোহর নিঃতনের ভিত্তি ভূমির দৃঢ়তা সাধন করে । কিন্তু এমন কিছু ইচ্ছাতে প্রকাশ পায় নাই যাহাতে তাঁহার আশা পিপাসা চরিতার্থ হয় । মানুষ কি ভাস্কর ! বিশেষতঃ প্রেমবিকার-গ্রস্ত যুবক যুবতী । সে তিলকে ভাল মনে করিয়া বসে, শূন্য অট্টালিকা নির্মাণ করে । যে সকল পবিত্র কল্পনা কল্পনাভিত্তি নিত্য সত্য আদিশুভের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাবের গাভীর মত সৌন্দর্য্য রমণীয়তাকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করত অমর জীবের অনন্তজীবনের আবিষ্কার রূপে নিরন্তর চক্কর সম্মুখে ধরিয়া রাখে, তাহা চক্ষুচক্করগোচরীভূত প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় না হইলেও তদবলম্বনে মানবজীবন স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু অসার ভোগ সুখাসক্ত জীব সচরাচর সে পথে ঝাইতে চাহে না ।

হায় ! যদি কল্পনাতেই সুখী হইতে হইল, তবে নরক কল্পনা করিয়া কেন নারকী হইব ? কল্পনায় কেন স্বর্গভোগ করি না ? খরচত একই, পরি-
শ্রমেরও কিছু ইতর বিশেষ নাই। স্বর্গ নরক খুব কাছাকাছি। স্বর্গের
অস্তিত্ব আছে, নিত্যতা আছে, তাহার সুখ সৌন্দর্য্যও অনন্ত ; এ সম্বন্ধে কল্প-
নাও সত্য হইয়া আত্মার বৃত্তি সমুদয়কে নিত্যকাল পরিপোষণ এবং সৌন্দর্য্যে
বিভূষিত করিতে পারে। কিন্তু বাহার অস্তিত্ব অনেক সময় থাকে না, থাকি-
লেও যাহা চিরদিন সন্তোষ করা যায় না ; অথবা আদৌ যাহা দুঃপ্রাপ্য,
কিন্তু প্রাপ্য হইলেও আমার ক্ষণক্ষণসী ; কল্পনা শক্তি কেন তাহার জন্য
প্রাণ উৎসর্গ করে। অথবা পার্থিব সুখের অতীত অপার্থিব স্বর্গসুখকে
যাহারা কবিকল্পনা মনে করিয়া বসিয়া আছে, ইহা জীবনই বাহাদের সর্ব্বস্ব,
তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। সন্তোষিনী বুদ্ধিমতী ধর্ম্মভীরু নারী,
অপার্থিব অনন্ত স্বর্গের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস না করিত এমন নহে, কিন্তু তাহার
বিশ্বাস সংস্কার বাস্তবায়নের মত বলশালী ছিল না ; সুতরাং তাহা বর্তমান
ছাড়িয়া ভাবিতে, সুখ ছাড়িয়া স্নেহ ছাড়িয়া অনন্ত চৈতন্যের দিকে
প্রসারিত হইল না ; কার্গাকালে সে বিশ্বাস বিদ্যায়ৎ চমকিয়া তাহাকে ঘোর
নিরাশঙ্ককাত্তে ফেলিয়া গেল। সুতরাং সন্তোষিনী মিথ্যা। আমার অনিত্যের
উপর কল্পনার মারাপূরী গঠন করিতে ছাড়িলেন না। তাহাকে এখন বুঝান
বুঝা। শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিবে, দেখিয়া যখন প্রতিবাদ পাইবে তখন
মেহান্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন তাহাকে কল্পনার সুখ কিছু দিন ভোগ
করিতে দেওয়া যাক। ইহাতে ভালই হইবে, শিক্ষা পাইবে, ভবিষ্যতে
আর ও পথে সে কখন যাইবে না।

সন্তোষিনী মেয়েটী কে, তাহা এত জন আমরা পরিষ্কার করিয়া বলি নাই।
ইহার সবিশেষ পরিচয় এক্ষণে কিছু দেওয়া যাইতেছে। ইনি নিশানাথের
দ্বীপভরী কন্যা। পিতা বর্তমান আছে, কিন্তু তিনি কেবল জন্মদাতা মাত্র।
মাতা নাই। বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সেও কেবল কুললক্ষ্যের অকুপা হইতে
বাঁচিবার জন্য ; অর্থাৎ বহুবিবাহকারী এক হতভাগ্য কুলোনের সঙ্গে তাহার
এক দিনের জন্য অজ্ঞাতসারে বিবাহ হয়, তাহার পর সে ব্যক্তির সঙ্গে আর
দেখা শুনা নাই, আছে কি মরিয়াছে তাহাও কেহ কিছু জানে না। এই

সকল কারণে সন্তোষিণীকে এক প্রকার বিধবা বলিলেও বলা যায় ; আবার কুমারী মনে করিয়া লইলেও যে কিছু অন্যায় হয় তাহাও নহে। বাহাই হউক, মেয়েটী রূপে গুণে অতি মনোহর। তাহার নামের সঙ্গে স্বভাবের বেশ একতা ছিল। নিশানাথ নিঃসন্তান, এই অনাথ দুঃখিনী কন্যাটিকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন। লেখা পড়া বাহা কিছু সে শিখিয়াছিল তাহা নিশানাথেরই পরিশ্রমের ফল। বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত এবং পাঠ্যবোর্গ গ্রন্থগুলি তিনি তাহাকে বেশ করিয়া পড়াইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাহাকে দিয়া গ্রন্থ বিশেষ পড়াইয়া আপনি শুনিতেন এবং চিঠি পত্র লেখা-ইতেন। সন্তোষিণীর বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক, যুগ্মস্থ পড়া শুনা অপেক্ষা সহজজ্ঞান এবং চিন্তাশীলতা ভাবুকতা অতি গভীর ও প্রবল ছিল। স্বাভাবিক ধারণা শক্তি এত বেশী, যে সে সকল বিষয়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতে পারিত। ফলতঃ বুদ্ধিবার সম্বন্ধে তাহার একটু অসাধারণ ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। ইংরাজি ভাষাও জানিত, সহজ সহজ গ্রন্থ পড়িতে এবং বুদ্ধিতে পারিত।

পাঠক পাঠিকাগণ হয়তো এত ক্ষণ ইহার রূপের ছবি ধানি দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকিবেন। তাহাদের কৌতূহল আমরা কত দূর চরিতার্থ করিতে পারিব বুঝিতে পারিতেছি না। যদি এক কথায় সকলে বলিতে অসুমতি দেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে সন্তোষিণীর শ্রী টিক স্ত্রীলোকের মত। তাহার মুখমণ্ডল ললাট গুহুল চক্ষু কর্ণ নাসিকা দস্ত ওষ্ঠ হস্ত পদ গ্রীবা কণ্ঠ পৃষ্ঠ কটি বক্ষ এবং মস্তকের কেশরাশি প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তৎসমূহের সকালন ক্রিয়ার মধ্যে স্ত্রী প্রকৃতির কমনীয় সৌন্দর্য্য, অপূৰ্ণ মাধুর্য্য অনূভূত হইত। প্রতিভা-শালী সুকবি কাব্যলেখকগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত নাস্তিক নাস্তিকায় রূপ বর্ণন করেন তত দূর বিদ্যা আমাদের নাই। বিশেষতঃ চক্ষে দেখিয়া অন্তরে যে সংস্কার লাভ করা যায় তাহা লেখনীতে ব্যক্ত হওয়াও অসকঠিন।

অনেকে হয়তো মনে করিতেছেন, সেই জন্যই বুঝি সন্তোষিণীর শ্রী স্ত্রীলোকের মত বলিয়া এক কথায় আমরা সব কাজ শেষ করিয়া দিলাম। না, বাস্তবিক তানয়, ইহার ভিতর আরো কিছু গভীর বিজ্ঞান আছে, বাহ্য-

রাম শিশু তাহা জানেন। প্রকৃত কথাটা এই, যে স্ত্রীলোকের স্তীত্ব অর্থাৎ ভাবুকতা সরলতা কোমলতা ভীকৃত্য রসগ্রাহিতা প্রেমমাধুর্য্য ভীকৃত্য বালক-বৎ ক্রৌড়াশীলতা তাহার সঙ্গে তেজস্বীতা লজ্জা শাস্তি স্নেহ মমতা গাস্তীর্ঘ্য সহিষ্ণুতা নাই তাহাকে যথার্থ স্ত্রী আমরা বলিতে পারি না। কেবল কি নারী মূর্তি ধরিয়া স্ত্রীলোকের সাজ পোশাক পরিয়া সন্তান পালন করিলেই স্ত্রী নামে অভিহিত হওয়া যায়? কখনই না। আমরা পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক দেখি তন্মধ্যে অনেকে পুরুষভাবাপন্ন। স্ত্রী জন্ম পাইয়াও তাহার স্ত্রীত্বের উৎকর্ষ সাধন করে না। এই জন্য এ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের জয়নক প্রতিবাদ আছে। কেহ উপহাস করুন, বা অজ্ঞ বলুন, এ সংস্কার আমাদের কিছুতেই অপনীত হইবে না। বাহাকে নিংড়াইলে এক ফোঁটা রস পাওয়া যায় না, তাহাকে স্ত্রীলোক বলিতে ইচ্ছা হয় না। ব্যাকরণে দোষ পড়ে তাই বলিতে বাধ্য হই; কিন্তু মনের সঙ্গে মিলে না। আমরা যে কুলবালার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে বাইতেছি অনেকে সে জাতীয় স্ত্রী নহে। ইহার প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি, এই উপন্যাসের ভিতরেও সেরূপ দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রূপ বর্ণনার আর আমাদের বড় প্রবৃত্তি নাই। তবে পাছে পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হন, তাই আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। একটু বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি সহিত সকলে ইহা পাঠ করিবেন।

এই অলোকসামান্য বরাহিনীর চক্ষু পটোল চেরা, কি চুল কালভুজঙ্গিনীর মত; হস্ত মৃণাল সদৃশ, কি কটি কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ; ইনি বিস্মোক্তা, কি ময়ালগমনা, কি ধ্বজনগঞ্জননয়না; এত সূক্ষ্ম হিসাব আমরা দিয়া উঠিতে পারিব না; রূপে শুণে মিশিয়া তিনি অতি গৌরবশালিনী প্রভাবতী দিব্যাক্তী রমণী ছিলেন এই পর্য্যন্ত কেবল জানি। যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, তখন তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নববোবনপ্রভায় প্রদীপ্ত এবং বিকসিত হইয়াছিল। পাদমূল হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত বেখানে বাহা ফুটিবার এবং পূরিবার তাহা ফুটিয়াছিল এবং পুরিয়াছিল। আকৃতি নাতীক্ষী, কিম্বা সূক্ষী বলিলেও বলা যায়। অর্থাৎ তেমন দীর্ঘ নয়, যে কাপড়ের ওসারে কুলায় না, কি পায়ের গোড়ালি ঝানিকটা বাহির হইয়া থাকে। সে দীর্ঘতার ভিতর

মনের মহত্ব এবং ঔষার্থ্য্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। অঙ্গ সকল বধা পরিমাণে সর্ব্বঙ্গ সুন্দর রূপে পরস্পরের সহিত সন্নিবিষ্ট ছিল। তাঁহার অলকাবলী-শোভিত সুন্দর ললাটের নিম্ন দেশে প্রোজ্জ্বল এবং আরও লোচন হয় মধুর প্রেমরাগে নিরন্তর রঞ্জিত থাকিত এবং গৌরকান্তির সুন্দর লাবণ্য ছটার, কোমল কণ্ঠের শ্রবণমনোহর বাকানিনাদে ও উৎসাহ-পূর্ণ কাব্যাদম্বতায় নিশানাবের আলয় লক্ষ্মীর আলয় রূপে প্রকাশ পাইত। সন্তোষিণী নানান্তে বিধৌত স্নিগ্ধোজ্জ্বল গাত্রে নীল কোশেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক পরিমার্জিত কৃষ্ণ সুন্দর কুটিল কেশদ্বয় পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া যখন পূতভাবে মাসী ঠাকুরাণীর অন্য ঠাকুর ঘরে বিচিত্র বর্ণের সুগন্ধ কুসুমাবলী পুষ্পপাত্রে পৃথক পৃথক রূপে সাজাইয়া রাখিতেন এবং তাহা চন্দনচর্চিত করিতেন, তখন তাঁহার সেই পবিত্র মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব দেবশ্রী পরিস্ফুটিত হইত। কুসুমরাশির বেত পীত নীল লোহিত বর্ণের উপর তল্লীয় গৌর অঙ্গের শুভ্র আভা নিপতিত হইয়া উভয় উভয়কে বেন সৌন্দর্য্যকিরণে ভাসাইত। সচেতন ফুলের সঙ্গে অচেতন ফুল মিশিয়া একাকার হইয়া বাইত। তৎ-বহু্যর তাঁহার অনিন্দনীয় অপরূপ শোভা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি অবনীতলে স্বর্গের ভগবতীর প্রতিচ্ছায়া দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। নারী-যৌবনের বিভূতিময় বাহু সৌন্দর্য্যের উপর যখন ভগবত্তক্তির সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নারশি প্রতিবিম্বিত হয় তখন দ্বী প্রকৃতির প্রকৃত গৌরব এবং রমণীয় শোভা আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই।

সন্তোষিণীকে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বেশে দর্শন করিয়াছি। তিনি যখন নানা অভরণে সুসজ্জিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণের পট্ট বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক সুগন্ধ তৈলচর্চিত বেনীবন্ধ মস্তকে অলঙ্কারিত পথে সগৌরবে কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে বাইতেন এবং সেই বেশে সমবয়স্কা প্রতিবাসিনী কামিনীমণ্ডলে বিরাজ করিতেন তখনকার এক প্রকার শোভা; আবার যখন মুক্তকেশে চকলা চপলার ন্যায় ক্ষিপ্ৰগতিতে গৃহকার্য্যে কিম্বা নিশা-নাথের পান ভোজনের অয়োজনে ব্রতী থাকিতেন তখনকার আর এক প্রকার শোভা। সময়ে সময়ে নিশানাথ তাঁহাকে ইংরাজী পুস্তক হইতে ভাল ভাল গল্প পড়িয়া শুনাইতেন। তৎকালে সন্তোষিণীর শিকাপিপাসু

চিন্তা এমনি কোত্‌হলাক্রান্ত হইয়া নিশানাধের পানে চাহিয়া থাকিত, যেন মনে হইত, তাহার বিস্ফারিত নয়ন, প্রফুল্ল মুখপদ্ম এবং বিকসিত অপরা-
জিত পুষ্প সদৃশ কর্ণদ্বয় তাহা অতিমাত্র ব্যাকুলতার সহিত পান করিতেছে ।
তৎকালীয় কখন কখন তাহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার উন্মাদকর মৃদু মধুর হাস্য-
রসের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত । সে হাসি অক্ষুট বটে, কিন্তু তাহার
ভিতর গেমতন্ময়ের কত যে গভীরতা বিলাসচাতুর্য্য ফুটিয়া উঠিত তাহা
আর বলিয়া উঠা যায় না ; যে চক্ষু তাহা স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছে সেই
কেবল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম । দুঃখ অভিমানের সময়
শিশিরপৌত স্থলপদ্মের ন্যায় সে মুখের শোভা হইত । আবার নিরাশ ভাবনা
ভুচ্চিত্তায় মগ্ন হইয়া যখন তিনি বসিয়া থাকিতেন তখন অন্তগামী পূর্ণ-
চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার চাকুচন্দ্রানিন ক্রমে বিবাহ অন্ধকারে ডুবিয়া যায় ।
নানা সময়ে নানা বেশে এই রমণীরদ্বকে আমরা দেখিয়াছি, সে সমস্তই
অতি স্বপ্নানন্দকর ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ যে ঠাকুর ঘরে দেবপ্রতিমার
বেশে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না ।
সমীরণ সঞ্চালিত নিবিড় অলঙ্কার সদৃশ সেই কুটিল কুন্তলরাশি কি
লোচনানন্দকর ! অচিরম্রাত সেই হুহু স্রুগোল স্নিগ্ধোজ্জ্বল অন্ধকাস্তি কি
প্রভাবশালিনী ! সারদীয় চন্দ্রমার অমিয় মাখা কমনীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় সে
রূপের জ্যোতি, দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, স্বর্গের দেবতারাত্ত তাহা পুনঃ
পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অধিক কণ সে দিকে যে সে লোক চাহিয়া
থাকিতে পারে না ; কারণ তাহাতে মোহ আছে, মহামায়ার মহাশক্তি আছে ।
সন্তোষিণীর চাকু গণ্ডস্থলে, মুখমণ্ডলে, নয়ন কমলে, গ্রীবাদেশে, কর্ণদ্বয়ে
ও বাহুশৃঙ্গে স্ত্রী প্রকৃতি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত । প্রক্ষুটোন্মুখ
অথবা অর্দ্ধবিকসিত বড় বড় মার্শেল নীল কিম্বা বসরাই গোলাপ ফুলের সঙ্গে
এ রূপের তুলনা হিলে যদি কোন দোষ না হয় তবে আমরা তাহাই দিলাম ।
দেবমন্দিরে পূজার আয়োজন কালীন তাঁহার যে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের
কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ এমন সিদ্ধান্ত না করেন
যে তিনি এক জন অতি অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণা তপস্বিনী নারী ছিলেন ;
কঠোর সাধন ভজন, ব্রতাহুতানের বাহ্য আড়ম্বর অধিক কিছু তাঁহার ছিল

না, পুষ্প চন্দন নৈবিদ্যাদি দ্বারা নিজে কোন দেবদেবীর পূজা অর্চনাও তিনি বড় একটা করিতেন না, কেবল মাসী ঠাকুরণীর ভয়ে কয়েক বৎসরের জন্য একবার শিবপূজার ত্রুত লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বাহ্য-রামকে পাইবার জন্য। অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠান যদিও তাহার বেশী ছিল না, কিন্তু স্বাভাবিক ভক্তিতে ভগবানকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, এবং সেই ভালবাসার ভাবে, পুষ্পচয়ন, চন্দন ঘর্ষণ, দেবমন্দির পরিমার্জন, ভোগ নৈবিদ্য দূপ দীপ কুসুমাদি দ্বারা পূজার আয়োজন ইত্যাদি কার্যো নিবিষ্টমনা হইয়া এতই আনন্দ এবং দেবপ্রসাদ সন্তোষ করিতেন যে, এক জন হুই পাঁচ ঘণ্টা পূজা ধ্যান স্তব স্তুতি ত্রুত উপবাস করিয়াও তাদৃশ শ্রুত লাভে সক্ষম হন কি না সন্দেহ। নিষ্ঠাশূন্য মনে, পুত্ৰ চিন্তে, প্রফুল্ল হৃদয়ে যে নারী ঠাকুরঘরে নিত্যপূজার আয়োজন করে দেবতার। তাহার প্রতি বোধ হয় অভিশর সমুদ্র হন, সেই জন্য তৎকালে তাহার মুখশ্রীতে ঈদৃশ দ্বিবা শোভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কুমারীগণ, তোমরা যদি ভাল বর চাও, তবে ষড়িকন্যার মত আক্লাদিত মনে ঠাকুরঘরের পরি-চর্যা আরম্ভ কর ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রেমতত্ত্ব ।

সন্তোষিণী এক দিন যাহাকে হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া একাকী গোপনে গোপনে ভালবাসিতেন সেই হৃদয়রঞ্জন প্রেমভাজন একপে সখরীরে তাঁহার সমীপাগত। প্রিয়তমের বিদ্যমানতার সুমিষ্ট আত্মাণে তাঁহার গুল্ল প্রণয় শতধা উৎসারিত হইয়া চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পথে বাহিত হইতে লাগিল। অমুরাগের আবেশে সমস্ত দেহ মন উৎক্লম্ব হইয়া উঠিল।

তত্ত্বজ্ঞ রসিক সাধুগণ বলেন, প্রেম পক্ষপাতী, এবং অন্ধ। বিশেষ কোন এক ব্যক্তিতে একাধারে তাহা ঘনীভূত না হইলে তাহার মাদুর্য্য এবং প্রভাব

বুঝা যায় না। যখন উহা অন্ধভাবে ব্যক্তিগত ভাবে পক্ষপাতী হইয়া পড়ে, তখন কেবল সেই ব্যক্তির সম্বন্ধেই প্রার্থনীয় হয়, আর কাহাকেও ভাল লাগে না। অপর সহজ ব্যক্তি রূপে শুধে ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অন্ধপ্রেম তাহাতে মজে না। সে অন্য পাঁচ জনকেও ভালবাসে, বাহাকে যত টুকু দেয় তাহা দান করে, কিন্তু কর্তব্য জ্ঞানে। বিশেষ প্রণয়বদ্ধ ব্যক্তিকে সহজে প্রাণের টানে সর্কাস্তঃকরণে ভালবাসে। এই জন্য তাহার বেশ কালপাত্র জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভূত ভবিষ্যৎ অগ্র পশ্চাৎ ভাল মন্দ ফলাফল সে ভাবে না। আগে আপনাকে বিন্মৃত হয়, তখনস্তর বাহাকে ভালবাসে তাহার গুণাগুণ অবস্থা সমস্ত ভুলিয়া যায়। সন্তোষিণী আপনি কি অবস্থার লোক, সে বিষয় কি সম্বন্ধ, না কুমারী; বাহ্যারামের প্রতি তাহার এরূপ আসক্ত হওয়া উচিত কি না, উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক, এ সকল চিন্তা তাহার মনে কখনই উদয় হয় নাই। তাহা সে ভাবিতেও চায় না, কেবল হৃদয়ের উৎখলিত প্রেমাবেগ ঢালিয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে চায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার তর্ক করিয়া কেহ কাহাকে ভাল বাসিতে পারেও না। সেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রেম কেবল আমাদের বাহ্যারাম পণ্ডিতের পক্ষে পোষায়। প্রকৃত প্রেম অযত্নসম্পন্ন হেতুবর্জিত, তাহা শুভ যোগের ফল। বাহারা ইহার ভুক্তভোগী তাহারাও জানে না কেন ভাল বাসে। প্রেমের ধর্ম বেদ বিধি দেশাচার এবং সাধারণ লৌকিক নীতির অভ্যুত। এ সমুদায়কে অগ্রাহ করিয়া সে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বধেচ্ছা গমন করে। তাই প্রেমরসমত্ত বৈকবেয়া গান করিয়াছে, “কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে আতি কুলের ভরম, কবে যাবে ভর ভাবনা স্মরম, হায় আমি কবে হব দুঃখচার।” রাধাকৃষ্ণের প্রেমে তাই প্রচলিত দাম্পত্য ধর্মও উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে রস থাকে না, আকর্ষণ প্রলোভন কমিয়া যায়; তখন উহা চিকিৎসালয়ের শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপার হইয়া উঠে। যেখানে উপযোগিতা, দৈবনির্ভরতা, প্রকৃতিগত একতা থাকে সেইখানেই ইহার আবির্ভাব হৃষ্টিগোচর হয়। প্রেমবন্ধনের এই মাত্র প্রমাণ, যে মনে হইবে, এইটী আমারই জন্য ঠিক করিয়া মাজিয়া বসিয়া মাপিয়া জুঁকিয়া কাটিয়া ছাটিয়া

জগদ্বানু প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য দেখা যায়, আপাততঃ যেখানে কোন সৌন্দর্য্য নাই, বরং হঠাৎ জ্ঞান হয় অনেক বিষয়ে বিসৃষ্ট, সেখানেও প্রেম অক্ষুরিত হইয়াছে, যেন জলে জল মিলিয়াছে। হৃইটী আত্মা বিধাতার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আপনা আপনি এক জায়গায় আসিয়া ভাবে রুচিতে ইচ্ছায় মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই পক্ষপাতী অন্ধপ্রেম আবার এক দিকে মানুষকে প্তবৎ করিয়া ফেলে, এবং পরিণামে বোর নিরাশাককারে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে মজিয়া যদি আর আর সকলের প্রতি মানুষ উদাসীন প্রেমহীন হয়, তাহা হইলে প্রেমে ব্যভিচার হোষ ঘটে। প্রেমের পক্ষপাতিতা ও অন্ধতার তাৎপর্য্য তাহার বনীভূত অবস্থা দর্শন করা; এক আধারে বনীভূত হইয়া তাহা অগংময় বিস্তার হইয়া পড়া। বাহাতে বিভক্ত চৈতন্যের, নির্মল বিবেকের যোগ নাই, অপরিবর্তনীয় সার্ব-ভৌমিক নীতির অনুমোদন নাই, তাহা প্রেম নহে, অবিদ্যার খেলা। যে প্রেম স্বভাবের সরসভূমিতে সজ্জাত হইয়া দ্বিব্যক্তানের অনুসরণ করে, তাহা অনন্তের নিত্যপ্রেমের অঙ্গীভূত; তাহাতে ভয় নাই, বিকার নাই।* তদবলম্বনে নিরাপদে প্রেমধামে উপনীত হওয়া যায়। প্রকৃত প্রেম হেতুবিহীন হইলেও তাহা স্বর্গীয়, সুতরাং পবিত্র।

প্রেম এক দিকে অন্ধ পক্ষপাতী, অপর দিকে সেন্সিবার চক্ৰবানু। আর কাহাকেও চিনিতে পারুক না পারুক, বাহাকে সে ভালবাসে তাহার প্রত্যেকে পরমাণুর মধ্যে সে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়। অন্ধভাবে আপনার বাঞ্ছিত বস্তুকে দেখিয়া সে প্রথমে বিমুগ্ধ হয়, তদনন্তর তর বিতর করিয়া তাহাকে বুঝিয়া লয়, তদ্বিষয়ে প্রবকিত হয় না। কিন্তু সচরাচর এই হোষটী ঘটে, যে এক গুণ ভালবাসাকে মোহ বশতঃ সে দলপ্তন বনে করে। তবে এ কথা সত্য, যে বাহাকে ভাল বাসিয়াছে সে তাহার স্বভাবের গুণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে কেহ তাহাকে বিদায় করিতে পারে না। নরনারীর অকৃত্রিম প্রেমের ভিত্তর প্রেমিক-চূড়ামণি ভগবানের অনেক কোশল চাতুরী আছে। ধন্য তিনি! বলি-বারী তাঁহাকে! যিনি প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া দুইকে এক করেন।

সন্তোষিনীর এ প্রেম কোন্ জাতীয়, তাহা পরে জানা যাইবে ; সন্দোষ কি নির্দোষ, সরল কি কপট, স্বার্থহীন কি নিঃস্বার্থ, দৈহিক কি আধ্যাত্মিক, কি দূরে মিশ্রিত, তাহাও নির্দ্ধারিত হইবে । আমরা, লোকের অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি না । কেবল এই জানি, মানুষ অবস্থার দ্বাস এবং অবস্থার প্রভু ; দ্বাস হইয়া অশ্মে, প্রভু হইয়া স্বর্গে যায় । অসার অনিত্য অড় অগতে জন্মিয়া শেষে তাহা হইতে সে সার নিত্য এবং পরল হইতে অমৃত উদ্ধার করে । ইহারই নাম মানবতাব্যবহার বিকাশ এবং উন্নতি । অথবা পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতার উৎপত্তিক্রিয়া ।

লজ্জাবতী কুলবালা লোকভয়ে অন্তরের দুর্দমনীয় ভালবাসাকে এত দিন ক্রমাগত চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে ক্ষীরবৎ ঘন করিয়া তুলিয়াছে । কোন রূপে তাহা বাহির হইবার পথ পায় নাই । প্রাণ কাটিয়া, চক্ষুদ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া অশ্রুরূপে সময়ে সময়ে তাহা বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহাতে গাঢ়তা যে কিছু কমিয়াছিল তাহা বোধ হয় না । বয়ঃ আরো ঘনতর হইয়াছিল । বাহির হওয়াই বাহার নিয়তি, অন্তরের উদ্গম ভিতর হইতে এক দিকে বাহ্যকে ঠেলিয়া দিতেছে এবং বাহ্যের আকর্ষণ অপূর্ণ দিক দিয়া বাহ্যকে বহির্গুণে টানিয়া আনিতেছে, তাহার উপর অধিক দিন চাপাচাপি করিলে থাকিবে কেন ? তাহার গতি রোধ করিবেই বা কে ? সচরাচর ইহাতে মানুষ পাগল হইয়া যায় । সন্তোষিনীর প্রেম প্রায় শেষ সীমার আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এক্ষণে তাহার কোন একটা বিহিত হওয়া উচিত । স্বভাবের সমস্ত প্রতিশক্তি এবং ক্রিয়ার সমতা রক্ষা না হইলে অগ্নং সংসার চলে না । কি অন্তর অগ্নিতে, কি বহির্জগতে, এইরূপ সংগ্রাম এবং সামঞ্জস্য ক্ষতি ও পূরণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে । সন্তোষিনীর জ্বরবাবেশ বীণ ভাঙ্গিয়া নিষ্কান্ত হইবে তাহার স্বেপন এক্ষণে সমুপস্থিত । পর্ত্তনিসিন্ধিনী তটিনী সকল পারে পায়ে বাধা ঠেলিয়া, ঘুরিয়া কিরিয়া যেমন আপনার পক্ষ্য স্থানের দিকে নামিয়া আইসে ; কখন সৃষ্টিকার অভ্যন্তর দিয়া, কখন বা শৈলমালা উদ্ভজন করিয়া চলিয়া যায়, নর নারীর লক্ষণত গুঢ় ভালবাসার স্রোত তেমনি বিপুল বিশ্বাশির মধ্যে আপনি আপনার পথ করিয়া লয় । সন্তোষিনীর প্রেমগঙ্গা বাহ্যারামের প্রীতিবধূনার সঙ্গে কোন

পথে কি প্রণালীতে আসিয়া মিশিয়াছিল তাহার অনুধাবনে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। লীলাবিহারী প্রেমময় বিধাতার হেহার ভিতর কত রঙ্গের খেলা, শিক্ষা ও শাসন নিবদ্ধ আছে তাহা দেখা যাউক। কি অপূৰ্ণ পুরাণ শাস্ত্র রচনার জন্য তিনি এই কন্যার জন্মের প্রেমশ্রোতঃ উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার তত্ত্ব মনোবোণপূৰ্ণক আমরা পাঠ করি। জাতীয় ইতিহাসে এবং প্রত্যেক নব নারীর জীবনকাহিনীর পরলময় লৌকিক ঘটনারাজীর ভিতর হইতে কালে কালে আশ্চর্য্য রূপে তিনি অমৃত উৎপাদন করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি; এক্ষণে বাস্তবায়ম সন্তোষিণীর চরিত্রে তাঁহার কি মঙ্গলসঙ্কল সংসিদ্ধ হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হই। পৃথিবীর অনন্ত কার্য্যাকারণবিমিশ্র বিচিত্র ঘটনাবলীর চরবগাছ গভীর অন্ধকার শুভামধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ভগবান্ প্রজ্ঞাপতি নিত্য নিত্য নব নব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি পুরাতন নিজজীব অবস্থার ভিতর হইতে নূতন সৃষ্টি বিকাশ করেন, এবং পুঁতি গন্ধময় গলিত পদার্থ-রাশিকে মন্থন করিয়া শুদ্ধারা প্রকৃতির চিরনবীনত্ব এবং উৎপাদনী শক্তিকে পরিপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মঙ্গল নিয়মে সরস ফুলের ফল ফুলে শোভিত তরুলতাগণ পার্শ্বিক অঞ্জলি দুর্গন্ধময় গলিত ঘৃণা পদার্থ দ্বারা পুষ্টিতা প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিকে তিনি পুরাতন হইতে দেন না; পুরাতনকেই প্রতিনিয়ত নবভাবে পরিণত করিতেছেন। প্রেম এই নবীনত্বের চির-প্রসূতি। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, তাঁহারই প্রেমমভাবে মনুষ্য নবজীবন লাভ করিয়া বহুবিশ ঘটনার উপলক্ষে অনন্ত কাল তাঁহাতে নব মন সৌন্দর্য্যস্থধা সম্ভোগ করিতে থাকে। মানবজীবনের উপন্যাসের ভিতর তিনি কেমন লীলা বিহার করেন, তাই দেখাইবার জন্যই এই “পরলে অমৃত” রচিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রেমোৎপাদন ।

বাঙ্গারাম বহু দুঃখ কষ্ট সহিয়া মাতুল গৃহে আসিয়াছেন, এ কণা শ্রবণে সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। এক বাড়ীতে ভাই ভগিনীর ন্যায় তিনি এবং সন্তোষিণী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিশানাথ এবং তদীয় পত্নী এই দুইটীকে সন্তাননির্কীর্ণে সন্মুখে প্রতিপালন করিতেন। তাহাদের অবস্থানে বাড়ীর শ্রী ফিরিল। নিশানাথ এক জন সংকুতমনা উন্নতিশীল শিক্ষিত হিন্দু, পড়া শুনার বেশ চর্চ্চা রাখেন, বাড়ীতে পুস্তকাধারে অনেকগুলি সদগ্রন্থ আছে, এই জন্যই এখানে বাঙ্গারামের থাকিবার এক প্রধান আকর্ষণ। নিশানাথ যদি সুস্পষ্ট বুদ্ধিতে পারেন, তাঁহার পালিতা কন্যাটী বিধবা, তাহা হইলে চাই কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত বিধি অনুসারে তাহার বিবাহও দিতে পারেন। কিন্তু সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় সংবাদ এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সন্তোষিণী গৃহকার্য্যে অনেক সহায়তা করে ; লেখা পড়া শিক্ষা জ্ঞানানুশীলন বিষয়েও তাহার যেমন অনুরাগ, আবার রন্ধন পরিবেশন, গৃহসজ্জা, জলধাবার প্রস্তুত করা, ভ্রাবাদি গোঁচান এ সকলেতেও যথেষ্ট আস্থা এবং দক্ষতা। সেবা উপলক্ষে সে বাঙ্গারামের নিকট বার বার আসিত, এবং তাঁহার প্রতি আপনার গুণ্ডা শ্রবণ গোপনে মনে মনে চরিতার্থ করিত। সন্তোষিণী বাঙ্গারামকে দাদা বলিয়া ডাকে, জলধাবার দের, তাঁহার অনীত এইগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখে, অন্যান্য ফাই ফরমাস খাটে, কখন বা পড়া বলিয়া লয় এবং জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করে। এবস্থিধ নানা কার্য্যোপলক্ষে নানা সময়ে সে ছদ্মের বাঙ্গানীর বাঙ্গারামকে দ্বিবসের মধ্যে অনেক বার দেখিতে পাইত। বতই কাছে আসিত, কথা কহিত, এবং দেখিত, ততই আপনাকে সে কৃতার্থ মনে করিত। বিশেষ প্রণয়যোগে অপরেক অজ্ঞাতসারে সন্তোষিণী বাঙ্গারামের সেবা করিতেন, তিনি ব্যতীত তাহা

অন্য জানিতে পারিত না। এইরূপে সেই প্রেমাহুরক্তা কামিনী আকার হইতে, ভাব ভঙ্গিতে আন্তরিক অনুরাগ প্রিয়জনকে সমীপে ব্যক্ত করিতে লাগিল,—মোহাক্ত হইয়া আপনাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার প্রেম এমন এক আধারে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে সেখানে সহজে চরিতার্থ হইবার নয়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন সে অন্ধের ন্যায় পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, বাস্তবিক সত্য তত্ত্বে এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু এখানে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা বিশেষ উপযোগিতা ছিল, নতুবা এমন ঘটিত না।

বাস্তবিক মনের যে অবস্থা লইয়া পিতৃালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই আছেন। তিনি স্বয়ংই এক অভিনব রাজ্য, অপরের মনোগত ভাব বুঝিবার তাহার অবসর বা প্রবৃত্তি নাই। যে বিস্তীর্ণ চিন্তারাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে গিয়া তিনি পড়িয়াছেন তথা হইতে কত দিনে যে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন কেহই বলিতে পারে না। তবে স্বভাবের কার্য একে-বারে তিনি বন্ধ করিতে পারেন নাই। হৃৎক বিষাদে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিভর্কে জড় কঠোর হইয়া গেলেও উপকারী বা অনুগত জনের প্রতি ভালবাসা কতকটা ছিল। অনাথা বলিয়াই হউক, কিম্বা বুদ্ধিমতী শাস্ত্রভাবা প্রিয়বর্ষনা বলিয়াই হউক, সন্তোষিনী তাহার স্নেহভাগিনী হইয়াছিলেন। কথাবার্তার চাল চলনে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সে স্নেহ ভালবাসা সন্তোষিনীর প্রেমপিলাসার স্বার্থ উত্তর স্বরূপ নহে, তাহাকে সাধারণ ভদ্রতা বা দয়ালুতার পরিচয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটু বিচক্ষণতার সহিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, উভয়ের প্রকৃতির মূলে অলঙ্ঘিত ভাবে আরও কিছু নিগূঢ় প্রমোদকর্য এবং মিলনোপযোগিতা ছিল, তাহা তখন কেহই জানিতে পারে নাই। সন্তোষিনী সাহস করিয়া স্পষ্টরূপে কোন কথা বলিতে পারে না, পারিলেও কৃতকার্য হইত কি না সন্দেহ; কেন না বাস্তবিক তখন যে রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাহার প্রেমতত্ত্বের কোন সংবাদ বা রসসাহচর্য পৌঁছে নাই। সন্তোষিনী যে কিঞ্চিৎ প্রীতি স্নেহের চিহ্ন দেখিতে পার তাহাকে আপনার ভাবের প্রতিকরণ ভাবিয়া মনে মনে আশস্ত হয়। কলতঃ বাস্তবিক তাহাকে চায় না ইহা সে কখনো বিধান

করে নাই; বরং টেহাই তাহার মূঢ় সংস্কারে যে আপনি যেমন ব্যাকুল পিপাসু, সেও তেমন; বেশী না হউক, সমান সমানত বটেই। অনেক দিনের ভ্রান্ত সংস্কার এইরূপে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সে ভ্রম দূর হইবার কোন উপায় ছিল না। যদি কখন নিরাশ অবিশ্বাস আসিয়া চিস্তকে আন্দোলিত করিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ঘটনামূলক অভ্রান্ত প্রমাণ সন্তোষিণীর হস্তগত ছিল। কার সাধ্য সে সমস্ত প্রমাণ কেহ খণ্ডন করে? বাহ্যারামের প্রতি তাহার ভালবাসা হৃদয় সংশয়রহিত জ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা জ্ঞানে মানুষকে কত দূর অন্ধ করিয়া রাখে তাহা আমরা এ স্থলে দেখিতে পাইলাম।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং তাহার কল্পিত অভ্রান্ত প্রমাণ দর্শন করিয়া সন্তোষিণীর সাহস ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। কোন দিন মুখ তুটিয়া বলিয়া ফেলিবে ফেলিবে এইরূপ মনে করে। সময়ে সময়ে অন্য মনস্তত্ত্বের মত বাহ্যারামের প্রতি চাহিয়া থাকিত, চোখো চোখি হইলে নয়ন ফিরাইয়া লইত। বাহ্যারাম যদি কোন কার্যের জন্য তাহাকে ডাকিতেন, কিম্বা মমতা প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিতেন, তাহা সে বিশেষ ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ মনে করিয়া লইত। একরূপ প্রেমকল্পনা এক প্রকার রোগ বিশেষ, স্ত্রী পুরুষ কেহই ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কত বুঝা এ অন্তঃপাগল হইয়া গিয়াছে। পথের ডিখারী হইয়াও পথচকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চায়।

এইরূপে একাধারে নির্কিঞ্চে সেই প্রেমামুরাগ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনের একটা বৃত্তি প্রবল হইলে বুদ্ধি কল্পনা ইচ্ছা উৎসাহ আশা সমস্তই তাহার অধীন হইয়া পড়ে। এক আলোকে সমস্ত জীবন আলোকিত হয়। তদবস্থায় সে আপনি যেমন অনেকেও ঠিক তেমনটি মনে করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে এত অমুরাগ, অন্ধামুরক্তি সত্ত্বেও সন্তোষিণীর হৃদয় বেন খালি খালি বোধ হইত। বিশ্বাসের ভিতর অবিশ্বাস, আশার ভিতর সংশয়, উৎসাহের ভিতর নিরাশা লুক্কায়িত থাকিয়া বেন তাহাকে এক একবার কাতর করিয়া ফেলিত। স্বভাব আপনাই প্রমাণ করিয়া দিতে লাগিল, যে তাহার হৃদয়ভিত্তিক স্ত্রী বাহ্যারামের মনস্তত্ত্বময়

এখনো স্পর্শ করে নাই, উভয়ের মধ্যে এখনো সমস্ত দূরত্ব আছে নাই ।
উধাপি কি মোহ, হ্রাশ। মিথ্যা কল্পনা আসিয়া আবার সে সমস্ত অভা-
বকে ভুলাইয়া দিত। এ দিকে এই অবস্থা, অপর দিকে শান্তারাম একাকী
এক নির্জন গৃহে বসিয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, বিচার চিন্তা করেন, মধ্যে
মধ্যে সেই পুষ্পোদ্যানের গিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার জন্য একটী
স্ত্রীলোক আকুল হইয়াছে, দুঃখে মরিতেছে, জ্বরমধ্যে ঘনীভূত প্রেম সঞ্চর
করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সংবাদ তিনি কিছুই জানেন না । সর্কদা যেন
উদ্মনা, চিন্তা যেন বিজ্ঞানসমুদ্রে নিমগ্ন ; আত্মবিশ্মৃত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলপ্রায়ে
নিরন্তর তিনি ভাসিতেন ।

বাগ্ধারামের আন্তরিক প্রকৃতিতে যেমন, বাহ্য আকারেও তেমনি
কিছু বিশেষত্ব ছিল। এক্ষণে তিনি যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
শরীর সুস্থ সবল নিরলস, মূর্তিটী ঋষি তপসীর ন্যায় প্রশান্ত সৌম্য ।
সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শান্তির স্নিগ্ধপ্রভা বিরাজিত। এমন এক প্রকার
অকৃত্রিম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল যাহা সহস্রাচর অন্যত্র দর্শন
হুলত নহে। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে তিনি নিজে জানিতেন
না কেমন তিনি সুন্দর পুরুষ ; যেহেতু, শরীরের ধবর লইবার তাঁহার প্রবৃত্তি
এবং অবসর ছিল না। এইজন্য তাহার আকর্ষণ অধিক। বিলাসী সখা
সুবক বহু বহু আপনাতঃ দৈহিক শোভার উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাতে এই
কল হইত, যে বাহ্য কিছু তাহার বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্য থেকে আলাদা
বিকৃত হইয়া যায় ; বস্তুতঃ আপনি আপনাকে বৈরাগ্য সুলভ শ্রীমন্ত সে মনে
করে তাহা নয়, বরং তাহার বিপরীত। “আহা আমি কেমন দেখিতে
সুন্দর ! এমন যুগের শোভা আর কি কাহারো আছে ? পোষাক পরি-
আমাকে বেশ দেবার !” এইরূপ ভাবিয়া যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ আপনাতঃ
পানে চায়, নানা প্রকারে চুল কিরায়, কেবলই আরনার মুখ দেখে, তাহার
সৌন্দর্য্য দর্শনে আকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, মনে রাগ হয়, লজ্জা হয়। যে-
ইবার প্রবল পিপাসাই তাহার সৌন্দর্য্য বিনাশের কারণ। সে উপহাসের
পাত্র হইয়া পড়ে, যে যেতু তাহার অতিপ্রায় মন, অহঙ্কার হুঁসিাসনা তাহার
ললাটে মুখমণ্ডলে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করে। রক্ত দূষিত হইলে লহর

কৃত্রিম বেশ ভূষার যেমন শরীরের লাভণ্য রক্ষা করা যায় না, তেমনি মনে যদি নীচ কামনা অসাধু কল্পনা বলবতী থাকে, তাহা হইলে রাশি রাশি অগ্নিকি তৈল দ্বারা কেশ বিন্যাসষ্ট কর, আর নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণে মুখই দেখ, আর বিচিত্র বসন ভূষণেই অন্ধকে সাজাও, কিছুতেই আপনাকে প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিতে পারিবে না। বাহ্যারামের ভিতরে নির্ব্যাণের সাম্য এবং নৈতিক নির্মলতা ছিল ; তন্নিমিত্ত তিনি আপনি স্মরণ কি না তাহা জ্ঞানিতেন না ; আহার পরিচ্ছদ আড়ম্বরবিহীন ; মিতাচারিতা আত্মসংযম প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পবিত্র প্রতিভা তাঁহার এই পবিত্র সৌন্দর্যের নিদান। তরলমতি চক্কেল্লির যুবকগণ তাহা কোথায় পাইবে ? সন্তোষিণীর চক্ষে বাহ্যারামের এই অভিনব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি ইহার বিনিময়ে মহার্ঘ্য রত্নভরণভূষিত রাজপুত্রকেও প্রার্থনা করিতেন না। কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে গেলে সেই প্রেমোন্মাদিনী স্মরণীয় পক্ষে তাহা দারু পুস্তলিকাঙ্কুরপ ; কেন না, তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেমরস সঞ্চারিত হয় নাই। সন্তোষিণী যাহাকে দূর হইতে ভাবিয়া সুখী হইতেন, কল্পনার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া হৃদয়সিংহাসনে যাহার পূজা করিতেন, তাহাকে চক্কের নিকট পাইয়াও তাঁহার শিলাস মিলিল না ; অপিচ তাহা বর্জিত হইয়া উঠিল। কিরূপে এই বিজ্ঞানরসপিপাসু চিন্তানিগ্রহ ভজ্যুবার জহরকমল প্রেমরসাভিষিক্ত হয় তাহাই এখন তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল ; তিনি কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। প্রস্তুতভূমিতে কূপ খননের ন্যায় চুরুহ কার্যে তিনি ব্রতী হইলেন। অতি উৎকৃষ্ট নির্মল শীতল প্রেমবারি তাঁহার মধ্যে আছে, কিন্তু অনেক পতীর নিয়ে ; শুভ বোণে তাহা উৎসারিত হইবে, এবং এক বার উৎসারিত হইলে আর তাহার বেগ সহজে ধামিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বশীকরণ মন্ত্রণা।

নিশানাথের ভবনটী গ্রামের মধ্যে অনেকের বসিবার ঘাঁড়াইবার খেলা
 শু গুল করিবার স্থান। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কার্যস্থ নবশাখ প্রভৃতি আতির হাঁকা
 সরকারী বৈঠকখানার ধরে ধরে সাজান আছে। বৈকালে তাস পাশা
 স্তরক খেলার সময় বধন বহু লোক একত্রিত হইয়া স্ব স্ব আতির হাঁকা
 ধরিয়া ধূম পান করিতেন, তখন গৃহটী লোকোমটিজ্ এল্লিনগহের মত
 শোভা ধারণ করিত। ধূমরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন হইত। বাড়ীটী সাধা-
 রণ সম্পত্তি, নিশানাথের আর দুইটী ভ্রাতা তথায় থাকেন, তাঁহাদেরই
 উৎসাহে এবং উদ্যোগে তথায় প্রতি দিন দুই এক সের তামাকু পোড়ে।
 দিনে রাত্রে খেলার ধূম এবং তামাকের ধূমে মজলিস সরগরম। গ্রামের
 বহু নাথেরাজভোগী পেন্সেনভোগী, অলস কুটুম্ব এবং পরের গলগ্রহ উদ্ধর-
 জ্ঞাদিগের সেই আড্ডা। কখন দলদলির দোঁট, ফলালের গল্প, কখন
 পরানন্দা, কখনো ধর্ম্মমতের তর্ক বিতর্ক, শালিবি মধ্যস্থ বিবাদ মোমাংসা
 সব রকম কথাই আলোচনা তথায় হয়। নিশানাথ তাগাদের সঙ্গে কথা-
 চিৎ বোঝ দান করেন। তিনি কি না একটু বিদ্যারসের আশ্বাদন পাঠয়া-
 ছেন, সুতরাং আবদ্যার অনুচরগণের সহবাস তাঁহার ভাল লাগিবে কেন ?
 বাহাতে দেশের কোন বখাৰ্হ হিত হয়, লোকদিগের জ্ঞান নীতির প্রতি
 আস্থা বাড়ে, সামাজিক দূষিত রীতি পদ্ধতি উঠিয়া যায়, এই চেষ্টায় তিনি
 করিতেন। একরূপ রসতীন দৃশ্য আমোদ, বিশেষতঃ দ্বায়িত্ববোধবিহীন
 জসার ব্যক্তিদিগের সঙ্গ তাঁহার ভালই লাগিত না। যে সকল ব্যক্তি বুঝা
 গল্পে সময় ফেলণ করে, অসার চিত্তাহীন কথা কয়, লেখা পড়া শিখিয়াও
 বাহার আশঙ্কিত বর্কবের ন্যায় কাল কাটায়; বাহাদের আমোদে বুদ্ধি
 বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, রসিকতায় কেবল পুণাতন অসত্য কুচি-
 প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ বাহাদের সঙ্গে বসিলে বা কথা কহিলে জ্ঞান কি ভাব

কোন বৃত্তিরই ক্ষুণ্ণিত্ব জন্মে না, তাহাদের সহবাস নিশানাথের নিভাঙ্ক অগ্নির ছিল ।

বহির্কীর্তীতে যেমন পুরুষদের, অন্তঃপুরে তেমনি প্রতিবাসিনী মহিলাদের গতিবিধির স্থান । তাহাদের ভিতর অশিক্ষিতা হিন্দুর মেয়েও আসিত, মধ্যে মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান এবং ব্রাহ্মদের মেয়েও আসিয়া জুটিত, এ কাল এবং সে কাল উভয় কালের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া নানা বিষয়ে চর্চা করিতেন । তাহাদের ব্যাখ্যালাপের সময় মনে হইত যেন অন্তঃপুরে হাট বাজার বসিয়া গিয়াছে । সকলে মিলে এক সঙ্গে কথা কহা মেয়েদের রোগ । আপনার কথাই পাঁচ কাহন । এক দিন সন্তোষিনী গৃহে বসিয়া স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতেছেন এবং বিম্বাদিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অস্থির ভাবে কখনো বসিতেছেন, কখনো উঠিতেছেন, এক এক বার এ দিক ও দিক পদসকালন করিতেছেন, এমন সময় রসমঞ্জরী এবং চপলা হুন্দরী বেড়াইতে আসিল । চপলার কোলে দুই আড়াই বৎসর বয়সের একটি দিবা ছটপুট হুন্দর ছেলে । ঠিক যেন বশোদার কোলে নীলমণি । রসমঞ্জরী অম্ববাঁজা, এবং বিধবা । তাহার মূর্তি এমন এক নূতন রকমের যে বয়স কত তাহা ঠিক করা যায় না । কখনো বোধ হয় পঞ্চাশের্দ্ধ, কখন বা চল্লিশেরও কম । ইহারা দুই জনে সন্তোষিনীর নিকট আসিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল ।

সন্তোষিনীর একই চিন্তা, একই ভাবনা দিন রাত্রি মনে ভিতর আগি-তেছে । তিনি ঘুমাইলেও চিন্তা কিছুতেই ঘুমাইতে চাহে না, সে সারা নিশি আগিয়া তাঁহাকে স্বপ্ন বেধায়, প্রাতে শব্দা হইতে উঠিতে না উঠিতে জাগ্রত আসিয়া দাঁড়ায় । কখন বা রাত্রি দুই প্রহরের সময় মাথা গরম করিয়া দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া উদ্ভাষিনী দানবীর বেশে মনিসচক্রের সমক্ষে উপস্থিত হয় । এই চিন্তাস্বপ্নজনী নানা মূর্তি ধারণ করিতে জানেন । ডাকিনী যোগিনী পিঙ্গাচিনী সাজিয়া বিরহিনী কামিনীদিগকে লইয়া নানা রঙ্গরসে ক্রোড়া করেন ।

রসমঞ্জরীকে দেখিয়া সন্তোষিনী ঐবদ্বাস্যের সহিত বলিলেন, “মাসি, তুমিও অনেক প্রকার ভয় বয়স জান, আমার হাজার মনস্তত্ত্ব ভিন্ন ভাল করিয়া

হিতে পায় ? আহা ! দর সংসারে আর তাঁহার মন নাই, আমোদ প্রমোদ ভালবাসেন না, দেখিলে বড় হুঃখ হয়, পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা ধারাপ হটয়া গিয়াছে, কেবলই বই আর বই, আর কিছু না।” রসমুগ্ধরী সে কথা শুনিয়া গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি যে এক জন গুণশালিনী উচ্চ ধরের স্ত্রীলোক তাহার প্রমাণ পাইয়া মনে মনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

রসমুগ্ধরী ঐশ্বর্যের মধ্যে এক জন বিশেষ পরিচিতা। তন্ত্র মন্ত্র শ্লোক করিতা সে অনেক জানেন। প্রতি বর্ষে বর্ষে ঘোষপাড়ার দ্বার, প্রতি শুক্ল বারে পন্থতে মিশিয়া গীত গায়, রাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণলীলার কথা কয়। তাহার গায়ের রংটা বেগ তেল চুক চুকে, গলায় এক গাছি সোণার দানা, হাতে রূপার ডাঙা, বা পায়ের বুড় আঙ্গুলে একটা তামার আংটি, পরিধান এক ধানি দ্বিবা ধোপ ধাপ সূক্ষ্ম শাখা হুতি, নাকের উপর প্রতিপদের চাঁদের মত সফ্র বেথার তিলক শোভমান। মুখ ধানি চতুর্দান, মাথার চুলগুলি কাল কুচ কুচে, এক পায়ে একটা গোদ, বকটা অতি বিস্তৃত, তাহাতে উন্মির দাপ, চক্ষু হুইটী পটোলের ভাই আলুচেরার মত গোল গোল। পুরুষ মানুষের মত ডাবা হাঁকার গড় গড় শব্দে সে তামাকু ধায়, কিছু কিছু অহিকেন সেবনও অভ্যাস ছিল। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সমাজেই তাহার অধিক গতি বিধি। গৃহপালিত তামাতা, অলস বেকার কুটুম্ব, চাকরীর উমেদার, গুরু মহাশয়, গ্রামের নাপিত ও স্বর্ণকারদের সঙ্গে তাহার বেশী আলাপ পরিচয়। কবে যে সে আবাগী বিষয়া হইয়াছে, তাহা কাহারো মনে পড়ে না, এই তাহেই চিরকাল সকলে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে। আগে কি চাকরাণীর কাজ করিত, আর গরু পুসিয়া হুধ দি বেচিত, এখনে মধ্যে মধ্যে ঠিকে ঠাকার কাজ করিয়া বেড়ায়, কখন বা দিশি কাপড়ের ফেরি করে। কুটুম্ববাড়ী গুস্ত করা, নববিবাহিতা কন্যার সহিত স্বপ্নগৃহে যাওয়া, গৃহস্থের বউ ঝির কাছে গল্প করা গান গাওয়া, ঘটকালীর সহক জুটিয়ে দেওয়া, এই সমস্ত কার্য্যে সে বিশেষ পটু। টোটকা টাটকি ঔষধও কিছু কিছু জানিত। বেশ চৌকশ লোকটী। যিনি বড় বড় লোক কেন হউন না, রসমুগ্ধরীর কথার কাঁবে পড়িলে তাহাকে আর সীজ বাড়ী করে বাইতে হইবে না। কথার কথার

করিয়া তাঁহাদের দলের মধ্যে ডাহারা মহা পণ্ড গোল বাধাইয়া দিয়াছে । কোমল করিবার কালে রসমুঞ্জরী সে কথাটা বলিতে চাড়িল না । খুব অহঙ্কারের সহিত বলিল, “ওশো, তোরা কি আর মিছে জাঁক করিস্ ! দেখুগে যা, আমাদের অমৃত মহাশয়ের পায়ের তলে তোদের কত বিক্ষিপ্ত পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে ! কিসের এক বড়াই ? যাক্ না আর কিছু দিন, তোদের দলকে দল বোষণাড়ার নিরে গিয়ে উপস্থিত করব । শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন শীঘ্র আম-
দের গৌত্র বৃদ্ধি করুন । কেন মিছে চালভাজা চিবিরে মরবি, তোর নামীকে বল্গে যা, আমাদের কাছে এসে একটু রসগোল্লার রস খেয়ে বেন প্রাণ ঠাণ্ডা করে যার । আহা ! হা ! তোদের আত কুল হারিয়ে কি নাশ-
নাই হলো । তোরা খাঁড়ের গোবর হয়ে শেষ রইলি । ব্রহ্মসত্যর বারা বিদ্বান জ্ঞানী ভক্ত তারা আমাদের দলে মিশে গেল, কেন আর পাতিনেড়ে কর জন তোরা বাইরে পড়ে থাকিস্ ? আর, আর, রাখাক্ষ ভজবি, সুখে থাকবি । আত কুল সব কিরে পাবি । “লোকের মধ্যে লোকা-
চার, সদ্ গুণের কাছে সধাচার ।” তোদের ব্রহ্মসত্যর এত কারা কাটি হয় কেন লা ? আত গের্নাত হারিয়েছিস্ বলে বুঝি ? আমাদের পক্ষতে শুক্র-
বারে এক দিন গিয়ে দেখে আসিস, কত প্রেমের তরঙ্গ, কত নীলা রসের রঙ্গ ; কত আনন্দের বটা, কত হাসির ছটা ; হাতে হাতে বর্ণ ।

সকল রসের সার কৃষ্ণপ্রেমামৃত ।

রাধারাণী বার লাগি সধাই ভূষিত ।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম শেরাকুলের কাঁটা,

বেন কাঁটালের আঁঠা ;

শুক্লবস্ত্র নিত্যধন আট ঘাট আঁটা ।

রংমহলে রসের মাণিক জলে অঙ্ককারে ।

সহজ সাহস বিনা সে ধন কে চিনিতে পারে ।

সে কি সহজে যেনে ;

উদয় হয় শুভ যোগ পেনে ।

পুরুষ প্রকৃতি

বৃন্দল বৃতি,

ଜୁଡ଼ାସ ନଗର, **କବି ବ୍ରହ୍ମନ**

आह। दिवा। अग्ररूप ।

প্রেমরসে গলি, রসের পুতলী,

করে কেলী বৃন্দাবনে ;

সে রূপ ভজিয়া, আনন্দে যজিয়া

চিরস্থায়ী ভরুগণে ।

वृथाई जनम, धरम करम

যদি না মজ্জিমা ভাষ্য :

কি হইবে গতি, শুৱে মতমতি

दास दास गति दास ।

(গীত) “প্রেমের কথা বললে কি হয়, শুনলে কি হয় রে।

সাধু গুরুর করণ বিষম দ্বাদ্ধ রে । যেমন মডার উপরে

মড়া রে, তারা দুজন মড়া, প্রেমফলে জীয়ায় রে।”

তুমল স্বর্ণডা করিয়া, ছড়া কাটিয়া, পান পাইয়া শেষ রসমঞ্জরীর রাগের
ঝড় ফুকান কিছু নরম পড়িল। তখন সে শান্ত ভাবে চপলাকে দুই একটা
উপদেশ দিয়া তাহার মনকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা পাইল। চপলা কেঁদিয়া
ভনিয়া অবাক হইলেন, তাঁর কোলের ছেলেটা ডর পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।
রসমঞ্জরীর কি দুর্জয় প্রভাব তাহা তিনি বঝিতে পারিলেন।

যে সময়ে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক বচসা হইতেছিল, তৎকালে সন্তোষিনী বসনারত মুখে মুহু মুহু হাসিতেছিলেন। অতঃপর তিনি দুই জনকেই বিনম্র বচনে বলিলেন, "তোমরা ভাই আমুএহ করিয়া কাল একবার এস, সকলে এক সঙ্গে দাঁধার কাছে বাব, এবং তোমাদের কার কত বিদ্যের ঘোড় তাহা দেখা যাবে।" শুধন সকলেই মুখে হাসি বাহির হইল। সন্তোষিনী রসমঞ্জরীকে বলিলেন, "হাসি, তোমাদের একটা প্রেম-লীলার গান গাও না শুনি। রসমঞ্জরী গলা কাঁপাইয়া গান ধরিলেন।

“আমার মন কি যেতে চাও, সুখা যেতে আনন্দপুরে। তুমিও রাগের
দাম্পত্য চলে নির্বিকারে।

উথা নাই হিংস। নিন্দে, জরা মৃত্যু প্রভাত মধ্যে, ২৪৬৮৯০ কীশিমান

করে ; তথায় নাহি চন্দ্র দ্বিবাকর, ঐক্ষা বিষ্ণুর অগোচর, তথায় পবন
যেতে নারে, তুই যাবি কি করে, সাহসে কি ঢেঁকি গিলতে পারে ।

আনন্দময় বাজার ধানি, নিত্য উঠে প্রেমের ধ্বনি, হৃদয়ে আশুনে
এক ঘরে ; তথায় কামী লোভী যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের কারণ,
লয়ে রূপের প্রদীপ হাতে, যেতে হবে পথে, সন্দেহ কেবল দূর করে ।

গোসাক্রী বৈষ্ণব চাঁদের বাণী, শুদ্ধ হয় যার ভক্তি ধানি, মনে করলে
সে যেতে পারে ; ও চাকুরে বেনাপাছে বসে, ডুহুর পেল কোন্ সাহসে,
ভোর কি স্বাবার এমনি ধারা, শোন রে চাকুরে, পিপড়ের পাখা ওঠে মরবার
তরে ।”

গীত শ্রবণে সকলের মন আনন্দিত হইল, বিবাহ মিটিয়া পেল, শেষ
সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল । চপলার চিস্তের কিছু ভার
ঘুটিল না । তাহার দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি কর্তৃত্বভার শিখা হইয়াছে
ভালিয়া সে মরমে মরিয়া লজ্জার অধোবদন হইয়া উঠিয়া গেল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রসসংকার ।

বাহারাম যে গৃহে বসিয়া সভা সর্ব্বত্র পড়া শুনা করেন, টিকটিকির
মল্লিকাভোজন দেখেন, পিপড়ার পা গণেন, হাঁ করিয়া বসিয়া ভাবেন,
ছিন্ন নগ্ননে টেবের পাছের ফুল পাতা দর্শন করেন, তাহার একটি দরজা
বাড়ীর ভিতরের দিকে, আর একটি বাহিরের দিকে । তিনি একাকী
এই অধ্যয়নে নিমগ্ন আছেন, সন্তোষিনী চপলা এবং রসমঞ্জরীকে সঙ্গে
লইয়া তথায় উপস্থিত হইল । সন্তোষিনী বলিলেন, “দাদা, আমাদের
এই রসমঞ্জরী মাসী তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইহার নিকট
ভূমি অনেক ওষুধবা শুনিতে পাবে, অনেক রকমের শাস্ত্র তন্ত্র ইনি
জানেন ।”

বাহ্যরাস অন্তঃমনস্কের ন্যায় একবার তাহার পানে গম্ভীর ভাবে চাহিলেন, এবং অণকাল পরে একটু মূহ হাস্য করিলেন। কি বুকিয়া তিনি হাসিলেন তাহা বলা বড় সোজা কথা নয়। হয়তো সেই নরাকৃতি বন শ্রাম-বর্ণা বিকটদর্শনা নারীর দেহে কত পরিমাণে কোন্ কোন্ উপাধানের সংহতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন। তাঁহার হাস্যমুখ দর্শনে রস-মুগ্ধরী একটা প্রশ্ন করিয়া কথা আরম্ভ করিল। সে দুই পাঁচটা সাধু ভাবার কথাও শিখিয়াছিল; তাহা দ্বারা কখন আপনি, কখন তুমি ইত্যাদি সম্বোধনে আলাপ করিতে লাগিল। নিজেই নাক মুখ চোখ ঘুঝাইয়া, হাত নাড়িয়া কথা কহিয়া যাটতেছে, বাহ্যরাস সে সব কথার মানেই বা কি জানেন, আর উত্তরই বা কি দিবেন, স্থির ভাবে কেবল শুনিতেছেন। রস-মুগ্ধরী বুকিয়া বুকিয়া প্রান্ত হইল, তথাপি কোন প্রকার উৎসাহ বা উত্তর পাইল না। সেরূপ প্রকৃতির মেয়ে মানুষ বাহ্যরাস সঙ্গে কখনও দেখেন নাই, সেরূপ নূতন ভাবার ছেঁদো কথাও কখনো শুনে নাই। তাঁহার প্রশান্ত বৃত্তি এবং অচঞ্চল গম্ভীর নির্মল ভাব স্বভাব দর্শনে রসমুগ্ধরীর রস ক্রমে মরিয়া আসিতে লাগিল। তার প্রেমরসতন্ময়ের কোন কথার ফল ফলিল না, কাজেই সে অপ্রতিভ হইতে লাগিল। মনের সে ভাব চাপা দিবার জন্য আপনি আপনি হক না হক ধানিক হাসিল এবং বক্তৃতা করিল। কিন্তু বাহ্যরাস সে দিকে মন দিলেন না। তিনি একে একে দুই, দুই দুই চার; ইহা ব্যতীত অস্ত্র কিছু মানেন না, ভাবান্ত্র লোকের প্রেমরসের প্রলাপ বাক্যের অর্থ বুঝেন না, রাখাকুকে লীলা তাঁদ্র কাছে ভূতের গজ বিশেষ; হুতরাং রসমুগ্ধরী আসির হাসিতে মাঠে দ্বারা গেল, লাভের মধ্যে তাহাতে গলা ও ঠোঁট শুকাইয়া উঠিল, গা ঘামিতে লাগিল। ওদিকে চপলা তাহার দশা দেখিয়া মুখ কিরাইয়া হাসিতেছে, সম্ভোষিত গগনমোরখ হইতেছে। বাহ্যরাসিক বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, লোককে হাসাইতে এবং আমোদিত করিতে না পারিলে তাহারা বড়ই বিড়ম্বিত হয়। অন্যের মনে রসোদীপন করিতে গিয়া শেষ আপনি অনেক সময় শুকনা ডাকার পড়িয়া হাবু ডুবু ধায়। রসমুগ্ধরীর সকল অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল, সে তখন পলাইবার পথ পায় না। বাহ্য-

রাম তাহাকে কিছু অপমানও করিলেন না, অগ্রাহ্যও করেন নাই, কেবল আপন স্বভাবে আপনি স্থির রহিলেন। তাঁহার নির্দোষ শান্ত সুগভীর স্বভাব রসহুগুরীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর, সুতরাং তজ্জন্য সে এক প্রকার অস্বস্তি অনুভব করিয়া শেষ আশ্বে আশ্বে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

তাগর পশ্চাতে চপলাও প্রস্থানের জন্য দণ্ডারমান হইলেন। তাঁহার কোলে সেই প্রিয়দর্শন বালশালতরুবৎ সুকুমার সন্তানটী শোভা পাইতেছিল। সহসা সন্তানকোলে সেই জননীরূপ সন্দর্শন করত বাহ্যারাম তাঁহার দিকে সচকিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি সামান্য দৃষ্টি নয়। অস্থিমাংসলোলুপ রূপযুক্ত মন্দমতি পুরুষদিগের কুদৃষ্টি নয়, কিন্তু নির্লিপ্যগতিপরায়ণ বিজ্ঞানরসজ্ঞ তত্ত্বদর্শীর অন্তর্ভেদী বুদ্ধিদৃষ্টি। বাহ্যারাম যেন দৃষ্টিপথের ভিত্তর দিয়া সেই অপূর্ণ মাতৃ মূর্তির অভ্যন্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উহা দৃষ্টিমাত্র কোমন্ডের নারীপূজার স্বরূপ লক্ষণ বিধি ব্যবস্থা উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধির কথা সমস্তই তাঁহার মনে আসিল। তাহার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া অনিমেষ লোচনে এই দিব্য শোভা দেখিতে লাগিলেন। সন্তানটী মধ্যে মধ্যে জননীর স্তন্যপান করিতেছিল। সন্তোষিনী চপলার কিছু কিছু পরিচয় তাঁহাকে দিলেন, কিন্তু বাহ্যারামের কর্ণে সে সকল কথা তখন স্থান পাইল না, তিনি বিমোহিত চিত্তে কেবল ঐ শিশু এবং জননীর মোহন রূপ দেখিতে লাগিলেন। একজন অপরিচিতা যুবতী স্ত্রীর পানে এ ভাবে চাহিয়া থাকা যে তাঁহার মত যুবা পুরুষের পক্ষে নিষ্কার বিষয় তাহা তিনি তখন মনে করিতেও পারেন নাই। তাঁহার ঈদৃশ সত্যক দৃষ্টিপাত অবলোকনে সন্তোষিনীও কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহার মনে যেন একটু হিংসার ভাব আসিল। কারণ, সে অনেক আরাধমা করিয়াও সে প্রকার একাঙ্গ দৃষ্টি আপনার দিকে কোন দিন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। চপলা যে তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী তাহাও নহে; তথাপি যে কি গুণে সে বাহ্যারামের চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম হইল সন্তোষিনী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তজ্জন্য তাহার প্রাণ পুড়িতে লাগিল।

চপলা সুন্দরীর এই রমণীয় মূর্তিতে কি এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্য ক্ষুর্তি পাইতেছিল, তাহা বাহ্যারাম ভিন্ন অন্যে জানিবার সাধ্য নাই। চপলা

দীর্ঘাঙ্গী, পরিণতবোবনা, এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; বয়স প্রায় ষাট্টিংখৎ বর্ষ। তাহার বিলম্বিত কেশপাশ অর্ধবসনাবৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়াছিল। পরিধান এক ধানি চণ্ডা লালপেড়ে নৃতন কোরা কাপড়, মস্তকে সিন্দুরবিন্দু, পদবস্ত্র অলঙ্করবিহীন। শরীরটী সুস্থ প্রভাবশালী প্রফুল্ল, চক্ষে বুদ্ধির জ্যোতি বিস্তারিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ; তাহার উপর স্ফুট পুষ্ট হাস্যবদন বর্জনশীল সুকুমার শিশু সন্তানটী বক্ষদেশ আলো করিয়া রহিয়াছে। সে কখন নীরবে মনের উদ্গাসে মূর্ত্তিতনয়নে জননীর স্তন্যপান করিতেছে, কখন বা চক্ষু খুলিয়া আশ্রিতদের আবেশে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছে, এবং মুহু মুহু হাসিতেছে। মাতৃস্নেহ বাৎসল্য এবং শিশুত্ব একত্র সম্মিলিত হইয়া এই মোহিনী মূর্ত্তি সংগঠন করিয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রবিহারদ পণ্ডিতবর কোমং যে এই রূপের ভিতর মনুষ্যাত্মের ঘনীভূত আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া স্নেহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার উপাসনা ধ্যান আরাধনার আবশ্যকতা অনুভব করেন ইহাতে তাঁহার নিগ্রীষ্রবাদ ধর্ম্মের ভিতরেও কিছু কবিত্ব এবং ভক্তিরস প্রকাশ পাইয়াছে। ষড় দড়ি বাঁশ কাঠ মাটি পাথরের মৃত্ত দেবতা বা ষট পট অপেক্ষা সন্তানকোলে জননীর জীবন্ত প্রতিমা যে স্নেহরূপিকর, শক্তিপ্রদ এবং ভাবরসউৎপাদক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্নেহে গদগদ দ্বিভাষী বহুশা নারী সন্তানকে কোলে লইয়া স্তন্য পান করাইতেছেন, আর মাসিক্ষণ শিশু তাঁহার বাক্যপাশে আলিঙ্গিত হইয়া বক্ষরূপ প্রেমসাগরে সদানন্দ মনে বিহার করিতেছে, ঈদৃশ ঐকান্তিক স্নেহ মমতা এবং ঐকান্তিক আনুগত্যের মিলনকে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বাস্তবিকই মনে হয়। ফলতঃ অদৃশা নিষ্ঠূর্ণ সন্তা মনুষ্যত্বকে যদি কোন মূর্ত্তিমান বাহ্য আকার প্রদান করিতে হয়, তবে এই রূপই তাহার অনুরূপ বটে।

পণ্ডিত বাহ্যারাম এত দিন গ্রাম পড়িয়া বাহা প্রাপ্ত হন নাই, চপলাকে দেখিয়া তাহা নিমেষের মধ্যে লাভ করিলেন। পূর্বেও তিনি অনেক বার সন্তানকোলে জননী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন বিজ্ঞানস্বকু প্রকৃষ্টিত হয় নাই, কোমন্ডের মানবধর্ম্মতত্ত্ব এবং নারীপূজার বিধি পাঠ করিয়া এক্ষণে তাহার মাহুর্গা কোমলতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। কলির জীব

অধিকাংশই নারীর উপাসক, কিন্তু সন্তানবতী নারীর ভিতর মমুষ্যত্ব কর জন দেখিতে পার ? এই মাতৃ মূর্তিটা বাস্তারামের শুক কঠোর হৃদয়ে প্রস্তর বোধিত মূর্তির ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই রূপের তজনায় বে দিয়া স্নেহ প্রীতি বাৎসল্য প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসকল বিকসিত এবং চরিতার্থ হয় তাহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিলেন। ইহাতে তাঁহার নীরস প্রাণে কথঞ্চিত ভাবরস সঞ্চারিত হইল, এবং তিনি একটু আরাম শান্তি পাইলেন ; কে যেন তীব্র জ্ঞানাগ্নি শিখার প্রেমের শীতল জল ঢালিয়া দিল। এই ঘটনা হইতে বাস্তারামের জীবনগতি ভাবরস কবিত্বের দিকে কতকটা আগ্রসর হয়, একটা নূতন রাজ্যের দ্বার তাঁহার নিকট যেন উন্মোচিত হইয়া যায়। এক্ষণে ঠিক যেন বিদেশ হইতে তিনি ঘরের দিকে অঙ্গ রূপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

অনন্তর পূলকিত হৃদয়ে তিনি চপলার সহিত দুই চারিটা কথা কহিলেন, এবং সন্তোষিনীর মুখে তাহার সবিশেষ পরিচয় শুনিলেন। চপলার স্বামী এক জন বিধবাবিবাহকারী সমাজসংস্কারক ব্রাহ্ম ইহা শ্রবণে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য পণ্ডিতের মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। জন-সমাগ্রে মিশিয়া লোকচরিত্র অধ্যয়নের একটু প্রবৃত্তি হইল। অচেতন জড়-তত্ত্বের আলোচনায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মানবতত্ত্বের ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা জন্মিল। জড়রাজ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া স্টিকব্রুকে ভুলিয়া যে সময় তিনি আপনার স্বভাবের সরল পথ হারাইয়াছিলেন, সেই কালে এই ঘটনাটী সমুপস্থিত হয়। মনোজগতের কি অলঙ্কার নিরমালী ! যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিসকলের সামঞ্জস্য না হয়, একটা আর একটাকে অতিক্রম করিয়া চলে, তাবৎ মমুষ্য কিছুতেই শান্তি পায় না, অবস্থান্তরকে পড়িয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে। অনন্তসামঞ্জস্য, নর্যসমবয়, চির-প্রেমমিলনের দিকে মানবের নিরতি দৃষ্টিবদ্ধ বন্ধনে বদ্ধ আছে ; সেই দিকে যাইবার জন্যই এই সকল অস্থিরতা ব্যাকুলতা এবং পুনঃ পুনঃ পদ্ম-পরিবর্তন।

সন্তোষিনীর যে জন্য এত চেষ্টা উদ্যোগ তাহার কিছুই হইয়া উঠিল না।

সমাজতত্ত্বে, নারীপূজাতত্ত্বে, নানা উদ্দেশ্যে নানা পক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সংসারে স্ত্রী পরিবারের সহিত অবস্থিতি করিয়া শ্রমী হইবার যে কক্ষিৎ অভিলাষ ঘোবনের প্রারম্ভে ছিল তাহা ইতঃপূর্বে পিতার অন্যায় অত্যাচারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে । তদ্বিষয়ে সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তিনি জ্ঞানপথের চিরপরিভ্রাজকের ব্রত গ্রহণ করেন । নারীসম্বন্ধ তাঁহার জ্ঞান শিক্ষার উপায়, সুতরাং সন্তোষিনীর মনোবাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইবে ? সকল দিকেই প্রতিবন্ধক । একেত সে সম্ভবা কি বিধবা তাহার কোন মীমাংসা হইল না । সম্ভবা হইলেও চিরজীবন বিধবার মত কাটা-ইতে হইবে । যদি বিধবা হইয়া থাকে, এমন নিশ্চিত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বা বাস্তবায়নের সহিত পুনঃপরিণয় কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে ? এক গৃহে ভাতা ভগিনীর ন্যায় বাস, যদিও সম্পর্কে বাধে না, কিন্তু দেখিতে যেন কেমন কেমন বোধ হয় । উচ্ছিন্ন নিশানাথ জ্ঞাতি কুটুম্বের মায়া মমতা ছাড়িয়া, স্ত্রীর প্রবল শাসন আতিক্রম করিয়া কার্যকালে সে বিষয়ে কত দূর সাহসী হইতে পারিবেন, তাহাতেও পক্ষীর সন্দেহ আছে । সুতরাং পক্ষীগ্রামে হিন্দুপরিবারে একটি বিধবাবিবাহ দিয়া সমাজসংস্কার-প্রবৃত্তি চরিভার্ঘ্য করিব, কি উত্তরকে দাম্পত্য প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া সংসারান্তর্গত স্থখে রাখিব তাহার পক্ষে আমরা বড়ই ব্যাঘাত দেখিতেছি । অরণ্যপরিবেষ্টিত প্রান্তরময় বঙ্গুর ভূমিহারাণী নিকরিনী যেমন বক্রগতিতে গমনপন্থা অন্বেষণ করে, সন্তোষিনীর জীবনগৃহের অভ্যন্তরে তেমনি উৎসারিত প্রীতিস্রোত প্রতিপদে বাধা পাইয়া পথ অন্বেষণ করিতে-ছিল । তাহার সামাজিক অবস্থা একরূপ জটিল কেন হইল আমরা তাহা এখনও ভাবিয়া বলি নাই । শৈশবে যখন তিনি পিতৃত্ববনে বাস করেন, সেই কালে তাঁহার প্রতিবাসীর এক কন্যার সহিত কোন বহুবিবাহকারী কুলীন মহারথীর বিবাহ উপস্থিত হয় । কন্যার পিতা পণের সমস্ত টাকা দিয়াছিলেন, কেবল দশটী টাকার যোগাড় করিতে পারেন নাই । সেই জন্য গুণধাম পাত্র রাসিয়া ছালনাওলা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং উক কন্যাকর্তার প্রতি রাগপরবশ হইয়া বিনাপণে সন্তোষিনীকে সেই রাত্রেই বিবাহ করিলেন । পরিব বেচারী তখন ঘুমাইতেছিল, কিছুই জানে না ।

তখন তার বোধ শোধও কিছু জন্মে নাই। রাগ অভিমান চরিতার্থের জন্য এই বিবাহ, ইহাকে এখন আপনারা যাহা বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু ঠিক বিবাহ বলিয়া আমাদেরও মনে ধরে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সভ্যতার লীলা ।

বসন্তপুর গ্রামের প্রান্তভাগে একটি স্থপীঠানমণ্ডলী আছে, তাহার মধ্যে অনেক তেঁতুলে বাগদী, চাঁড়াল এবং কাণ্ডরা সপরিবারে বসতি করে। তুর্ভিক্ষের সময় সে বার দেশে বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রমজীবীদিগের কাজ কর্ত্ত জুটত না, সেই সুযোগে পাখরী ভগানু সাহেব তাহাদিগের মাথার অল ছিটাইয়া দলভুক্ত করিয়াছেন। দুই পাঁচ ঘর কায়স্থ নব-শাখও তাহার মধ্যে ছিল, কিন্তু সংসর্গ গুণে তাহাদের ব্যবহার প্রকৃতিও হাড়ী বাগদীর মত হইয়া যায়। মণ্ডলী মধ্যে এক জন দেশীয় পাখরী বাস করিতেন। স্থপীঠানেরা কেহ তাঁহার ডামাকু সাজিত, কেহ ঘর কাঁটা দিত, কেহ ছেলে কোলে করিত, কেহ রান্ধিত, কেহ গরুর ঘাস কাটিত এবং বাজার করিত। তাহার বিনিময়ে পাখরী মহাশয় ইংরাজি ঘরে বিলাতি বাজালা ভাষায় উপদেশ দিতেন।

মণ্ডলীর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে হাঁস মূর্গি পেকু পাখুরা ছাগ মেঘাদি ভূচর খেচর উভচর প্রাণিগণ ইত্যন্ততঃ বিহার করিতেছে, তাহাদের বিষ্ঠা মূত্র এবং অলিত পক্ষপূঞ্জে উঠানের চারি দিক্ পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে কোথাও জাকেটপরা কামিজগায় কোন নারী বসিয়া হালুদ-মাখা শিলের উপর শিল্পী মাচ ঘসিতেছেন, কোথাও বা কোন মুন্সী পেরাঅ রতন ছাড়াইয়া রাশীকৃত করিতেছেন। তৎপার্শ্বে ঘাড়ের চুলছাটা টেরিকাটা হাকআস্তিন জামাপরা কোন যুবা মূর্গি হাঁসের গলায় ছুরি

জায়গায় মাস এক জায়গায় রাখিতেছে। কেহ বা চুপট টানিতে টানিতে বারীগণের সঙ্গে ঠাট্টা আমোদ করিতেছে। হুই একটা ছোট ছোট ছেলে হুকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাহার সঙ্গে ভাড়াভাবে বকরির ঠ্যাং চিবাই-তেছে। কেহ বা কাঁচা হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া চুষিতেছে। চারি পার্শ্বে চল শকুনি কাক উড়িতেছে। কুকুরগুল সত্রে কেহ দূরে জামু গাতিয়া বসিয়া আছে, কেহ বা কাক চিলের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। প্রতি দিন তথায় এইরূপ মহাসমারোহের ব্যাপার নয়নগোচর হইত। যাবার সন্ধ্যাকালে তবলার চাটি, বেহালার গদ্ এবং সন্ধ্যোতক্ষনিও র্নিতে পাওয়া বাইত। পূর্বে ইহারা যখন কৃষক শ্রমজীবী ছিল, যখন রাজা জমিদারকে কর দিত, ন্যায়োপার্জিত ধনে জীবিকা নির্বাহ করিয়া নির্দোষ ভাবে সরল মনে বরকরা করিত। গুটান হইয়া অবধি জাকে আর ধাকানা দেয় না, ভজ্র লোককে মানে না, মহাজন টাকা হিলে তাহাকে ঘুঁবি দেখায়, মিথ্যা কথা কয়, দাঙ্গা করে, লোকের গল মুর্গি চুরি করিয়া ধায়, কেহ উজ্জনা নাগিস করিলে পানরী সাহেবকে গকিয়া লইয়া হাকিমের সিংহাসনপার্শ্বে বসায়। এই সকল ব্যক্তি-গকে গির্জায় বসাইয়া বেভারেও ভগ্নান উপদেশ দেন, আর বার্ষিক পোটে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা লিখিয়া ধন্যবাদ গ্রহণ করেন।

এক দিকে এই খ্রীষ্টীয়ান পন্নী অপর দিকে ব্রাহ্মণ কারুণ্য প্রভৃতি হিন্দু-রাস, মধ্যস্থলে একখানি ছোট আটচালার সঙ্কটচরণ বাবু অবস্থিতি-রেন। তিনি যেমন হটক, বিধবাবিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণেরে মিশিয়া এক-কার ভরিয়া গিয়াছেন, একটা সহোদর ভাই তাহার ছিল, তাহার কিন্তু-ধনে পর্য্যন্ত কোন কিনারা হয় নাই। সে সন্ধ্যাকালে হাটকোট পরিয়া-বিরজী বেশে ঐ খ্রীষ্টীয়ান পন্নীতে গিয়া তবলার চাটি মারিত, মদারকা-ন করিয়া টপ্পা গাইত। কখন বা ব্রাহ্মণবেশে হিন্দুসমাজের ভিতর-হোরে বাড়ীর কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া জোঠের নিম্না-রিত্ত এবং ভোজ ফলার খাইয়া আসিত। কেহ চাপাচাপি করিলে-লত, “আমি শুভ্র বাকি, দাঁড়ার সঙ্গে কোন সংগ্রহ রাখি না।” সঙ্কট-বু গ্রাম্য সবরেজিত্বের কাব্য করেন, এবং শুৎপদের প্রভু প্রভাবে জন

কয়েক লোক লইয়া একটা ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছেন, তাহাদের বোঝে প্রতি বুধবারে উপাসনা হইয়া থাকে । গ্রামের মধ্যে নিশানাথ বাবুর সঙ্গে কেবল তাঁহার বাহা কিছু একটু গতিবিধি ছিল । কারণ, তাঁহার নিকট তিনি কোন কোন বিষয়ে গোপনে সহায়ত্ব পাইতেন । সঙ্কটের সঙ্গে সেই খানে বাগ্গারামের আলাপ পরিচয় হয় । এক দিন তিনি তাঁহাকে নিজত্বনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান । ইতঃপূর্বে বাগ্গারাম কোন দলেই বড় একটা মিশিতেন না, প্রায় একাই থাকিতেন ; এক্ষণে সেই সন্তানকোলে চপলার সূর্তি দেখিয়া অবধি তাঁহার মন কিছু সরস হইয়াছিল এবং বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে আলাপ করিবারও একটু ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ।

এক দিন তিনি সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া সঙ্কট বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন । সে দিন বুধবার, সমাজের দিন । দুই এক জন ব্রাহ্ম সভ্যও ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন । সঙ্কট বাবুর অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই, বাগ্গারামের অত্যাচারের জন্য হ'কা সাজিয়া দিলেন, তাঁহার ভাড়া গোটা কডক চুরট, একটা পুরাতন পাটপ আনিয়া হাজির করিলেন । বোতলে একটু উচ্ছিষ্ট সুরা ছিল তাহাও আনিয়া সম্মুখে ধরিলেন । বাগ্গারামের সঙ্গে এ সকলের কোনই সম্বন্ধ নাই, কেবল একটু নম্রা লইয়া তিনি নাচে দিলেন ।

সঙ্কট বাবুর গৃহে এজলো ভার্ণাকিউলার দুই রকম বন্দোবস্তই আছে । তাঁহার এক তৃতীয়াংশ হিন্দু, এক তৃতীয়াংশ ব্রাহ্ম, বাকী সাহেবানী । তদীয় ভাতা বিকট বদন পুরো বোলআনা সাহেব । তাঁহার 'আর ভেমন ছিল না বাহাতে আশা মিটাইয়া সাহেবী চালে চলিতে পারেন, কিন্তু আঠার আনা সধ ছিল । দাদার আফিসে নকলনবিশের কাজে মাসে পাঁচ সাত টাকা বা পাইতেন তাহা দ্বারা কলিকাতার লাল-বাজার হইতে নীলামে বিক্রী পুরাতন কোট প্যান্টুলান, কাঁচের ভাঙ্গা গ্রাস বাসন, পিডল কিম্বা দস্তার কাঁটা চামচ সস্তা দ্বৈর কিনিয়া আনিতেন । মর্গি মাটনের পরস্যা প্রায় কোন দিন জুটিত না, কেবল মধ্যে মধ্যে চুরি চাষারি করিয়া চালাইতেন ; নিত্য ব্যয়ের জন্য দুই পরসার শুকনা গরুর মাংস বরাদ্দ ছিল । তাই আগুনে ঝগসাইয়া তাহাতে একটু সরিষা-

বাটা মাধিয়া উদ্ধণ করিতেন। দেবদাক কাঠের একটা ডাক্সা টেবল আর পায়াভাঙ্গা একখানি টুল ছিল, তাহার উপর বসিয়া ঐ সকল সাহেবী খান খাইতেন। মধ্যে মধ্যে আবার বাসি গোমাংস পর দিবসের ত্রেকফাটের জন্য রাধিয়া দেওয়া হইত। একে বড় গন্ধর শুক মাংস, তাহাতে আবার বাসি, অতি অপূর্ব সামগ্রী; সিরকার রসে ডুবাইয়া উহা যখন তিনি ভোজন করিতেন, তখন মনে ভাবিতেন, আমিই বা কে, আর সুবরাহ প্রিন্স অবওয়েল্‌সই বা কে। অল্প ব্যয়ে সাহেবী চাল যত দূর চলে বিকট তাহা প্রাণগত বহু অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিত। সার্বিক ভক্তিমাত্র হিন্দু যেমন প্রদ্বার সহিত পিতৃ মাতৃ প্রাদ্ধের বা দুর্গোৎসবের দ্রব্যাদি আহরণ করে, বিকটের এ কাণ্ডে তেমনি নিষ্ঠা ছিল। সে একটা বাৎসর্য করিয়াছিল, তাহাতে একটা কমোড থাকিত, সে কমোড নিজেই আবার সে রোজ রোজ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। একবার নীলামে চারি আনা দিয়া একটা পুরাতন গাউন তিনি ক্রয় করেন। মনে বড় সাধ যে বিবাহ করিয়া সেইটী মেমকে পরাবেন, পরাটয়া হুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া পথে পথে বেড়াবেন; সেই জন্যই খ্রীষ্টীয়ানমণ্ডলীতে যন যন এক গভীরত। একটা তেঁতুলে বাগদীর মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ও হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য দোষে সেটা হাত লাগিল না। প্রণয়ের বাড়্যাগড়ি অর্থাৎ অতিরিক্ত কোটসিপ দেখিয়া পাদরী ভগান্ একদিন তাহাকে চাবুক মারিয়া মণ্ডলীর সীমা হইতে বিদায় করিয়া দেন। পরে যদিও অনুতাপ সহকারে সে খ্রীষ্টীয়ান হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু লাট পাদরীর ভয়ে তাহা করা হয় নাই।

বিকট বাবু এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মে ভর্তি হইবার জন্য উমেদার আছেন। প্রতি বুধবারে সমাজে গিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেখানে উৎসব কি সমারোহ ব্যাপার, বিকট তথায় বিনানিমন্ত্রণে অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইত। সে হস্তভাগার অগম্য স্থান ছিল না। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে এমনি গিয়া মিশিত যেন কতই আত্মীয়তা। অনায়াসে অপরিচিত ভদ্র লোকের গলা অড়াইয়া ধরিত। কথায় কথায় তাঁহার মুখে ভ্রাতা ভগ্নী। ভদ্র গৃহস্থ-ভবনে পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য আপে ভাপে বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িত। চক্ষুণ্ণজ্ঞায় সহসা কেহ কিছু বলিতে পারিত না।

আহায়ে বসিয়া আর সকলে যখন ভগবানকে স্মরণ করিবার জন্য চক্ষু বুজিতেন, বিকট সেই উপলক্ষে অমনি পাশের পাত হঠাতে থাধা তুলিয়া ধাক্কাতে আরম্ভ করিত। উপাসনার সময় সে একবার চক্ষু বুজিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বসিত, তাহার পর বেহারাদের সঙ্গে মিশিয়া তামাকু খাইত আর বেড়র বেড়র করিয়া গল্প করিত। শেষ শান্তি বাচনের সময় খুব উৎসাহের সহিত জোরে জোরে—শান্তি: শান্তি: শান্তি: (মনে মনে আপদ শান্তি) বলিয়া তখন আবার তাড়াতাড়ি হাঁকা ধরিত। উপাসনার স্থলে মহিলাদিগকে অমুপস্থিত দেখিলে বিকট বাবুর দুঃখ বিরক্তির আর সীমা থাকিত না। বলিতেন, “যে উপাসনার ব্রাহ্মিকা ভয়গণের সমাগম নাট আমি তাহাতে যোগ দেওয়া পাপ মনে করি!” এই বলিয়া সমাজের সভ্যদিগকে তৎসনা তিরস্কার করিয়া লম্বা লম্বা উপদেশ দিতেন। তাহার উপদেশের জালায় নিরীহ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মারা বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিকট সমাজে গিয়া চক্ষু তুলিয়া দেখিত, কাহার হাত মুখের ভয় কিরূপ হয়, এবং কেইবা মাক ডাকাইয়া ঘুমায়। হিন্দুধর্মে গিয়া আবার এই সব বিষয়ে লাল রক্ত রসের সহিত গল্প করিত। উপাসনা কালে কে চক্ষু বুজিয়া, খুব কাঁকাইয়া, দস্তপাতি বাহির করিয়া থাকে, কে আধঘুমন্ত অবস্থায় মুখে কোল টাঙ্গ, কার চুই কস দিয়া লাল গড়াইয়া ধারাবী পড়ে, কে নমস্কারস্থলে ক্ষুণ্ণিত হইয়া নিজা যায়, কে চকল বাসরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন করে, এবং কেইবা বৈবাহিকের ন্যায় পায়ে উপর পা রাখিয়া বাম হস্তে মলা তুলিয়া তুলিয়া তাহা গুটলি পাকাইয়া লোকের পায়ে ফেলিয়া দেয়। কোঁৎ কোঁৎ শব্দে কে ঢোক গেল, কে নির্জলা চক্ষে কাঁদে, কে হক না হক চেঁচাইয়া বয়ে, এ সমস্ত ধর বিকটের বিশেষ রূপ জানা ছিল। কোন্ কোন্ ব্রাহ্ম প্রার্থনা করিতে করিতে বক্তৃতা ধরিয়া ফেলে, কে উপদেশ কাড়িবার জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা ধরিয়া থাই হারাইয়া শেষ মাথা চুলকাই এবং মুখে বা আসে প্রলাপ বকিয়া যায়, লম্বা বক্তৃতায় কেই বা শ্রোতাদিগকে বিরক্ত এবং নিপীড়িত করিয়া তোলে এবং আপনাকে আপনি বড় বক্তা মনে করে, ইহাও সে বিলক্ষণ রূপে জানিত। বিকট এ সকল বিচিত্র

মাগরি বেধিত আর মুখ মুচকিয়া ঠোঁট টিপিয়া ক্রমাগত হাসিত । কখন বা সেই সঙ্গে আপনিও নানা রঙ্গ ভঙ্গে ব্যস্ত করিত । ব্রাহ্মচরিত্রের বিচিত্রতার এক প্রকাণ্ড তালিকা তাহার নিকট ছিল । বাহার্য্য মধ্যপান করে, স্ত্রীর সঙ্গে পুঁতুলের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, আকিসে ঘুস খায়, বিবাহ ঝগড়া বাধায়, কান ডাকায়, মিথ্যা কথা কয়, ধার লইয়া ঋণ শোধ করে না এবং এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমাজে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চাঁকা দেয় তাহাদের সঙ্গে বিকটের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল । ব্রাহ্মসমাজের যে দ্বিগুণ ভাল সে দিকে সে পদার্পণ করিত না, কেবল ঘোষ বুজিয়া বেড়াইত, কারণ তাহাই তাহার প্রয়োজন ।

অতঃপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যা বাবু বঙ্গদগণকে লইয়া উপাসনায় যমিলেন এবং বাস্তারামকে বহু সহকারে তাহার মধ্যে উপবেশন করাই-লেন । উপাচার্য্য অধ্যোতা গায়ক সকলে ধর্ম্মাঙ্গানে বসিয়া সংস্কৃতমিশ্র আভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা আরম্ভ করিল । বাস্তারামের নিকট এ সমস্তই নূতন, কারণ তিনি কোন কালে ব্রাহ্মসমাজ দেখেন নাই । সন্ধ্যা বাবুর সে দিন উপাসনায় আর বড় যোগ দেওয়া ঘটিল না, তিনি আগন্তুক নবায়ত বঙ্গুর সঙ্কট সাধনের জন্যই ব্যস্ত রহিলেন । বাস্তারাম তাঁহার সমাজ দেখিয়া প্রশংসা করেন, প্রীত হন, এটী মনে বড় ইচ্ছা । সন্ধ্যা বাবুর ব্রাহ্মসমাজ বহিঃ সামান্য, কিন্তু সকল প্রকার সামগ্রী তাহার মধ্যে আছে । একটা পুরাতন ভগ্ন তীর্থ বেলর কারমনিরাম, এক বোড় বীরা তবলা, একটা তানপুরা গায়কের সাহায্য করে । সম্মুখে গ্যালারি করা খান কতক আঁব কাঠের ডঙ্কা, মধ্যে উপাচার্য্যের জন্য চেয়ার টেবল । সকলে চক্ষু নুঁজিল, উপাচার্য্য হমকে হমকে কোঁকে কোঁকে বিশেষ স্বর ভঙ্গীর লহিত “আলে বেতে সে” শিক্ষার্থী ছাত্রের ন্যায় হুগিয়া হুগিয়া স্তব বন্দনা পাঠ করিলেন, অধ্যোতা বক্তৃতা পড়িলেন, পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল ।

তখনস্তর আর আর সকলে চাহিয়া গেলে সন্ধ্যা সেই টেবিলে এক খানি চাষর বিচাইলেন, এবং বিকটকে আহারের যোগাড় করিতে বলিলেন । চাষর খানির মাঝে মাঝে তরকারীর কোল হগুদের দাঁপ, এবং এমনি তাহাতে বিল্লী দুর্গক, বে নাকের কাছে ধরিলে না বোমি বোমি করে । টেবিলের

নীচে হাঁস এবং মূর্গির বিষ্ঠা এবং ছাগলের নাবি । এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাগ্গারামের হরিতক্তি উড়িয়া গেল । বিকট বাসুর (ওঁ বিষ্ণু, মিষ্টার বিকটের) আজ বিশেষ আনন্দ, বহু ভোজনের উপলক্ষে দ্বাদশ ব্যয়ে আজ তিনি কয়েকটা মূর্গ হত্যা করিয়াছেন, এক বোতল মদও আনা হইয়াছে; বাহার অন্য এ সমস্ত আয়োজন তাঁহার প্রয়োজনে আনুক না আনুক, বিকটের ইহাতে বিশেষ লাভ আছে । ছেঁড়া হাটকোট প্যান্টুলান পরিয়া উৎসাহের সহিত তিনি নিজেই খানসামার কাজ করিতে লাগিলেন । কিন্তু হুঃখের বিষয়, অথবা সুখের বিষয়, বাগ্গারাম এ সকল কিছুই খান না; যাহা কিছু তাঁহাকে দেওয়া হইল সমস্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন, গৃহস্থামীর বিশেষ অনুরোধে কেবল দুই একটি ফল খাইলেন । মংসা মাংস মদরিকা ইত্যাদি পক্ষমকার ভাতৃদ্বয়ের প্রস্তুত উদর মধ্যে প্রবেশ করিল । মিষ্টার বিকট পুনঃ পুনঃ দুই চারিটা অস্ত্রহীন অস্ত্র ধন্ব ইংরাজী কবাক্স বাগ্গারামের সহিত আলোপের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বাক্সালা উত্তর পাইয়া আর বেশী দূর সে পথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না । অধিকন্তু সে অন্য দ্বাদশ নিকট কিছু মিষ্ট ভৎসনাও খাইতে হইল । তথাপি কাহার সাধ্য তাহাকে অগ্র-তিডকরে; বাক্সালা ইংরাজিতে মিশাইয়া বাগ্গারামকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য সে ভজাইতে লাগিল । সঙ্কট বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন, ভদ্রলোকের সম্মুখে বেশী কিছু বলিতেও পারেন না, অথচ রাগে অস্ত্র গল করিতেছে ; অন্য সময় হইলে ভাতাকে পাহুকা ধরা শুক্রবা কাতন, কোনরূপে সে দিন মান বজায় রাখিলেন । অতঃপর বাগ্গারাম বলিলেন, “আমার কতকগুলি কথা স্মিত্যাস্য আছে, চলুন বাক্সালায় গিয়া বস। যাক, এখানে বড় দুর্গন্ধ ।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সখের ধর্ম ।

আহারান্তে বারান্দার বসিয়া দুই জনে বিবিধ কথাই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন । বাহ্যারাম সভ্যসঙ্ঘদ্বারী ও কৃপিনা হু হু, ব্রাহ্মসমাজ অনিষটে কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মনে ইহানীং কিছু কৌতূহল অস্থিরাছে । নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সঙ্কটচরণের সঙ্গে তাঁহার কথা হইতে লাগিল ।

সঙ্কট । কিরূপ লাগলো ? আপনার মনের সঙ্গে মিললো কি ?

বাহ্যারাম । কেন বেশত ! সমাজ কি আপনাদের প্রতি সন্তোষেই হয় ?

স । না, প্রতি সন্তোষে হয় না, তবে ভক্তলোক টোক কোন দিন এলে করা যায় । আর বাৎসরিক উৎসব খুব সমারোহের সহিত হয়ে থাকে ।

বা । আপনাদের সভ্য সংখ্যা কিছু বড় কম ।

স । হাঁ, নিতান্ত কমও নয়, তবে আজ কাল লোকের ভিত্ত উৎসাহ নাই । কিন্তু আমার স্ত্রী যে দিন উপাচার্যিকা হয়ে লেকচার দেন, সে দিন জায়গায় কুলিয়ে উঠিতে পারি না । ভয়ানক ভিড় হয় ।

বা । আচ্ছা মশায়, এ প্রকার নৃতন তর পুর আপনারা কোথায় গেলেন বলুনত ? কখনত এরূপ শুনি নাই ?

স । এটা আমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই পুর, এই পুরে আমাদের সমাজে বক্তৃতা উপাসনা হইয়া থাকে ।

বা । যে বাবুটী প্রার্থনা করিলেন, বেশ কিছু তাঁর ভক্তিতাব । গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে পারা সহজ কথা নয় । আমি শুনে বড় পরি-ভূপ্ত হলেম । রোদনের শব্দ শুনে চক্ষে যেন জল আসছিল ।

স । অজ্ঞে সেটা বাস্তবিক ক্রন্দন নয়, ঐ রূপ কাঁদুনে পুর । আমরা বৈ উপাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদলেই ঐ প্রকার কাঁদুনে পুরে বক্তৃতা করেন । তখনত এক প্রকার মন নয় ।

বা । বাই হউক, মোক্ষ বেশ তাবটুকু ।

সকট ঈষৎসায় সহিত বলিলেন, “আপনি বোধ হয় তাঁর মুখ পানে চেয়ে দেখেন নাই। মুখভঙ্গী দেখিলে আর সে দিকে আপনার চাহিতে ইচ্ছা হইত না। চক্ষে এক ফাটা জল পড়ে না, অথচ কান্না; বেশ সেধে-ছেন। কিন্তু এ সমস্ত আমারি চেষ্টার ফল। তাঁকে আমি অল্পগ্রহ করে একটা কাজ দিয়ে এখানে রেখেছি। নিজে ভাল বাস্তাব্য জানি না তাই, নৈলে নিজেই সব করা হয়ে থাকে। সমস্তই করে কর্মে বুঝিয়ে দিতে হয়।

বা। আপনারই দলে না কি এক জন লিডারের বড় অভাব হয়েছে ?
স। না, লিডারের কিছু অভাব নাই, কলোয়ার পাওয়া বাচ্ছে না, লিডার আমরা সকলেই। এবং প্রত্যেকেই অভ্যস্ত। ভ্রান্ততা কেহ স্বীকার করে না।

বা। তথাপি এক জন বিশেষ নেতা না হলে কি কাজ চলে ?

বিকট বাবু বলিলেন, “হাঁ মহাশয়, আপনি যা বলিলেন সে কথা সত্য। আমি দ্বাদা বাবুকে সেই জনা পরামর্শ দিয়াছিলাম যে আপনারা ভাল একটা লিডারের অন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিন্।

স। আরে মোলো এ ষ্টুপিডের জালায় যে হাড় জালাতন দেখি! তুই কেন উত্তর করিস ? এ কি ছুগমাষ্টার তাই এডুকেশন পেজেটে বিজ্ঞাপন দিব ?

বা। আচ্ছা মহাশয়, যিনি উপাসনা করিলেন তাঁর গলায় পৈতা কেন রয়েছে ? আপনারাতো জাতিভেদ মানেন না ক্তনিছি ?

স। আরে দ্বাদা তুমিও যেমন, পৈতে! পৈতেত সামান্য ককা, আমারও গলায় একগাছ আছে, ওটা বড় দরকারী জিনিষ। সে জনা কিছু হুঃখ নাই, আমাদের উপাচার্য। ভাষার বাড়ীতে দুইটা বিধবা আছে, একটা তাঁর খুড়ী, একটা মালী; বিবাহ দিলে তারা এখন অনায়াসে বিবাহ করে. দেশের কত উপকার হয়, কিন্তু ভায়া এমনি ভীক কাপুরুষ, তা কিছুতেই পেরে উঠলেন না।

বিকট। এক জনকেত আমিই অনায়াসে বিয়ে করতে পারি।

স। থাক থাক! তুই চুপ করে বসে থাক, না হয় উঠে চলে যা। আপ-
নার পেট চলে না, উনি আবার বিয়ে করবেন।

বা। সকল বিধবারই কি বিবাহ করা উচিত আপনি মনে করেন?

স। তার আর সন্দেহ? বিধবাবিবাহ চলিত না হইলে তারকে উদ্ধার করা যাবে না। আমিও সেই জন্যই বিধবাবিবাহ করলেম।

বা। আপনাদের এ ধর্মের সংস্থাপকত রামমোহন রায়?

স। হাঁ, তাঁর নামই চলিত বটে। তবে তিনি বিশেষ কিছু করে যেতে পারেন নাই।

বা। তবে কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ মতের প্রবর্তক বলেন?

স। প্রবর্তক ঠিক বলা যায় না, সহায় কতকটা বলিতে পারেন।

বা। কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারাই সভাসমাজে বোধ হয় এ ধর্ম লোকে জানিতে পারিয়াছে। তাঁহাকেইও আপনারা লিডার বলেন?

স। লিডার একপ্রকার হইতে পারেন, কিন্তু ওরিয়েন্টাল নহেন।

বা। স্বার্থ ওরিয়েন্টাল তবে কে?

বিনয়ের সহিত আত্মপোষণ করিয়া সন্তুষ্ট শেখ আপনাকেই প্রকারান্তরে ওরিয়েন্টাল স্বীকার করিলেন। এবং স্পষ্ট বলিলেন, “আমি বার বৎসর বয়সে ছাত্রাবস্থায় ধর্মবিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা পড়িলে আপনি পরিষ্কার দেখিতে পাবেন, নববিধানের নূতন আইডিয়া সমস্ত তাহাতে ছিল। নেমধারাম দেশ, বার বাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতে চায় না।

বা। আচ্ছা, যিনি বক্তৃতা পড়িলেন, তিনি কি বেশ বিদ্বান? বোধ হয় অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ তাঁহার দেখা আছে।

স। হাঃ হাঃ হাঃ! ও সব কথা যেতে দিন যেতে দিন। সময় পাই না, নতুবা আরো অনেক ইম্প্রুভ করা যেতে পারে।

বা। কেন, যে কথাগুলি লিখে এনেছিলেন তাতেও বেশ চিন্তা আছে, গভীর ভাবও আছে।

স। থাকবার ভাবনা কি।

বা। আপনি বুঝি তবে সব বলে টলে দেন?

স। হাঁ, বলেও দেওয়া হয়। তা ছাড়া অধিকাংশ কেশব সেন, আর দেবেন্দ্র ঠাকুরের বক্তৃতা উপদেশ থেকে তোলা। আসল কথাটা কি

তা জানেন, আমিই এর সব, নিজহুখে বলাটা ভাল দেখায় না ; কিন্তু যেটি না দেখিয়ে তুমিই দেখে তা আর হবার যো নাই। একটু মনোযোগের ক্রটি হয়েছে, অমনি দেখুন না, পরের বৈ থেকে তুলে সরেছে। ভরিনাতিটাও কিছুই নাই। চিন্তা করে করে আমার ভায়বিটিশের যোগে হয়েছে, আর পেরে উঠি না। এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য আমি সর্বস্বান্ত হইরাছি। তাতেও কি লোকের নিকট প্রাথমিক প্রত্যাখ্যা আছে? এমনি অকৃতজ্ঞ সব লোক, এত করিলাম, তা কেউ বুঝে একটা বায় স্বীকার করিতে চায় না। এ দেশ অতি পাজি দেশ।

বা। আপনি এত শীঘ্র দেশের লোকের উপর চটিলে কাজ করিবেন কিরূপে?

স। তা কি আর ছাড়িব? শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকতে আর তা পারব না।

বা। আপনাদের ভিত্তর নির্দোষ সাধনের কি কিছু চর্চা হয়ে থাকে?

স। সেত বৌদ্ধদের ধর্ম! আমাদের হচ্ছে সকল প্রবৃত্তির সাম-
ঞ্জস্য রক্ষা করা। উদার সার্বভৌমিক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম ব্রাহ্মধর্ম, ইহার ভিত্তর কোন রূপ ভ্রান্তি কুসংস্কার সন্দেহতা আসিতে পারে না। সকল মনু-
ষ্যকে একপরিবারে বদ্ধ করিবার জন্যই ইহার অবতরণ।

বা। তবে আপনাদের ভিত্তর বোধ হয় দলাদলির কোন গোল মাল নাই। বেশ, বেশ, এই তো ঠিক।

স। বেশই ছিল বটে, সম্প্রতি একটু দলাদলির ভাব দাঁড়িয়েছে।
মতে কিন্তু সব ঠিক আছে, সকলেরই এক উদার মত।

বা। দলাদলি হউল কেন?

স। কেন, তাহা আগেই তো বলিছি। সকলেই লিডার, ফলোয়ার
কেহ নাই। লোকের মত কাগজে লিখে বক্তৃতা করে, বেহারা হয়ে
আপনার কথা আপনি আরও বলে বেড়াতে পারি না, সুতরাং রেমো
যেমো হারু তাক সকলেই এখন লিডার।

বা। কত গুলি হল হয়েছে?

স। তা বাঠের কোলে বসীর বুকে ছাই দিয়ে অনেক গুলি। ভিনটেও

প্রধান, (১) আদি, (২) সাধারণ, (৩) নববিধান। উত্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আবার আছে। জনে জনে দল বলিলেও বলা যায়। বাবীনতার জোরে সকলে দল দিকে সটকে পড়েছে।

বা। বাহারা সাম্প্রদায়িকতা বিমোক্ষের জন্য পুরাতন ধর্ম ছাড়িলেন, তাঁর কেন আবার সাম্প্রদায়িক করেন ?

স। না করে কল্পবেন কি ? কারো সঙ্গে কাহারো বে মেনে না। আদি বলিলেও কেহ আমার ভাববে না। এক জারগার ওঁড়োওঁড়ি করা অপেক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া ভাল মনে করিয়া এইরূপ করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র ঠিক আছে। সকলেই আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সাম্প্রদায়িকতা মহাপাপ! পূর্বকার লোকেরা বিশেষ বিশেষ মতভেদ বশতঃ আপনাপন বিশ্বাস সংস্কার অনুসারে সত্যরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দল বাঁধিত, আমাদের মধ্যে মতের একতা আছে, মূলতঃ কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, কেবল আত্মকর্তৃত্ব পদমর্যাদা প্রভৃতি এই সকল লইয়া দলাদলি হইতেছে। সেল্ফ আর প্রাইড ইন্ডিভিজুয়েলিটিতেই সর্বনাশটা হইল। এমন আত্মাভিমান অহঙ্কার আর কোন সমাজে আগনি দেখিতে পাইবেন না।

এ কথার বিকটের মনের আগুন বিগুণ জলিয়া উঠিল। সে বলিল, “মহাশয়, বাস্তবিক দাদা বাবু বা বলিলেন ঠিক কথা। “সেল্ফ” থাকিতে, এবং কল্যাকার জন্য ভাবনা থাকিতে কিছু হবে না আপনাকে আমি লিখে দিতে পারি। বৈরাগ্য না হইলে কি ধর্ম হয় ? হার ! এ অনিত্য সংসারে কেউ কারো নয়। এক জনের বহিষ্ত্রী অভাবে বংশ লোপ হয়, কেহ তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। অহঙ্কারের যেন সব অধতার ! সত্য সত্য বহি ধরেন, নববিধানের সামঞ্জস্যের মত প্রথমে “মাই হান্ডল সেল্ফ হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু কে তা মানুবে ?

বা। সে কি প্রকার ?

বি। আমার কাছেও কোন দলাদলি নাই। এঁরা সব ঘরে ঘরে বিবাদ করেন, কেহ কারো সঙ্গে মিশিতে চাহেন না ; আমি হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্ম সকলের বাড়ী বাঠ, বসি, ভাদের সঙ্গে বাই, আদোদ

করি, সকলে বধেই ভালও বাসে । আহা! বিবরণে আমি সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছি । হিন্দুর সুধতনি, মুসলমানের গরু ভাজা গরুর ঝোল, খ্রীষ্টানের মূর্গা শূণ্ডর মেঘ চাপ ইত্যাদি সবই খেতে পারি । আবার শুধু নিরামিষ ? হুণ বি একটু বেশী থাকলে ত্র্যও বেশ খেতে পারি । কিছুতেই আমার গোঁড়ামি নাই ।

স । আন্‌প্রিন্সপেলড হান্সাপ ! ধাম্, আর বিদ্যার কাজ নাই !

বি । কেন ? ধাম্‌বট বা কি জন্য ? আমার কি আর স্বাধীনতা নাই ? মশায়, এঁরা উদ্ধার ভাবে খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমানদের সঙ্গে মিশিতে যান, তাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, অথচ ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে মুখ দেখা দেয় নাই, এই কি উদ্ধারতা ? এ দিকে রোজ রোজ উঠতে বসতে খেতে শুতে শাস্তি : শাস্তি : শাস্তি : ! কিন্তু চক্ষু খুলেই মার মার কাট কাট শব্দ । আমি মশায় ল্পষ্টবক্তা । ওঁরা বধন শাস্তি : শাস্তি : শাস্তি : বলেন, আমি মনে মনে বলি, “নারদ, নারদ, নারদ !”

বা । ঘাউক, আর ও সব শুনে চাই না । নির্দোষ সাধন তা হলে আপনাদের মধ্যে চলন নাই ।

অনন্তর বাহ্যারাম পুনরায় একবার সন্তানকোলে চপলার সেই রূপটি দর্শন মানসে সঙ্কটকে বলিলেন, “আপনার সহধর্মিণী কি এখানে আসিবেন ? তাঁহার ক্রোড়স্থ সেই শিশু সন্তানটী বড় সুন্দর ।” বাহ্যারামের কথা শেব হইতে না হইতে বিকট বলিল, “আপনি মিসেস্‌ গাঙ্গুলীকে দেখিতে চান ? আচ্ছা আমি ডাকিয়া আনিতেছি ।” এই বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল ।

যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি সে সময়ে বাহ্যারামের একেশ্বর-বাদের দিকে একটু মতি ফিরিয়াছিল । কিন্তু তাহা এক প্রকার অভ্যস্ত-বাদেরই নামান্তর, বিশ্বাস ভক্তির সঙ্গে তাহার কোন সংশ্লেশ নাই ।

সঙ্কটচরণের নিকট বাহ্যারামের মনোবাহ্য পূর্ণ হইল না, লাভের মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁহার কিছু অপ্রত্যাশিতা দেখিয়া গেল । সঙ্কট সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন ; তিনি আতিশয় বজ্রাঘাত রোধিত । সাহেবীজানাও করিবেন, আবার ব্রাহ্মসমাজও চালাইবেন, কাজেই তাঁর নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব

অবগত হইবার আর প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়। মুরকি এবং টাকার যোগাড় থাকিলে এত দিন হিন্দুধর্মে মিশিয়া বাইতেন। বিবাহের অনু-
রোধে ব্রাহ্ম হওয়া, সাধন ভজনের ব্যবস্থা কে রাখে? পরে সপ্তম রিসেস্
গাম্ভী সত্য হইলে বাস্তবায়ন তাঁহার আপাত মন্তক বিজ্ঞানদৃষ্টিতে
নিরীক্ষণ করিয়া তাহা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিয়া গেলেন।

বাইবার সময় বিকট তাঁহাকে বাড়ী পৌছিয়া দ্বিবার অন্য সঙ্গে গমন
করিতেছিল। সঙ্গে বাওটা তাহার নিত্য সঙ্গী হইত। সে জানিত,
সন্তোষিণী বিধবা এবং নিশানাথ বাবু তাহার বিবাহ দ্বিবার অন্য প্রস্তাব
আছেন। উদ্ভিষে সে বাস্তবায়নের নিকট উদ্ভিষি করিতেছিল এবং
নিজের কোয়ালিফিকেশনের বর্ণনা করিয়া পাছে পাছে বাইতেছিল।
এমন সময় চারি পাঁচ জন লাঠীহাতে, মুখে কেটাবীধা দ্বন্দ্ব এবং আকার
লোক আসিয়া তাহাকে ধরিল এবং মারিতে মারিতে খুঁটিয়ান পদীর
দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। প্রহারের ধমকে বিকটের হ্যাট উড়িয়া
গেল, ছোঁড়া পাচা প্যাটেলুন টুকরা টুকরা হইল, মুখের চুরট ধসিয়া
পড়িল। পরিশেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর লাঠিয়ালদিগের হস্ত ছাড়াইয়া
সে উর্দ্ধ্বাঙ্গে পৌঁ পৌঁ শব্দে ছুটিয়া পলাইল। পলাইবার কালে একটা
শেরাকুলের কাঁটার ঝোপে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, এ দিকে পাছে
পাছে গুণ্ডার দল ছুটিতেছে; বিকট উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে অস্ত্রের
সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আবরণটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল দেহধানি মাত্র
লইয়া প্রস্থান করিলেন। কাঁটা ছাড়াইতে গেলে হাড় কয় খানা আর
সে দিন রক্ষা পাইত না। তার পর এক জন বলবান্ বণ্ডা মহাবেগে
ছোঁড়িয়া আসিয়া তাহার কান টানিয়া ধরিল। কিন্তু বিকট এত বেগে
ছুটিতেছিল যে কর্ণধারের হাতের কান হাতেই রহিয়া গেল, সে এক-
কর্ণ হইয়া আশ্রয় করিল। সৌভাগ্যক্রমে বাস্তবায়নের গারে কোন
আঘাত লাগে নাই, তিনি নিরাপদে গৃহে পৌঁছিলেন। বিকটের ও রূপ
হর্দ্যকার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি খুঁটিয়ান পদীতে সে দিন মূর্খা ক্রম
করিতে বান, গিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, বিনা পরসায় চারিটা মূর্খা
ক্রম করিয়া বাড়ী আনিলেন। দ্বিবার নিকট যে মূল্য পাইয়াছিলেন তাহা

আজসাং করিলেন। এই জন্য কয়েকটা খুঁটিয়ান যুবক তাঁহার ঐক্লপ বিড়ম্বনা করে। একরূপ ঘটনা তাঁহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিত, এটা নূতন নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

পাষণে অক্ষুর ।

যুবা প্রকৃতিবশতঃ এবং পারিবারিক দুর্ঘটনায় বাহ্যারামের চিন্তে পর্যায়ক্রমে অনেক প্রকারের পরিবর্তন ঘটয়াছিল। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বড় ভাগ্যবান ছিলেন। যদিও ব্যয়োধর্ষপ্রভাবে কখনো অদ্বৈতবাদে, কখনো জড়বাদের অমীমাংসিত আবর্তনমধ্যে পড়িয়া একবার এ সৌম্য আর একবার তদ্বিপরীত সৌম্য চলিয়া যাইতেন, তথাপি তাঁহার মনের সাম্য কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। সেই অন্য চরিত্রটী বরাবর বেশ নির্মল শুদ্ধ ছিল। কাহারো উপকার করিতে পাকুন না পাকুন, অনিষ্ট কোন দিন কাহারো করেন নাই। দাম্পত্য প্রেম বা পারিবারিক সুখ সম্বন্ধে বঞ্চিত হইয়াও কখনো নৈরাশ্যে পড়েন নাই, এবং কতি পূরণের জন্য পাপ পথেও কখনো যান নাই। তত্ত্বপিপাসু হইয়া একাগ্র চিন্তে যেমন একটা একটা বিশেষ জ্ঞানের পথে বেগে ধাবিত হইতেন, তেমনি তাহা হইতে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নির্কীর্ণের অনন্ত শান্তির ভিতরে প্রবেশ করিতেন। ফলতঃ নির্কীর্ণ সাধনের পক্ষে তাঁহার স্বভাব চির দিন অমুকূল ছিল। নির্কীর্ণকার নির্কীর্ণজন্মনা হইয়া অনেক কাল তিনি নিকট অবস্থায় থাকিতে পারিতেন। প্রতিকূল অবস্থার ভীষণ তুফানের মধ্যেও এই ভাবটী তাঁর অবিচলিত ছিল। বৈজ্ঞানিক মত বিশ্বাস পরিবর্তন ও পঠন সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়ম মনোজগতে প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যেও যেখানেই বাহ্যারাম তত্ত্বরাজ্যের তিম্র তিম্র প্রবেশে পরম্পরবিরোধী মতের ভিতরে ভ্রমণ করেন। প্রথমে ব্যক্তিবিশীল নিষ্ঠুর শক্তিবাদ বা

আধ্যাত্মিক অধৈর্যবাহ, তাহার পর অনাস্থবাহ বা জড়বৈর্যবাহ, তখনতর বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্দীপ্তত্ব আলোচনা করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতসারে তিনি পৌত্তলিতা ও নরপূজার রাজ্যে উপনীত হন। ইরোরোপের আধুনিক এগ্নিষ্টিক মত, সংশয়বাহ আলোচনার পর বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্দীপ্ত, কঠোর নীতি, অহিংসা এবং দয়ালীলতার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আগষ্ট কোমন্ডের নারীপূজা বা মমুষ্যভেদ উপাসনা উপরিউক্ত মতেরই অবশ্যাস্তাবী শেষ ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার কিছু পূর্বে করেক দিনের অন্য বাহ্যারাম পণ্ডিত একবার বিষসকিষ্ট হন। লম্বা চুল রাখিয়া বাগবজ্র স্বস্ত্যয়ন হোম করিতেন, ভূত প্রেত নামাইতেন, জলপড়া ধাইতেন, করকোষ্ঠী গণাইতেন, দৃশ্য বস্তুর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির অদ্বিত অলৌকিক মহিমা ভাবিতেন। আর যত রাজ্যের কুতের ওঝা দৈবজ্ঞ অদৃষ্টবাহু প্রভৃতি বুদ্ধকল্পকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনি-
তেন। এক্ষণে তিনি কার্য্যতঃ জড়বাহী হইয়া নরপূজার সোপানে আরো-
হণ করিলেন।

কিন্তু এই পথে আসিয়া বাহ্যারাম মমুষ্যকে, বিশেষতঃ নারীজাতিকে সম্মান আদর এবং প্রীতি করিতে শিখিলেন। ইহার প্রভাবে সন্তোষিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। নারীপ্রকৃতির মাধুর্য্য রসের অভ্যেদ মোহিনী শক্তি স্বর্গের দেবতাদিগকেও বশীভূত করে। কি উর্দ্ধরেতা বিরক্ত বৈরাগী বনচারী সন্ন্যাসী, কি নরশোণিতলোলুপ নির্দর স্বভাব সৈনিক পুরুষ; কি শৈলকন্দরবাসী অসত্য নাগা ভিষকুকা পারো, কি মুণ্ডিতমস্তক তিলকধারী অর্দ্ধ উলঙ্গ বৈষ্ণব বাবলী; কানা বোবা ছাড়া কাল। বুদ্ধ পঙ্গু হেঙ্গলা কান্ধালা পাগলা টিকিমাথার নামাবলীগারে তট্টা-
চার্য্য পর্য্যন্ত রমনীর রমনীর কোমল কান্তির এবং মধুর স্বভাবের প্রভাব ইহারা কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। মহাজ্ঞানী সংশয়বাহী জন ষ্ট্রয়ট্ মিলের কুতর্কদ্বিভ মনও নারীসংসর্গে শেষ এমনি ভাবুক প্রেমিক হইয়াছিল যে, তিনি স্ত্রীর সমাধিভূমির পার্শ্বে এক কুটীর নির্মাণ পূর্ব্বক এক বর্ষকাল তথায় অবস্থান করেন। তবে বাহ্যারাম একা কেন সে রসে বঞ্চিত থাকিবেন? তাঁহার বিস্তীর্ণ মরুভূমি তুল্য জন্মের

হুগো হুগে বেন এক একটা হুগ হুটিতে লাগিল। অগ্রে তিনি সন্তোষিনীর সিন্ধুরে তত তাবিতেন না, তাহার তিতরে প্রবেশ করিতেন না, একদা তাহার সঙ্গে মিশিরা স্ত্রীশ্রুতির বিশেষ তত অধ্যয়নে তাঁহার স্পৃহা জন্মিল। ক্রমে দয়া দয়া একটু বেশী হইল। কোন রূপে তাহার একটু সেবা করিতে পারিলে বেন তিনি আপনাকে এখন কৃতার্থ বোধ করেন।

কিন্তু সন্তোষিনীর হৃদয়ের শূন্যতা তবু হইতে পূর্ণ হয় না, কেমন বেন কঁক কঁক লাগে, প্রাণ হ হ করে। কেমন এক প্রকার অনির্দিষ্ট অনুধের তীব্র তাপ অন্তরে দিবা নিশি জলিতে থাকে। বে প্রেমাস্পদের চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে চক্ষের সম্মুখে; পুনঃ পুনঃ তীব্র বিমল কান্তি প্রসন্নানন সঙ্গর্গনে নয়ন তৃপ্ত হইতেছে, তাঁহার হৃদয়ের সুধাষিক্ত বচসাবলী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি হৃদয়ের জালা দূর হয় না।

অজানিত মহাসমুদ্রপথে নাবিক কলম্বুস্ যেমন বিবাসে নির্ভর করিয়া তাহার চালানিয়াছিলেন, সন্তোষিনী আন্তরিক হৃর্জের প্রেমের উত্তেজনায় উৎসাহী হইয়া আশাকে অলঙ্ঘনপূর্বক তেমনি এই অপরিচিত প্রেমপথে ক্রমে অঙ্গে অঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথহার হইয়াও কখনো পশ্চাদ্গমন করেন নাই। এত দিন বেক্রম সাধারণ ভাবে বাস্তবায়নের সেবা করিয়া প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিতেছিলেন, তাহাতে আর আশা মিটিল না। কাল সহকারে ভালবাসা বত প্রগাঢ় হইতে লাগিল, সেবার ভাব তত প্রবল হইয়া উঠিল। কোন দিন কোন সুরসাল উপা-
দেয় মিষ্টান্ন পকায় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, কোন দিন টেবিলের উপর ভাল ভাল ফুলের পুষ্পের স্তবক প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, কখন বা সদ্যোজাত ফুলের সুচিকণ মালা গাঁথিয়া তাঁহার করে অর্পণ করিতেন। এক দিন গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বাস্তবায়ন ইন্ডিস্ট্রির অর্জনায়িত অবস্থার পুস্তক পড়িতে পড়িতে নিদ্রাগত হন, সেই সময় সন্তোষিনী পরিহাসচ্ছলে একটু ঠাণ্ডা জল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে পড়িতের ঘুম ভাঙিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রেমাত্মকতা এবং বিজ্ঞানের যৌর্য্য ভাঙিল না; তিনি মনে করিলেন বুঝি দৈবাৎ কিরূপে সন্তোষিনীর হাত হইতে জল আসিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতকে নিভাস্ত সত্যবৃক্ষের শোক মনে

করিয়া গরে আর তিনি ভাবনা করিতে বড় সাহসী হইতেন না । সত্বে
এরূপ হাঁচাণ্ডেচের লোকের সঙ্গে অনেক প্রকার আন্দোল পরিহার করিতে
পারিত । দ্বিবাভ্যাংগে কখন তিনি নিজাঙ্কুর হইলে সন্তোষিনী আস্তে আস্তে
স্থলের উপর পাখার বাতাস করিতেন এবং বাহি তাকাইয়া দিতেন । রাত্রি-
কালে ঘুমাইয়া পড়িলে মশারি খাটাইয়া দিতেন । বাহাতে তিনি সুখে পান
ভোজন করেন, আরামে নিদ্রা ঘান ; তাঁহার গৃহী বাহাতে সুপরিচ্ছন্ন, এবং
পরিচ্ছন্ন পৃথলাবত থাকে ভজন্য সন্তোষিনীর ঐকান্তিক বস্তু পূর্বেও
ছিল, এক্ষণে আরো অধিকতর রূপে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল । কি যে
তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য, বাহারাম হইতে যে তাঁহার কি উপকার সাধিত
হইবে, তাহা পরিষ্কার রূপে কিছুই বুঝিতেন না ; তবিশ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা,
অবচ সেই অন্ধকার বড় লোভের সামগ্রী ; অপ্রকৃতিত আশার অনিশ্চয়তার
মধ্যে যেন কত কি সুখের তিনি পাইবেন, ইহাই মনে হইত । মূল কথা
সন্তোষিনীর প্রাণের ভিতর একটা কি বস্তু পেমশক্তি প্রবেশ করিয়াছিল ।
সেটা কি, তার বাড়ী কোথা, নাম কি, তার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ, কি সে
চার, এ সকল বিষয়ের পরিচয় দিয়াও সে আসে নাই, সময়ে যখন নিজ-
মূর্ত্তি ধরিলে তখন বুঝা যাইবে ; এখন কেবল যেন গোলোক ধাঁধার আঁধা-
রের মধ্যে কলিয়া অনাথা কুলবালাকে ঘুরাইতেছে, যেন তাহার সঙ্গে
অপদেবতা চালিয়া বসিয়াছে । তাই সে ইচ্ছা করে যে এক বার বাহা-
রামের কাছে বসি এবং গল্প করি, তাঁহাকে আদর করিয়া নানা সামগ্রী
খাইতে দিই, তাঁর পায়ে একটু পাখার বাতাস করি, নির্জনে হুই জনে বেড়াই,
জলের খুলিয়া মনের সুখ দুঃখের কথা কই, এবং কান ভরিয়া তাহা শুনি ।
জ্বরে বড় ভালবাসা আছে,—ইচ্ছা কৃতি উদ্যম অহুসার হস্ত পদ চকু
কর্ণ প্রভৃতিকে তাহার দাস করিয়া দিবা নিশি তাহাণিকে প্রিয়তমের সেবার
নিযুক্ত রাধি এই কেবল তাহার কামনা । রসগ্রাহী ভাবুক প্রেমিক কবিরূপ
অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, জননী যেমন সন্তানকে স্নানান করাইবার
জন্য ব্যাকুল হয়, সন্তোষিনী বাহারামের জ্বরে নিজজ্বরের উদ্বেলিত প্রেম-
বেগ চালিয়া দ্বিবার জন্ত তেমনি অস্থির হইয়াছে । অবশ্য দেবপ্রতিমা-
ভক্তগণ বেতন আপনাদের বিগ্রহ ঠাকুরের দান পূজা ভোগ বৈকালি

আরতি মহোৎসব অত্রাণ ইত্যাদির অল্প সদাসর্বদা ব্যস্ত, কিম্বদন্তি
মিত্য নব নব ভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের তুষ্টিসাধন করিবে এই বেনন
তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সন্তোষিনী ঠিক সেই ভাবে বাহ্যারামের নিত্য
সেবার নিযুক্ত রহিলেন ।

তাঁহার ঈদৃশ সেবা সৌজন্য প্রীতিকর ব্যবহারে বাহ্যারামও মনে মনে
অবশ্য তাঁহার প্রতি বর্ধেই কৃতজ্ঞ হইতেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে
পলিয়া বাইত, সে ভাব বাহিরে সমস্ত প্রকাশিত না হউক, কিন্তু আকার
ইচ্ছিতে, কথার সুরে অনেকটা বাহির হইয়াও পড়িত । ইহা কি এক
আশ্চর্য্য গভীর রহস্য ! এক জনের অকৃত্রিম ভালবাসা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অপ-
রের হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে কেমন অঙ্গে অঙ্গে স্বীয় অধিকার বিস্তার করে ।
‘হুইটী প্রকাশে স্রোতস্রোতী মহাবেগে খতম গতিতে চলিতেছে, তাহার
মধ্যে এক বশু ভূমি ব্যবধান । একটা নদীর গতি,—সমগ্র গতি সেই
ভূমি ভেদ করিয়া অপরটীর সঙ্গে মিশিবার জন্য বাইতেছে । ক্রমে ব্যবধান
ভূমির প্রস্তর কঙ্কর কঠিন স্তম্ভিকার ভিতর স্রোত প্রবেশ করিল, বাধ
ভাঙিবার আর বড় অধিক বিলম্ব নাই । অল্প কণের মধ্যে স্রোত একা-
কার হইবে । এক দিকের প্রবল স্রোতের টানে অন্য দিকের গতি এখন
বেন কতকটা মলোভূত হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে ফিরিয়া এই দিকেই
আসিবে । মানবমনের কার্যের গতি কি শূন্য ! কি আশ্চর্য্য অমৃত !

নবম পরিচ্ছেদ ।

বিপদে বন্ধুতা ।

বৈজ্ঞানিক জীবনে নির্দোষজনিত শাস্তিরসের ভিতরে অজাতসা-
বধন প্রেমরস সংক্রান্ত হইল, তখন বাহ্যারামকে তদ্বারা কিছু ভাবান্তরিত
এবং রূপান্তরিত করিয়া তুলিল । হুইটী রসের সংযোগে মানবমনে এক অনির্দ-
লীয় সুখরস সহংগর হর । বেন অরম্ভ মিলিত সুখরস । তদ্বিভ্যং

সর্বসঙ্গীত জীবন গঠনের পক্ষে এই দুইটী প্রধান উপাদান। ইহার সহযোগে জানে ভাব, শান্তিতে মতিতা ও উদ্যম, এবং গভীর কবিত্ব রস সঞ্চারিত হয়। বেন হির যৌর গভীর অতল অলবির প্রসাদ জ্বলয়ে জ্বলি বিচিমালা কুহুম্ব মাকুত হিল্লোলে ক্রীড়া করিতে থাকে। মীরস হৃৎকণ্ঠ শৈলবন্ধ বিদীর্ণ করিয়া বেন হুম্বিল্ল নির্মূল বারিধারা বহিয়া যায়। নারীবতাবের মধুরতার বাস্তারামের জীবন বধন কিছু মিষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তিনি পৃথিবীর সেবার উৎসাহী হইলেন। অনসমাজের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিলেন। ভাল-বাসা এবং সেবা এ দুইটী এক হুজে সম্বন্ধ। নিতুণ শক্তিবাদে বত বিন বিশ্বাস থাকে ততদিন মানুষের সংসর্গ ভাল লাগে না, কাহারো উপকার বা সেবার প্রবৃত্তি অশেষ না, কেবল চূপ করিয়া একা নির্জনে বসিয়া থাকিতেই ইচ্ছা হয়। পরে বধন মণ্ডণ পুরুষের লীলারস কিঞ্চিৎ জ্বলয়ে প্রবেশ করে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটী ব্যক্তির সঙ্গে আন্তরিক প্রেমমিলন হয়, তখন প্রাণের টানে মনের অমুরাগে লোকে কতই না বাটে! এই অবস্থায় সাধারণ সেবার ভাবও জ্বলয়ে উদ্ভিত হইয়া থাকে।

এই সময় নিশানাথের পত্নী গয়া কাশী প্রয়াগ ত্রীমূল্যবন মথুরা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনের জন্য অতিশয় ব্যাকুলিত হন। সম্ভানহীনা বধ্যা নারীর পক্ষে শের বয়সে তীর্থকর্ষণ ভিন্ন আর অন্য পুথকর কার্য কি আছে? তাঁহার অল্প-রোধে নিশানাথকেও কিছু দিনের নিমিত্ত বিদেশগামী হইতে হইল। জাগিনের বাস্তারাম উপযুক্ত বিদ্বান্ এবং বিশ্বাসী সুবা, তাঁহার হস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাড়ীতে একটী বৃদ্ধা কুটুম্বিনী ছিল, সন্তোষবিত্তের ভার তাহার হস্তে দিয়া গেলেন।

বাস্তারামের এখন কাজ কর্ণে কুচি অসিয়াছে, সুতরাং মাকুলপ্রস্তুত এই ভার তিনি আত্মাধের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই সব বিষয় কার্য বেধ-জেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্টের হিতকর বিবিধ সংকার্য করিতে। সেবারপ্রবৃত্তি বিকসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চরিতার্থেরও বেশ সুযোগ ঘটয়া গেল। এখন আর বাস্তারাম পুস্তকের কীট নহেন, অকৃতব্রতের বত একা একটী ঘরে চূপ করিয়া বসিয়া ভাবেন না, কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় কার্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। কখনো করিগ্রন্থিগের জন্য দাতব্য ভাতারের বটি,

সকলি জৈনবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাই। যেখানে যে কোর মন্দিরটির
স্থাপনা করে, বাহ্যিক ভাষায় পুণ্ড্রক হয়। জৈনের হাতা মতে কল-
সার পরিচার, কলস বিধান, ইন্দ্রবিদ্যালয় চিকিৎসালয় স্থাপন, পাত্র প্রতি
অভ্যাচার নিবারণ, দুঃখান হুর্নতির উচ্ছ্বাস সাধন ইত্যাদি ব্যবহার
সকলটিকে তিনি কোন দিকে মানিয়েন। নিম্নলিখিত এ সকল কার্য
নিম্নের অনুষ্ঠান উৎসাহ দিল, ইহাতে তিনি ব্যাক্যাস করিতেন না, কিন্তু
অবশ্য অবশ্য পশ্চিম করিতেন। অনুষ্ঠান বাহ্যিক নির্ভয়ে সকলের
অবস্থানে এবং নিম্নলিখিত পশ্চিম ও বিদ্যা কলসার কাভাবে এই সব কার্য
সাধার করিতে মানিয়েন। ইহাতে কিছু বিদ্যার জন্য সকল বসনেই
তিনি গিয়া এবং প্রচার লাভ হইলেন।

একদা বর্ষা কালের আরম্ভে আবার মানে জৈনের অত্যন্ত প্রাচুর্য হইল
উত্তীর্ণ হই, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নাই, হৃদয় নৌয়ের প্রভু ভাষণ মতে
লুপ্তি বান বিল সব ফল উল্লীরা উত্তীর্ণে মানিল, তাহারে অধার হাত
বিদ্যা কামিতে আরম্ভ করিয়াছে, মরা ভাষার নৌনুটীয়ালের সাধা দুই-
তেরে, কোরের মসাক্ষণ প্রকৃতিতে বৃত্ত প্রায়, এবং সময় আবার প্রায়ের
মধ্যে উল্লীরা দেখা দিল। মিশর একাকী কোথাও বাইতে ভাল বসে
না। অল্পকাল উল্লীরাতে ডাকিয়া আসিল। অমিত্যর বাসুদেব নিম্নোক্ত
এক জন নৌট ভাষার ভাষার ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে বাহ্যিক
চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। নিম্নেও হেরিন্ডপাথির মত নৌট নৌট
যাকী হুঁতে মানিয়েন। পানীর জলে কণ্ঠ, পশ্চিম প্রকৃতি
সকল বেধানে দেখানে কর্তৃক হুঁতেলেন। কিন্তু এখানে যে নিম্ন উল্লীরা
একিছুতেই তাহার বেশ থাকিল না, অতি দিল পীড়িত মত জন
করিয়া লোক অধিক মানিল। প্রায়ের ভয়ে হুঁতেলেন নিম্না নৌট
যাকী করিল, বিদ্যার নৌ। নির্ভর বিদ্যা বাইলেন পশ্চিম, প্রকৃতি মত
প্রকৃতি বাকিল বিদ্যা, কিন্তু উল্লীরা তাহা মানিল না। তবে মনে সাধা-
কার মত, যে প্রকৃতি মত, যে প্রকৃতি মত, ইন্দ্র মত, যে প্রকৃতি
মত, মত, মত প্রকৃতি মত, মত, মত প্রকৃতি মত। মত প্রকৃতি মত, মত
মত, মত প্রকৃতি মত, মত, মত প্রকৃতি মত, মত, মত প্রকৃতি মত।

হাইল ! পলাইতে পলাইতে অনেক দূর হোটেটোয়, কলাইটোয় গিয়া
 ফেলিল । কেহ চিন্তিয়া গাছের অঙ্গারের দ্বারা ঘরির হইল । দুই দুই
 ময় মারী বালক বালিকা হত্যাশে গ্রাম হারাইল । কোন গৃহে দুই জনের
 মধ্যে খুন্সি হইতে আর, কোথাও দুই মারী মিরকহাৎক হইয়া মরিয়া
 আছে । গ্রামের ভরে লোকের দল হইয়াছে । পেট ভরিয়া কান কাট হইয়া
 গিয়া কাইনে কলাইটোয় গিয়া, কামার কামপেটা কাইনে বা বাসিন্দাদের
 লোক কাই । কেবল কাঁচকলা কামা, বোটা বোটা কুলাইটে গুটি যে কাম
 বস কাইনে পেট কাঁচিয়া বা কাই লোকে কাইতে পারিল । কিন্তু কলা
 টোয় যোগ বেশ বাসের লোক, কোন্ কিক বিয়া করে উপরে কখন কখন করে
 কেহ ভীরা বুঝিতে পারে না ; জন কাতালের দ্বারা চিয়া তাহার পরিচয় ।
 কেহ উর্জহী হইয়া, গায়ে ছাত বিয়া, গ্রামপথে ছত চকাইয়া কীভাবে হরি
 নার কাইতেছিল, সেই সময় তাহার পেট কোঁ কোঁ কল কল করিয়া জাফিয়া
 উঠিল । বাহিরে কটবারও আর তার ময় হইল না । কেহ বাটে
 খব ফেলিয়া বাড়ী আসিয়া নিশপাতা কাইয়া হাত মরিয়াছে, অমনি তাহার
 এক হাত ভেদ হইল । জীবিতেরা হরিবাল মরিয়া দুকের মতকার করিয়া
 আছে, আবার তাহারাই মৃত হয় । দিবসে ঘরে দুটিয়া পোয়ান দুইয়ের
 দুই মইয়া হেঁচা হিঁচি করিতে পারিল । তাহারের দোরও নাই । পোক
 নাই, কলাইটোয় রোগী কাইয়া তাহার। ছে পুট হয় । বাসিন্দা জীব কল লত
 পকোপ মরবাসে কোতনে এত ছত লাগাইতে হইয়া পড়িয়াছে যে-কর্ত্তীবিষ
 রোগীকে মরিয়া টানাটানি করে, দুইত মারবাসে মৃত মনে করিয়া কাইতে
 পার । এমন হইল যে দিনের কোত ময়ের বাহিরে কতরা বার না, কামের
 জীব অকসরে মনে চারিবিষ মেরিয়া ফেলিল । মরিবার লোকই গ্রাম হই
 চিন্তিয়া বা মেরা করিবার কেহ নাই ; কটবারও কেহ নাই । বাসিন্দা মিল
 করে তাহার কলের কল কল শুকাইয়া কল, কামার কীর্ষ মরুত দুকের
 বস কতালকার হইল । দুইয়ের পুটিয়া, মরিয়াবের কীর্ষ মেরে
 মোকাতের কলনে পুঙ্ক দুইয়ের দিকট মর, কাম মরিয়া চিন্তার
 কোলাহলে গ্রামী মেরে কলান কলান কল হইয়া উঠিল । কল লোক
 কাইল, মরিয়াব মরিয়া কল, মরিয়াবের কীর্ষ এক মরুট করিল

কৃতান্তের করালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ বা পাঁচ সাত দিন শয্যাগত হইয়া জরাতিসারে ডুগিল ; তাহারা মরিতে চায়, তথাপি মরণ হয় না ।

বাহ্যরাম বড় দূর পারিলেন বিপন্ন লোকদিগের সেবা করিলেন, শেষে আর কুলাইয়া উঠিল না ; ওলাউঠার মহা প্রাবনে গ্রাম ভাসিয়া এবং ডুবিয়া গেল । এ সকল দেখিয়া স্তনিয়া সন্তোষিনী মনে মনে বড় ভীতা হইলেন । বাড়ীর চাকর চাকরাণী আমলা দরোয়ান কতক পুকেই সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা বাহ্যরামকে বাড়ী বন্ধ করিয়া স্থানান্তর চলিয়া যাইবার পরামর্শ দিল । তখনও যে সকল লোক গ্রামে আছে, তাহারা বাহ্যরামের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে ; তিনি যদি প্রস্থান করেন, তাহা হইলে ভয়ে নিরাশায় তাহারা মরিয়া যাইবে । ইহা বুঝিয়াই তিনি তাদৃশ মহা-মারীর মধ্যেও পড়িয়া রহিয়াছেন । যদি মৃত্যুও হয় তথাপি তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা । হুই এক জন কি চাকর রহিল আর সব না বলিয়া চলিয়া গেল ।

প্রকৃতিদেবী বেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কুন্তক সাধনে বসিয়াছেন । ক্রমে গ্রীষ্ম বনৌজ্বল হইয়া বায়ু চলাচলের পথ একবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল । অলপ ব্যাঘাতি, ডাঙ্কার বিহে সাপ ; দিবসে মাছির ভ্যান ভ্যানানি, চড়ুই পাখীর তীব্র চীৎকার রব, রাত্রে মশা ছারপোকাকার দৌরাস্রা ; আলো দেখিলে গাঁদা পোকা আর শুলা উড়িয়া গায়ে পড়ে । ঘামাচিতে সর্বদা খচিত বাহিরে বসিলে মশায় ধায়, মশারির ভিতর শয়ন করিলে সর্বশরীরে খামে ভিজিয়া উঠে । ক্ষুধা নিজা বন্ধ । কেহ হাদে, কেহ পণে, কেহ মাঠে ছুটা ছুটি আরস্ত করিল । যিনি চড়কের ঢাকে কাটি পড়িতে না পড়িতে চাকর-খানি ওটলি পাকাইয়া বগলে রাখেন, কটির বসন নামাইয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া হাতে পাখা বরিয়া লং সাছেন, তিনি প্রমিটিড্ অর্থাৎ আদিমাব-স্থায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । গ্রীষ্মের জ্বালায় প্রাণ আর বাঁচেন না, বিন রাত্রি সমান, তাপমান যত্রে এক শত দশ ডিগ্রীর উপর উদ্ভাপ উঠিয়াছে । বাতাস যেন অগ্নির সমুদ্রবিশেষ । কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল শীত শীত বমের বাড়ী বাইতে ইচ্ছা করে । হুঃসহ গ্রীষ্মতাপে পাগলের মত হইয়া

লোকেরা গায়ে কাপড় ফেলিয়া দিতে লাগিল । দুই শরীরধারী ব্যক্তির ভাঁহের মত পেটে বৃক কাঁদা মাথিয়া তলে ডুবিয়া বসিয়া থাকে, কেহ সরবৎ ধায়, কেহ ভিজা কাপড় গায়ে জড়ায়, কেহ বরফ খুঁজিয়া বেড়ায়, বহুজ্ঞের যোগীন্দের আরো কষ্ট ; গায়ে জালায় তাহার ঠাণ্ডা মেঝের উপর কুশ্মণ্ডের ন্যায় গড়াগড়ি দেয় । অলপানে তৃষ্ণা ভাঙ্গে না, ভোজনে পেট ভরে না, নিদ্রায় দেহের আবল্য যায় না ; বাপ রে, মা রে, শাপ গেল রে, সকলের মুখে কেবল এই শব্দ । মহা উত্তাপে মাথার খুলির ঘোড়ের মুখ দিয়া ঘন মস্তিষ্ক গলিয়া গলিয়া বাহির হইতে লাগিল । লিখিতে কিম্বা পড়িতে বসিলে দরদরিত ধারে গায়ে ঘাম ছুটে, বিছানায় শুইলে প্রতি লোমকূপে পয়ঃপ্রণালী বহিতে থাকে ।

এইরূপে লোক সকল অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক দিন মধ্যাহ্ন কালে আকাশে পৃথক বর্ণ বস্ত্রাকার মেঘ সঞ্চিত হইল, ক্রমে তাহা অনন্ত গগন ছাইয়া ফেলিল, বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশটা ধানিক দূর নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে । কিন্তু গাছের পাতাটা নড়িতেছে না, নিস্তব্ধ আকাশ রাগভরে গম্ভীর হইয়া আছে, তাব গতি দেখিলে ভয়ে শ্রোণ উড়িয়া যায় ।

এত দিন বাত্স্যারামের বাড়ীতে ওলাউঠা প্রবেশ করে নাই, কেবল বৃদ্ধা কুটুম্বিনীকে দয়া করিয়া সে শমনভবনে লইয়া গিয়াছিল । আজ আহাের পর সন্ধ্যাবিনী এক বার বোমি করিলেন, দুই বার দান্ত হইল । দুই দান্তেই তাঁহার নাড়ী বসিয়া গেল, হাতে পায়ে খাল ধরিল, অলপিপাসায় গাত্রদ্বায়ে শ্রোণ ফাটিতে লাগিল । বাত্স্যারামের প্রকৃতির এমনি গঠন, সহজে তাঁহার চিত্তে বড় একটা উদ্বেগ উত্তেজনা হয় না, কোন প্রকার ভাবান্তিশয্যে যে তাঁহাকে চকল ব্যাকুল করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই । শান্ত গম্ভীর ভাবে তিনি সন্ধ্যাবিনীর চিকিৎসা উদ্ভাষা করিতে লাগিলেন । পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল ।

এ দিকে বেলা বড় শেষ হইয়া আসিল, মেঘ তত ঘনতর হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, এবং তৎসঙ্গে বড় উঠিল । ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে মেঘের আঁধার মিশিয়া ভূতল নভমণ্ডল অন্তরীক সব

একাকার হইয়া গেল। অনন্তর প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে ঝুটি আরম্ভ হইল। একে প্রাণে লোক কমিয়া গিয়াছে, বাড়ীর লোক জনও প্রায় সকলে পলায়ন করিয়াছে, রাত্রি হইয়া আসিল, বাহ্যারাম একাকী রোগশয্যায় বসিয়া রোগীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাত্রির বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌ বৌ গোঁ গোঁ শব্দে ঝড়, আর তাহার সঙ্গে কামাকম্‌ ঝুটি; পুকুরে ডেকগণ, বাগানে পতঙ্গকুল মহাগীত আরম্ভ করিয়াছে, চতুর্দিক হইতে শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দ উঠিতেছে। মহাবীর প্রচঞ্চল রণমন্ডে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে ঘেন রসাতলে দিতে বসিয়াছেন। একাণ্ড একাণ্ড প্রাচীন মহীতুহ সকলকে কেশে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিতেছেন, আবার পদধলিত ক্ষুদ্র তৃণপত্র সকলকে ভিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উচ্চ আকাশে তুলিয়া দিতেছেন। যেখানে ঝুটি প্রবেশের পথ ছিল না, সেখানে তিনি অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। ঝড় ঝুটি উভয়ে মিলিয়া শেষ ভূপ্রসঙ্গে গলা ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিল, তাহাদের পদাঘাতে প্রাণিগণ আকুল হইল। পবন, তোমার যে কত লীলা তাহা কে বুঝিবে? বাহাকে কোলে নাচাও, ঘুম পাড়াও, কত আদর বহু কর, তাহারই আবার তুমি বাড় মুচড়াইয়া রক্ত চুষিয়া খাও। তোমাকে চেনা ভার। যেমন তুমি শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক, তেমনি আবার রাক্ষস দানবের ন্যায় নিষ্ঠুর নির্দয় অত্যাচারী, তোমাকে বিশ্বাস নাই।

বাড়ীতে একটা বুড় ঝি ছিল, বাহ্যারাম তাহাকে রোগীর কাছে বসিতে বলিলেন, সে বলিল, “বাবা, আমার গারে একটা লেপ চাপা দেও, আমি শীতে মরি। একটা হিন্দুস্থানী বেহারা ছিল, সে ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া আনিতে গেল আর কিরিল না। বাহ্যারাম মুহূর্ত্ত প্রায় রোগীকে লইয়া সেই জনশূন্য বৃহৎ পুরীর মধ্যে একাকী আগিতেছেন, নিকটে একটা হারিকেন লগ্ঠন জলিতেছে। অন্ধকারের আর পাগাপার নাই; গভীর অন্ধকারের উপর ঘন অন্ধকার, স্তরে স্তরে ধরে ধরে অন্ধকার, পাড় নিবিড় অনন্ত অন্ধকারে দশ দিক্‌ পরিপূর্ণ। ঝড়ের বেগের উপর ঝড়ের বেগ, প্রবল ঝুটি-ধারার উপর অজস্র ঝুটিধারা দলে দলে পালে পালে ছুটিতেছে। জনমানব নিকটে নাই, সন্তোষিনীর বাক্য বন্ধ, সর্বশরীর হিমাক্ত, মধ্যে মধ্যে কেবল কাতর নয়নে এক এক বার তিনি বাহ্যারামের চিন্তাতারাকান্ত মুখের পানে

চাহিতেছেন। বাঁহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, অস্তিত্ব ভালে মৃত্যুশয্যাপাশে সেই জীবনসখা উপবিষ্ট এই কেবল মনের সান্ধুনা। তখন তাঁহার কেবল প্রেমামুরাগ টুকুট আছে, আর কিছু নাই। সেই প্রেম জ্যোতি-
হীন ক্ষণদৃষ্টির ভিতর দিয়া মেঘাবৃত অন্তর্মিত রবিকিরণের ন্যায় বাহির
হইতেছিল। বাহ্যারাম কখনো তাহার ললাটে, কখনো বামহস্তে, কখনো
বক্ষে করতল ন্যস্ত করিয়া হাতু পরীক্ষা করিতেছেন। কখনো তাপমান বস্তু
দ্বারা উত্তাপ বোধিতেছেন, কখন বা চক্ষের ক্লেব মুচাইয়া মস্তকের বিক্ষিপ্ত
কেশজঙ্ঘ ললাটে হইতে সরাইয়া দিতেছেন। সন্তোষিনীর কথা কহিবার
শক্তি নাই, মর্শ্বের কথা মর্শ্বে মিলাইয়া বাইতেছে, কিন্তু জ্বরের অবাক্ত
ভালবাসা জ্বরসাধারে উপলিয়া উঠিতেছে। তিনি মনে মনে ভাবি-
তেছেন,—“পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলের সেবাই মিষ্ট, কিন্তু প্রেম-
স্বপ্নের সেবা আরো মিষ্ট। আহা আমার তাপিত অঙ্গে প্রিয়তমের প্রেম-
মাধা শীতল হস্তের সংস্পর্শ কি সন্তাপনামক। এ অবস্থায় আমার মৃত্যু-
তেও সুখ। এমন সুখের মরণ কি আমার ভাগ্যে ঘটবে?” এইরূপ
ভাবিয়া সন্তোষিনী যেন আদরে গলিয়া শান্তির সাগরে ধীরে ধীরে ডুবিয়া
যাইতেছিলেন। বাহ্য লক্ষণ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি মহা-
নিদ্রায় মগ্ন হইতেছেন। বাহ্যারাম দোষলেন, মানুষ মরে, কিন্তু প্রেম মরে
না। মৃত্যুর অন্ধকারমধ্যে যেন প্রেমের বাতি তখনও জ্বলিতেছিল। তিনি
বতটুকু স্নেহ ভালবাসা দিতে পারিতেন তৎসমুদায় এই অনাথিনী শরণা-
গতার সেবার অর্পণ করিয়াছেন।

রজনী ক্রমে গভীরা এবং ভয়ঙ্করী হইল, বাহ্যারাম ঘোর অশানমধ্যে
প্রতিক্রমে প্রাণহরণ মৃত্যুর বিকট মূর্তি দোষতে লাগিলেন। ঘন অন্ধকারের
ভীষণ গাভার্য্যমধ্যে অনন্তের আভাস অনুধ্যান করতে করিতে জাগ্রত
সুষুপ্তির অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত হইয়া কখনো দোষিতেছেন, শব্দেহ সকল
হাত পা ছড়াইয়া মুখ ব্যাধান করিয়া স্বপ্নপাকারে লাড়িয়া আছে, তাহার উপর
চল শকুন হাড়গিলা শেরাল কুকুরের দল খেউ খেউ শব্দ করিতেছে।
কখনো দোষিতেছেন, কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ককালময় দীর্ঘ একটা মনুষ্যদেহ দাঁত
বাঁকির করিয়া লম্বা লম্বা পা কোলিয়া নিকটে আসিতেছে আর সর হই

খানি হাত বাড়াইয়া আহাৰ্য্য চাহিতেছে। কখনো ঘেঁষিতেছেন, চতুর্দিকে ঘোরান্ধকার তাহার মধ্যে কেবল একখানি হাড়ের শাখা। মুখ হাড়ের জিহ্বা বাহির করিয়া হাসিতেছে। মৃতদেহের বিকট ছায়া সকল বিবিধ বিভৎসাকার ধরিয়া তাঁহার কল্পনা ও নিদ্রাতারের শ্রান্ত ক্লান্ত চক্ষের সম্মুখে দেখা দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বাতাসের ঝাপটে অর্গলবিহীন দরজা আনালাব কপাট গুল গৃহভিত্তির সঙ্গে মাধা খুঁড়িতেছে। আলিসা ও কার্ণিস হঠাৎ ছুড়ুম ছাড়ুম শব্দে ইট টালি উড়িয়া পড়িতেছে। মহা ধুন্ধুমারী ব্যাপার! মেন বাতাস বুটী তিনে এক একে তিন। এটাকে বলে সাইক্লোন। ইহা পূর্বে এ দেশে ছিল না, ইংরাজি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছে।

এই ভয় এবং বিপদের পেয়ে দুইটা আত্মাকে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া যেন এক করিয়া ফেলিল। সে অনন্ত দুঃখসমুদ্রে আপনার বলিবার আর কেহ নাই, অনন্যগতি দুইটা জীব ভয়ে দুঃখে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। বাহ্যারামের সেবাস্ত উদ্ঘাপনের ইহা যেন একটি মহা বজ্রস্বরূপ। অনন্যমহার হইয়া ঘোর অন্ধকার বড় বুটীর মধ্যে রাত্রি আগিয়া তিনি রোগীর পরিচর্যা করিলেন। এই উপলক্ষে সন্তোষিনীর প্রতি বাহ্যারামের আনুগত্য মমতা স্নেহ প্রীতিকে রাতারাতি সবলে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল। সন্তোষিনী তাঁহাকে ইতঃপূর্বে প্রচুর সেবাশ্রমে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বাহ্যারাম তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিতেন না, তজ্জন্য মনে একটা বড়ই ক্ষোভ ছিল। ভালবাসার পাত্রিকে সেবা করিতে না পারিলে ক্ষুদ্রে অতিশয় বস্ত্রণা উপস্থিত হয়, কৃতজ্ঞতাভারে প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠে, এই সুযোগে বাহ্যারাম পূর্বের সমস্ত ক্ষোভ নিবৃত্ত করিয়া লইলেন। সমস্ত জীবন চালিয়া দিয়া সেবা পরিচর্যা করিলেন। এতদ্বারা যত দূর ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা হইবার তাহার আর অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর তাঁহার সেই অকাতর পরিশ্রম যত্নে সন্তোষিনী সে বাত্মা রক্ষা পাইলেন। তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন কেবল তাহা নহে, প্রেমাস্পদকে আশ্রয় করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

কলির হিন্দুধর্ম ।

আধুনিক সভ্যতার কলঙ্করূপ যে সকল সমুদ্রচলিত পুন্যকীর্তি নগর উপ-
নগরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহার সমস্তগুলিরই কিছু কিছু নমুনা বঙ্গপুত্র
গ্রামে দেখা যাইত। গ্রামটি নিতান্ত সামান্য স্থান নয়, একটা উপনগর
বিশেষ। সেই মহা ঝড় ঝুটির দিনে স্থানীয় হরিসভার সাংসদগণের উৎসব
ছিল। অপরাহ্ন সময়ে সভা বসিয়াছে, চারিদিকে পতাকা পত্ন পুষ্পমালা
শোভা পাঠেছে। নিমন্ত্রিত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য এবং গ্রামস্থ ভক্তবিশিষ্ট
ব্যক্তির বসিয়া শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। পাঠ সমাপনান্তে পণ্ডিত
গজরাজ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ভিন্ন ধর্মাব-
লম্বীদিগকে অত্যন্ত ভাষায় নিন্দা উপহাস বিক্রম করিয়া বক্তা প্রোত-
মণ্ডলীকে জাগাইয়া তুলিলেন। যে সকল নবীন হিন্দু যুবা ভাগবত ব্যাখ্যার
সময় ইতস্ততঃ চঞ্চল ভাবে চাহিতেছিল, এবং যে সকল বিজ্ঞ প্রাচীনগণ
সংসারচিন্তার আবেশে নিত্রার ভারে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন
তাঁহারা সকলে এখন উৎকৃষ্ট নেত্রে সহাস্য আননে বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে
লাগিলেন। করতালি এবং হাস্যধ্বনিতে সভা মহা গরম হইয়া উঠিয়াছে,
বক্তা নানা রঙ্গ ভঙ্গীতে বিরোধীদিগকে গালি দিতেছেন, ব্যঙ্গ করিতে-
ছেন, এমন সময় প্রবল বেগে মহা ঝড় উঠিল, পথের ধূলায় আকাশ ছাইল,
কাঁভাসের প্রচণ্ড তেজে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আঁকুফলা উজ্জ্বলমান হইল।
আহা তৎকালে টিকীগণের কি শোভাই হইয়াছিল! হে টিকীদেব, এ যৌব-
কলিমুগে তোমার যে কি মাহাত্ম্য তাহা আর বলিতে পারি না। রেচ্ছডক্য
হিন্দু অবাধ্য গো শূকর কুক্কট মাংস তুমিই কেবল জীর্ণ করিতে সক্ষম।
তুমি বাহার শিরে স্থান পাইয়াছ কার সাধ্য তাহার হিন্দুত্ব বিনষ্ট করে ?
এই গুণেইতো ইংরাজিপড়া বাবুরা তোমাকে এত ভাল বাসেন। বক্ষহুত্র,

তুমিই কি কম ! আজ কাল আতি কুলকে তুমিইত গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখি-
য়াছ ! তোমরা জীবন আগ্রত ছইটী সহোদর ভাই, তোমাদিগকে নমস্কার ।
অতঃপর সেই বায়বেগে পুঁধির পাতাগুলি ঘুড়ি হইয়া উড়িতে লাগিল,
নিশান পত্র পুষ্পের সহিত পাল ছিঁড়িয়া পড়িল, বক্তার মুখে চক্ষু, শ্রোতার
কানের মধ্যে ধূলা ঢুকিল, অবশেষে প্রাণের ভয়ে সকলে গৃহে পলায়ন
করিলেন । এই ঝড়ে সভার ঘর ধানি একবারে ভূতলশায়ী হয় ।

সভার প্রধান উদ্যোগী পাণ্ডা কুড়ারাম ভট্টাচার্য এবং ঘনশ্যাম বাবু
বাহাদুরকে সভার অভিভাবক করিবার জন্য এক দিন তাঁহার নিকট আসি-
য়াছেন । তিনি এক জন দেশহিতৈষী দয়ালু এবং সুপণ্ডিত সাধু যুবা,
নানা বিধ সংকার্য্য দ্বারা ইতঃপূর্বেই গ্রামের মধ্যে সে কথা প্রচারিত হয় ।
নিশানাথের বহির্কীর্তীতে এক ধানি আটচালা ছিল, তাহাতে একপে সভা
বসিবে, আর বাহাদুর নিজে সভাপতি হইবেন এই তাঁহাদের প্রস্তাব ।
হরিসভার উদ্দেশ্য কি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে পাণ্ডাও বলিলেন, " হিন্দু-
ধর্ম্মকে আমরা পুনর্জীবিত এবং রক্ষা করিতে চাই । একদিকে খৃষ্টীয়ান
পাদরী সাহেবেরা, অপরদিকে ঘরের ঢেঁকি ত্রাসেরা আমাদের আতি কুল
নষ্ট করিয়া কেলিতেছে, বিধবাদিগকে ধরিয়া বিবাহ দিতেছে, হিন্দুর ছেলেরা
আর হিন্দুয়ানী মানে না, আর্ধ্যধর্ম্ম লোপ হইল, পিতা পিতামহের
নাম ডুবিল, শাস্ত্র বিধি পূজা পার্কার্ণ ব্রতাদি কেহ পালন করে না, ঘরে
ঘরে স্নেচ্ছাচার, বিলাত হইতে প্রত্যাগত আতিভ্রষ্ট পতিত ব্যক্তিরা জনা-
রাসে গৃহে স্থান পাইতেছে ; এ সকল দেখিয়া আর আমাদের কি চূপ
করিয়া থাকি উচিত ? আপনি আমাদের সমাজের মধ্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান
সাধুচরিত্র ব্যক্তি, আপনাকে সভাপতি হইতেই হইবে ।" অতঃপর
বাহাদুরের সঙ্গে পাণ্ডাওয়ের ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ
হইল ।

বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি উপায়ে আপনারা হিন্দুসমাজ-
দিকে হিন্দুধর্মে স্থির রাখিতে পারিবেন ?

কুড়ারাম বলিলেন, এই হরিসভাই তার এক প্রধান উপায় ।

বাহা । কি প্রকারের লোক সভার আসে ?

কুড়া। প্রাচীন প্রাচীনরাও আসেই, তাহা হাড়া অর্ধ বয়সী ইংরাজি-শিক্ষিত নবীন হিন্দু অনেক আসেন। মধ্যে মধ্যে উৎসবদি উপলক্ষে যুবকদিগকেও আনা যায়। উক্ত বয়স্ক ছাত্রদেরও কথাই নাই, তাহারা ই আমাদের ভবিষ্যতের বিশেষ আশা।

বাগ্না। তাহারা কি ধর্মশিক্ষা করিতে আসে ?

কুড়া। প্রথম প্রথম অবশ্য সে আশা করা যায় না, আহাৰ পান পান যাকনা বক্তার আমোদের অমুরোধে এখন আসছে ; আস্তে আস্তেই ভাল হয়ে যাবে।

বাগ্না। যদি আহাৰ পান আমোদের লোভে আসে; তবে তাহারা সেই লোভের জন্য হোটেলের ভাড়া বাইতে পারে ?

কুড়া। তাত পারেই এবং গিয়াও থাকে, তবু আমাদের যথা লাভ।

বাগ্না। নিয়মিত বাহারা সভ্য তাঁহারা কি যথার্থ হিন্দুধর্ম অনুসারে চলেন ?

কুড়া। সব কি আর পেরে ওঠেন, বিশেষতঃ অনেক ব্যক্তিকে আফিসের চাকরী করিতে হয়, তবে অবশ্য চেষ্টা করেন।

বাগ্না। তাঁহারা কি স্ট্রেকের বাধ্য ধান না ? মধ্যপান করেন না ?

কুড়া। তা তা অবশ্য অবশ্য বলিতে পারেন। তবে কথাটা কি তা জানেন, কথাটা হচ্ছে যে,—যে কথা বল্‌ছিলাম, অর্থাৎ বেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে চলিতে হয় কি না। সোমরস পান, আর বন্যবরাহ কুকুট মাংস ভোজন এ বিষয়ে বহিরাগত ব্যবস্থা দিগে গেলেন।

বাগ্না। আমি মশায় অত ফের ঘোর বুদ্ধিতে পারি না। যিনি যে ধর্ম-মত বিশ্বাস এবং প্রচার করিতে চান উক্তসমূহের তাঁহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কথার কোন ফল হইবে না। ইহা আমার ক্রম বিশ্বাস।

কুড়া। সেত ঠিক কথাই বটে। তবে কি জানেন, আপাততঃ দেশের ছেলেগুল স্বধর্ম ছেড়ে না যায়, কোন রকমে তাহাদিগকে আটকে বৈধে রাখা। এই আর কি। আপনি তো সকলই বোঝেন। কালমাহাত্ম্যটা মানতেই হয়।

বাগ্না। আটকে রাখবেন কি দিগে ?

কুড়া। কেন, হরিসভার প্রতি সপ্তাহে ভাগবত পাঠ হয়, বড় বড় বিজ্ঞ

অনেরা বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, যে আমাদের প্রাচীন আচার বিধির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে। তদাচরণে 'দেহে বিদ্যাং সকারিত হইলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার সঙ্গে রোচক পুষ্ক কুস্তক প্রাণায়াম যোগ সমাধি আপনা আপনি মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘনশ্যাম বাবু ইংরাজশিক্ষিত নবীন হিন্দু, তিনি বলিলেন, "আমরা হিন্দু-শাস্ত্র শিখাইবার জন্য একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছি। সেখানে বালক কাল হইতে হিন্দুসন্তানেরা ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবে এবং ইংরাজি বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া স্নাতক হইবে।

বাহা। ইংরাজির সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা মিলিবে কিরূপে ?

ঘন। তা মিলিয়ে নেওয়া যাবে। আজ কাল শিক্ষিত ভদ্র হুসভা অনেক হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন। অবশ্য একটু পরিবর্তিত সংশোধিত আকারে এ সব হবে।

বাহা। তা হইলেইত আপনার শাস্ত্র উল্টে গেল। সে কথা বাক্য-বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন কিরূপে ?

কুড়া। বিশ্বাস নাই বা রইল, কাজতো হবে ? ক্রিয়া কলাপ ওলতো বজায় থাকবে? বিশ্বাস ফিখাস এ যুগে কারই বা আছে, বাইরের ঠাট মাত্র সকলে বডায় রাখে।

বাহা। কাজই বা কৈ কে করে ? লুকিয়ে সব রকম চলিবে, অথচ শাস্ত্র এবং কর্মকাণ্ড লইয়া বাহিরে আড়ম্বর, ইহাত বহু দিন থাকিতে পারে না, এ যে বিজ্ঞানবিরোধী, স্বভাববিরুদ্ধ কার্য।

ঘন। সে কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু উপায় কি ? সেই জন্যইত আপনাকে বলিতেছি, আপনি এসে সব ঠিক করে দিন।

বাহা। আমাকে ঠিক করিতে গেলে হরিসভাটী সর্ব্বাগ্রে উঠাইয়া দিতে হইবে। ইহার পরিবর্তে দাঁতব্যালয় বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করুন অনেক উপকার হবে।

কুড়া। ও ! বটে বুঝিছি, বুঝিছি। তুমি সঙ্কটচরণের ফাঁদে পড়েছ। মুসলমানের কাছে হিন্দুর কথা বলা বুঝা। ভায়া হে ! আর দেখছ কি,

একেই বলে ঘরের টেকি কুমোর। তোমার একটুকি চমুলজা নাই ? আমরা তোমার বাড়ীতে এলাম, আর তুমি আমাদিগকে অপমান করলে ?

বাহা ! আপনারা কুপিত হইতেছেন কেন ? বিশ্বাসবিহীন ধর্মকর্ম নিষ্ফল এবং অস্বাভাবী সেটা কি মানেন না ?

জনশ্যাম বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিকারী কৃতবিদ্যা ব্যক্তি, তিনি নবীন হিন্দু হইয়া এক্ষণে মাথায় টিকি রাখিয়াছেন, হাতে মাহুলা ও ডাঙ্গা পরিয়াছেন, রোষকষায়িত লোচনে বাস্তারামের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইংরাজের উচ্ছিষ্টভোজী পন্নব্রাহ্মী বিদ্বান্। আমাদের শাস্ত্রে যে কি আছে তাহাত জানলে না, পড়লে না, দেখলে না, অথচ পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্ হয়ে বসে আছ !

কুড়া। ওহে ভায়া, কেন আর বুলা বাক্যব্যয় ? বিবাহে পণ লওয়া এখনও মতে পাপ, তখনও উনি একবারে অধঃপাতে গেছেন। তুমি নিশানাথ খুড়র ভিটের বাস্তবুযু হয়ে বসে আছ। তিনি আসুন, তার পর এ সব কথা হবে !

বাহা ! মহাশয়, অনর্থক কেন ক্রোধ করেন, আমি আপনাদিগকে অপমানও কিছু করি নাই। যাহা ঠিক তাই বলিতেছি, ক্রোধ সংবরণ করুন।

জন। কেন ক্রোধ সংবরণ করিবে ? তোমা হতে আমাদের কি উপকারটা হল বল দেখি ? তুমি হিন্দুর ঘরের পাণ্ডা, ঘাঁড়ের গোবর।

বা। মশাই ঘাই বলুন, পেসাদারি কি দোকানদারি ধর্ম আমার ভাল লাগে না। এ আর ত বারইয়ারি পূজা নয় ?

কুড়া। কি দুরাশ্রম ! এত বড় আফকার কথা ? তুই তো পুরুষেপো খীষ্টান, তোর মামাও নাস্তিক পাষণ্ড। কোনো দিন দেখলাম না যে বাড়ীর মেয়েরা একটা ব্রত করলে, কি দশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে। তোর ঘরে হতেই তো আমাদের সোণার আর্ঘ্যধর্ম উচ্ছন্ন গেল। তোর ঘর দেখলেও পাপ হয়। যদি হিন্দুর ধর্মশাসন সামাজিক আচার না মানিস্, তবে গলায় পৈতা কেন ? আমাদের সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে মিশেই বা

থাকা কেন ?” পরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, “কপট পায়ণ ব্যাটায়া যুকে বসে দাড়ি উপড়াবেন !” পরে কথকাল নীরব থাকিয়া “হায় ! হায় ! এমন উচ্চ বংশে জন্মে তোরা চণ্ডালের অধম হলি ! আহা ! আর্ধ্যসজ্ঞানধিগের গতি কি হবে ! এই অন্যাই কি তাঁরা দেহ পাত করে সর্পস্র জলাঞ্জলি দিয়ে শাস্ত্র বিধি রচনা করেছিলেন !”

অনন্তর কুড়ারাম এবং যনশ্যাম উভয়ে গৈড়ক ধর্ষের বিলোপ, দেশীয় সর্গাচারের উচ্ছ্বেদের কথা কহিয়া বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে নিরীহ বাহ্যারামকে গালি পাড়িতে লাগিলেন ।

বাহ্যারাম না রাম, না গদ্বা, কোন কথারই উত্তর করিলেন না । পরে অতি বিনম্র ভাবে মুহু স্বরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাদের এই যে ক্রোধ অভিমান বিলাপ ক্রন্দন এবং পক্ষ্য বচন ইহা আমার নিকট শূন্য ষাও ধাতব পাত্রের শব্দের মত বোধ হইল, কিছুই ইহার সারস্ব বা ভাষ্য অনুভব করিতে পারিলাম না । ঠিক যেন আপনারা দুই জনে অভিনয় করিলেন ।”

পাণ্ডিত্য তখন হাসিয়া কেলিলেন এবং বাহ্যারাম যে এক মুচতুর সারবান লোক তাহা বুঝিতে পারিলেন । তখন যনশ্যামের দ্বিবি জ্ঞানের উদয় হইল । তিনি বলিলেন, “ভাই, এ সংসাররঙ্গালে চলিতে অভিনয় । আশ্চর্য্য এই যে, অভিনয় জানিয়াও তাহাকে সত্য মনে করি । কেহ অতি গম্ভীর ভাবে মহা তর্জ্জন গর্জ্জনের সাহিত উপদেশ দিতেছে, কেহ অন্যের দোষ দোষিয়া নিন্দা করিতেছে, কেহ বা দেশের দুর্গাতর কথা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে গদ্‌গদ্‌ হইয়া কাঁদতেছে, কেহ বা স্বজাতির দুঃখের কাহিনী বলিয়া বক্তৃতার ভেগে গগন কাঁপাইতেছে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে তাহার ভিতর পনর আনা উনিশ গুণ অসত্য কপটতা অবাস্তবিকতা মকারি হাস্যগিঞ্জম্ । কথায় যে বা বলে কাজে তার বিপরীত আচরণ করে । তা না হইলে সংসার চলে কি ? এ সব কালের দোষ, মানুষের কোন দোষ নাই ।” শেষ বাহ্যারামকে ভজাইতে না পারিয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, তুমি পাঁচটা টাকা আমাদিগকে ভিক্ষা দাও, সে দিনের ঝড়ে জলে যেজাতিটা বড় ডাংশ হয়ে গেছে, আমরা সকল সভ্য

মিলিয়া আজ লুচি পাটা খাব। আমাদের হরি বড় পাটা ভালবাসেন।
পরিশেষে দশটা টাকা লইয়া তাঁহার হরিসত্য পূরন করিলেন।

বাহারাম ঘনখামের শেষ কর্তী কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে হাতেই
পাইলেন। পৃথিবীর সাম্প্রদায়িক বর্ণাভেদের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাভাবিক
আর মকারি আনন্দের লতা নষ্টই বুঝিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপে গুণে মাথামাথি ।

সন্ন্যাসী নিশানাথের তীর্থগমন, সন্তোষিনীর সাংঘাতিক পীড়া এবং
বাহারাম কর্তৃক তাহার সেবা, মহামারী ও বড় তুফানে পড়িয়া উভয়ের
বিপদগ্রস্ত হওয়া, ইত্যাদি ঘটনা সকল এই দুই স্তম্ভকে ক্রমে ক্রমে
প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। প্রেম বড় চতুর। এখন আর সন্তোষিনী কিছু-
তেই মনে স্থান দিতে পারেন না, যে বাহারাম তাঁহার ভাবের ভাবুক
নহেন। বস্তুতঃ বেরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া ইহঁরা চলিয়া গিয়াছেন
তাহা ভালবাসা ও আনুগত্য বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তই দিন
যাইতে লাগিল, সন্তোষিনীর চক্ষে বাহারাম ততই প্রিয়বর্ধন চিত্রবিনোদন
হইতে লাগিলেন। তাঁহার পছন্দ হইতে মস্তকের কেশ পর্যন্ত, প্রত্যেক
অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে আর বিমোহিত হই-
তেন। আর মনে ভাবিতেন, “আহা! যে ভাল, তার কি সকল ভাল।
হাত দুই ধানি কেমন সুন্দর, সুকোমল, যেন পদ্মের মৃণাল তুল্য। বক্ষ
স্থলটী কেমন প্রশস্ত! নয়ন দুই কেমন শান্তিরসাত্ত্ব, গ্রীবা এবং স্তন্যদ্বয়
কেমন সমুন্নত!” সুবকের দাড়িগোঁকহীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত পরিষ্কার
মুখ ধানি, এবং উজ্জ্বল নির্মল মুখ শরীরটী বহু পূর্বেই তাঁহার লক্ষ্যকে
অধিকার করিয়াছিল। একগুণে গুণের সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে একবারে বৃত্ত
করিয়া ফেলিল। যেমন গুণ তেমনি রূপ। সন্তোষিনী এ সকল বড়ই

ভাবিত, শুভই প্রসূত হইত। সমস্ত জগৎ সসোর তাহার নিকট বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রেম অন্ধ না হইলে তাহার মিষ্টতা থাকে না, কিন্তু উহা অভ্যাসজিতে পরিণত হইলে এই দেহ আবার কত বিপদ। কেন, এত ভালবাসিবার প্রয়োজনটা কি বাহা? আচ্ছা না হয় ভালই বাসিলে, এত মোহ কেন? মানুষ বৈত নয়, অরা সূত্র আছে, অবস্থার প্রোতে পড়িয়া বিচ্ছেদও ঘটতে পারে। হঠাৎই বা সর্কাজমুন্দর গুণবান্ সুবা পুরুষ, কোন বিষয়ে বাড়া বাড়ীটে ভাল নয়। প্রথমে যে যত ভালবাসা দেখায়, শেষে তাহার প্রেম তত ডিক্ক হইয়া উঠে। প্রেমবিকারের লীলা খেলা অনেক আছে। রূপ বৌবনমধ্যে মত্ত নয় নারীর ছদ্ম বড় তরল চকল। তাহার সচরাচর বড় আশ্বপ্রবর্তিত হয়। “অতএব বলি তুমি, ত্যাক হস্ত তমোগুণ, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।”

মহুযাকে ভালবাসিয়া বহি প্রেমের আঁকর ভগবানের প্রীতি না পাওয়া যায়, তবে যে সকলই স্বার্থ হইল। অনন্ত বিনা শান্তি কোথায়? অনন্ত প্রেমখামের স্বামী মুক্ত সর্কার মানবীর প্রেমরূপে কি আবদ্ধ থাকিলে তাহার আশা নিবৃত্ত হয়? কিন্তু অবলা কুলবালা প্রেমমগ্না যুবতীরা তাণা বুদ্ধিতে পারে না। যে উপারে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তাহা অবশ্য আদর এবং ভালবাসার সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু যে উপার উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দিয়া আপনি সমস্ত অধিকার করিয়া বসে সে মায়ী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎপ্রতি অধিক আসক্তি জন্মিলে পরিণামে পরিচাল উপস্থিত হয়। সন্তোষিণী বাহুরামের সাধুগুণে মোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে গুণগ্রাম রূপকে আরো লোভউদ্বীপক করিয়া তুলিয়াছিল। বস্ত্রভঃ গুণ অপেক্ষা রূপের দিকেই প্রথমতঃ লোকের টানটা বেশী হয়; কারণ, জড় জড়কে অন্ধভাবে সহজেই আপনার দিকে টানিয়া লয়; তৎসঙ্গে মন আপনাপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এই অন্য সর্কতাপী তত্ত্বজ্ঞানী বোঙ্গী-হাত জড়ের আকর্ষণ সহজে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভক্তেরা মহাপুরুষদিগের পা ধরিয়া টানাটানি, প্রসাধ লইয়া কাঁড়াকাড়ি করে কেন? বাহ্য অবলম্বন উদ্বীপনের সহায়তা সকলকেই লইতে হয়। আরে জড় তার পরে চেতন। অড়ার্য্য গার হইয়া লোকে চৈতন্যের জ্ঞান লাভ করে।

বৈহিক বিকার না ঘুটিলে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মিষ্টতা কেহ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য শুণের পক্ষপাতী আন্তত্ববর্ধন বোনীরা বহিন্দুবে বাইতে চাহেন না। কারণ, আধ্যাত্মিক মারবজা সন্তোষই তাঁহাদের লক্ষ্য। রূপ চাই কি প্রেম চাই? ইন্দ্রিয়পরিকণ্ঠি, না আধ্যাত্মিক সন্তোষ প্রার্থনীয়? এ প্রকার বিচার করিতে বাহারা অক্ষম তাহারা সহজে বিপাকে পড়ে। রূপের সাহায্যে প্রেমাসক্তি ঘন এবং মিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মরিক প্রেমপিপাসা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না; অধিকন্তু মনুষ্য রূপের মোহে বাহিরে গিয়া পড়ে, ভিতরে বাইতে পারে না। অথচ শুণের সঙ্গে রূপের এমনি নিকট সম্বন্ধ যে একটিতে বৃদ্ধ হইলে অপরটিতে বৃদ্ধ হইতেই হইবে। সুতরাং সন্তোষিনী বাহ্যারামের রূপসাগরে দিন রাত্রি সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের উপর শেষে আর কোন কর্তৃত্ব রহিল না, চুখক বেল শৌহকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এক জন লোক আর এক জনকে বহি ভালবাসিবার ভ্রম পাগলের মত হয়, প্রাণ মন সর্বদ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে চায়, তাহা হইলে সে কি আর বেশী দিন তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে?

সন্তোষিনীর প্রপাচ্ ভালবাসা প্রেমামুরাগ দেখিয়া বাহ্যারামও তাহার দিকে পূর্বাপেক্ষা আরো একটু আগ্রহের হইয়া পড়িলেন। দ্বারা এবং প্রেমমূলক আকর্ষণ হইলেও, তাঁহার অগোচরে কাহাকে কোন সংবাদ না দিয়া স্বভাব আপনার কার্য আপনি আরম্ভ করিল। ক্রিয়বতাবের মূলে স্ত্রী-অবেষণকারিণী এক নৈসর্গিক দুর্জয় শক্তি আছে, যে শক্তির প্রভাবে নরনারী মিলিত হইয়া পূর্ণবীতে পরিবার গঠন করিয়াছে, সেই শক্তি বাহ্যারামের অন্তরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল। ইতঃপূর্বে নানা কার্যের উপলক্ষে অলক্ষিত ভাবে ইহা দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে কিছু স্পষ্টীকৃত হইল। সন্তোষিনী মূর্ত্তিমতী স্ত্রী, হইলেনই বা বাহ্যারাম বিচারনিপুণ জ্ঞানী সুপণ্ডিত? নারীপ্রকৃতির ভিতরে রক্ষাশেখরীর যে মোহিনী মায়শক্তি আছে তাহা কি তিনি একবারে অগ্রাহ করিতে পারেন? এই কারণে নারীপূজাপন্থতি তাঁহার ভাল লাগিত, তাহাতে একটু আনন্দও অনুভব করিতেন। চিন্তাভারে

আজ্ঞার অধ্যয়নশীল নীরস জীবনে হীতিরস সঞ্চারিত হইলে মানুষ বড় সুখী হয়, এবং সেই সুখবোধ তাহাকে অধিকতর সুখ শাস্তি অবেশবে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু বাঙারামের ইহাতে জ্ঞানতঃ কোন মোহ বিকার উপস্থিত হয় নাই; কেন না, তিনি সন্তোষিণীর রূপ অপেক্ষা গুণের প্রতি বাংসল্য ভাবেন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সংযতমনা চিন্তাশীল বীর প্রকৃতির লোকের মনের গতি অদম্যুর্থে বাইতেই ভালবাসে। বিশেষতঃ তিনি নারী স্বভাবকে পবিত্র ভাবে সম্মত করিতে জানিতেন।

এক দিন বাঙারাম স্নেহপরবশ হইয়া সন্তোষিণীর অশাস্তি নিবারণের জন্য শাক্যমুনির নির্দোষপ্রাপ্তি বিষয়ে কথা আরম্ভ করিলেন। জগদ্বাসী নরনারীগণকে প্রজ্জলিত বাসনানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে যে মহাটেরাগের উদয় হয়, এবং সেই বৈরাগ্যবলে পরে তিনি যেভাবে নির্দোষজনিত পরম শাস্তি লাভ করেন, আমুর্ষিক সেই বিষয় তিনি বলিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে এবং নয়নযুগলে যেন শাস্তির স্নেহাংগা কুটিয়া উঠিল। শাক্যের সেই মহানির্দোষের কথা বাঙারাম ভিন্ন ভেদন করিয়া আর কে বর্ণন করিতে পারে? তিনি নির্দোষের আশ্বাসন পাইয়া শাকাচরিত্রকে যেন নিম্ন চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রেমবিকারগ্রস্ত চঞ্চলমতি দগ্ধজন্ম মানবের কর্ণে বাঙারামের বর্ণিত কাহিনী বাস্তবিক শাস্তির প্রস্রবণ স্বরূপ। তিনি শাক্যরস সন্তোষ করিতে করিতে মূহু গন্তীর নিনাদে বীরে বীরে সেই সকল মহাবাক্য সন্তোষিণীকে শুনাইতে লাগিলেন।

যাহাকে ভালবাসা যায়, সে বাহা কিছু করে তাই মিষ্ট লাগে; কেন না, তখন ভালবাসার সমস্ত জীবন মজিয়া অতিশয় সুমিষ্ট হয়। বাঙারামের কর্ণরব, তাঁহার কথা কহিবার প্রণালী এবং তৎকালীন তাঁহার মুখের ও চক্ষের ভাব ভঙ্গী এমনই মনোহর বোধ হইতে লাগিল, যে তাহা শুনিতে শুনিতে যেন এক স্বপ্নসুখময় শাস্তির রাজ্যে গিয়া সন্তোষিণী উপনীত হইলেন। বাঙারামের মুখাবিবন্ধবিগলিত গভীর অর্থযুক্ত নির্দোষত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবশ্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে দিকে মনও গেল না, কেবল নয়ন ভরিয়া তাঁর শাস্তিপূর্ণ মুখ ধ্যানি তিনি দেখিতে লাগিলেন, আর কান ভরিয়া

সেই বীণাবিনিমিত্ত বানী পান করিতে লাগিলেন । বাহ্যারামের মুখখানি তখন বসন্ত পূর্ণিমার অমিয়া মাখা চাঁদ খানির মত শোভা পাইতেছিল । সে শোভা ছাড়িয়া সন্তোষিনীর সুখালোভী হৃদয়চকোর কি নির্ঝঞ্ঝের গভীরতার মধ্যে তখন বাইতে চাহিবে ? না চাহিলেই বাইতে পারিবে ? সম্ভব নহে । সুখ ছাড়িয়া সুখে অড় ছাড়িয়া চৈতন্যে কয় জন লোক বাইতে চায় ? যে ব্যয় সে ঘাউক, রূপমুক্ত নয়ন, প্রেমপিপাসু হৃদয় সহজে সে দিকে বাইতে চাহে না, পারেও না । শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে তাহার গতিরোধ করিয়া ফেলে । শাকোর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া বিচার করিতে না পারিলে কার সাধ্য সে বাজার দিকে এক পদ অগ্রসর হয় ?

অতঃপর কণা শ্রবণ করিতে করিতে সন্তোষিনীর সন্নিহিত অবস্থায় প্রায় হইয়া আসিল, চক্ষু নিম্নাভারে যেন ভাঙিয়া পড়িল, মুক্তামালার ন্যায় ললাটে বিন্দু বিন্দু স্নেহ করিতে লাগিল । রূপের মোহে, কণার মূরে চক্ষু কর্ণ যেন মদীরানোরে বিনোর হইয়া উঠিল । সহসা যেন স্বর্গের সুবাসনাগণ শ্রীতলে অবতীর্ণ হইয়া অলৌকিক স্নেহ সান্তুনা দ্বারা আগ্রহানন্ডাতেই তাঁহাকে “যুম পাড়িয়া” গেলেন । তাহাতে সন্তোষিনীর প্রাণের গ্রন্থিসকল এগাইয়া পড়িল । ক্রমে শাস্তির সুকোমল সুখশস্যের পেমাবেশে অবশাদগ্রস্ত হইয়া তিনি শয়ন করিলেন । নিদ্রাও নহে, চেতনাও নহে, নিদ্রাচৈতন্যে মিলিত এক রমণীয় অবস্থার উপনীত হইয়া স্বপ্নের ন্যায় কি এক অলৌকিক শোভা-ময় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন । তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন দেবভোগ্য আনন্দময় অন্তের রাজ্যে তিনি বাহ্যারামের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহার স্নেহ আদরে একবারে গলিয়া জলবৎ তরল হইয়া গিয়াছেন । সেই জল ক্রমে প্রসারিত হইয়া অসীম সমুদ্রের ন্যায় প্রতীক্ৰমণ হইতে লাগিল । কিন্তু তাহাতে একটীও তরঙ্গ নাই, স্থির প্রশান্ত । অতি সুন্দর সুপদ্মতার সে দৃশ্য । কোথাও আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল উজ্জ্বল দিগন্তব্যাপী অনন্ত সুনীল গগন, নিম্নে প্রশান্তবক্ষ স্থির নীরনিধি ; নীল সুরাশি নীলাঙ্গরের সচিত্র মিশিরা একাকার চটয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বাহ্যারামের শাস্তিরসপ্লবিত্ত মুখমণ্ডল রক্তচক্রনে বিভূষিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ দীপ্তি পাইতেছে, এবং তাহার প্রতিবিম্ব সেই

ভলময়ীর জ্বরসিদ্ধিতে দ্বিতীয় চন্দ্রমণ্ডল রচনা কম্বিতে । উর্দ্ধে চন্দ্র, অধোতে চন্দ্র, উপরে সুনীল গগন, নিম্নে বসনীল মহাসমুদ্র, মধ্যে সুবিসল শান্তিসমীরণ মৃদু মন্দ গহ্বিতে বহিয়া বাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে মনমুগ্ধকর মধুর স্বরে শান্তিরূপিনী বিগাহনগণ শান্তিগীত গান করিতেছেন । কোন উত্তেজনা নাই, বিকার নাই, বিক্ষেপ নাই, আশা অপেক্ষা নাই, অভাব নাই । সেই শান্তিসমুদ্রশায়ী সুখস্পর্শ সমীরণে শান্তির বিন্দু পরিমলরাশি নিরন্তর ভাসিয়া বাইতেছিল । এবং তাহার শান্তিপ্রধ মধুর আত্মাণে চিত্ত মোহিত হইয়া প্রতিফলনে অনন্তের গভীরতার ভিতরে অবতরণ করিতেছিল । মাতৃকোড়স্থ শিশুর ন্যায় সুখে নিদ্রিত থাকিয়া এই অপূর্ণ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান নির্ঝাঁপানন্দ সন্তোষিণী সন্তোষ করিতে লাগিলেন । নিজার ঘোরে দূর হইতে সমাগত সঙ্গীতের স্বর যেমন মধুর বোধ হয়, স্বপ্নের প্রেমালপ যেমন প্রগাঢ় সুমিষ্ট, বাস্তবায়নের উক্তি সকল তাঁহার কর্ণে তেমন বোধ হইতে লাগিল । তখন প্রেমবিকারনিপীড়িত পিপাসাকাতরা সন্তোষিণীর শান্তিহীন জ্বর এইরূপে আরাম পাইয়া মনে করিতেছিল, “আর আমার আয়োজ্য মন্তব্য কাজ নাই । আমি আর লীলালহরীময় প্রেমসমুদ্রে আন্দোলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে চাহি না । এই অবস্থায় অনন্ত যোগনিজার ঘোরে, চিরনির্ঝাঁপের শীতল বক্ষে আমি যেন ঘুমাইয়া থাকি । আমি যেন এই শান্তিদেবীর শীতল ছায়াতলে চিরকাল এই ভাবে বিশ্রামস্থ সন্তোষ করিতে পাই ।” ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই মহা নির্ঝাঁপসাগরে সহসা আবার ভরস্কর তুফান উঠিল, মোহমেষে চারি দিক্ বেরিয়া ফেলিল, মহাবেগে বাসনাবাহুর প্রবাহ ছুটিল, তরঙ্গাভিঘাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, মনোবৃত্তি সকল উন্মাদের ন্যায় ছল্লার করিতে লাগিল, সুখের স্বপ্ন, শান্তিনিজা ভাঙ্গিয়া গেল । তখন নিজোন্নিভের ন্যায় ভয়বিভ্রান্তচিত্তে সেই অবলা বন দিক্ শূন্য দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল । যেন দৈবাহুগ্রহে কি এক বর্ণের সামগ্রী পাইয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে ; যেন অশ্লুত বস্ত্র পাইবার জন্য আবার এ দিক্ ও দিক্ চাহিতেছে ; কি যেন চায়, অথচ পায় না ; মনের ভিতর কত কথা আছে, অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছে না ; যেন

হৃৎকের সুখী হৃৎকের হৃৎকী এক জনকে বুজিয়া বেড়াইতেছে; কথা কয় তাহার সমস্ত বুকা যায় না; চাহিয়া আছে, অথচ যেন কিছু দেখিতেছে না; ঈদৃশ প্রেমোন্মাদিনীর বেশে সন্তোষিনীকে যখন বাহ্যারাম দেখিলেন তখন তাঁহারও হৃৎকরে প্রীতির কম্পন উৎসারিত হইল। তখন তাঁহার সেই অবাৎকল্লিত স্থির হৃৎকল্যা চিরপ্রশান্ত চিত্তেও কিছু কিছু ভাবের তরঙ্গ উঠিল। বাহা কখন হয় নাই তাহা হইল। একটু যেন প্রেম-মাধকতা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। সন্তোষিনীর চাকল্য নিবারণ করিতে গিয়া শেষ নিজের মনকে তিনি কথকিত বিচঞ্চল করিয়া ফেলিলেন। নির্কারণ নির্কারণ হইল, উভয়ের অন্তরে প্রেমের অনল জলিয়া উঠিল। বাহ্যারামের মন এত দিন আর্জ কাঠের মত ছিল, সন্তোষিনীর প্রেমাদি তদ্ব্যবধৌ ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া এত দিন পরে তাহাকে স্বাহমান করিয়া তুলিল। মানুষ যে বিষয়ে প্রাণ মন চালিয়া দেয়, তাহাতে সে কৃতকার্য হয় এটা খুব সত্য কথা।

বাহ্যারামের লক্ষ্যবস্তুর সীমামণ্ডে সন্তোষিনীর প্রেমবন্যার অল একণে কিছু কিছু প্রবেশ করিল। অজ্ঞানতার প্রাচীর শিথিল এবং ভাঙ হইয়া গেল। পরিশেষে বাহ্যারাম দেখিলেন, তিনি এত কণ যে সকল সার তত্ত্বকথা কহিতেছিলেন তাহা প্রোক্তার মনে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত সময়টা সন্তোষিনী একান্ত ভাবে তাঁহারই মূখ্যানে চাহিয়াছিল, একবারও অন্য দিকে নয়ন ফিরাইয়া নাই; সে দৃষ্টিতে উদ্ভাবের লক্ষণ কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, হৃৎকরের নয়নমূগল প্রেমদ্রাগে রঞ্জিত হইয়া তাহার লোহিত বর্ণে নাসা ও গণ্ডস্থলকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। ভিতরে যেন অগ্নি লাগিয়াছে, তাই সেই অগ্নির আভা নয়নের নচ্ছ কাচ এবং গণ্ডস্থলের বেত চর্খাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছে। সর্কভূক হতাশন ছেব যেন নির্কারণের কথা শুনিয়া মহাক্রোধে জলিয়া উঠিয়াছেন, আর দুইটা প্রেমবিহ্বল ভাবরসোন্মত্ত পতঙ্গ তদ্ব্যবধৌ পড়িয়া বন্ধ হইবার জন্য চারি দিকে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

যুগলমিলন ।

প্রেমরাজ্যের ভূমি অতি মন্থন, একবার তাহাতে পদার্পণ করিলে কোথায় গিয়া মানুষ যে পড়িবে তাহা সে জানে না । সন্তোষিণী লজ্জা ভয় সঙ্কেচ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে এই পত্র খানি বাহ্যারামকে লিখিলেন ।

“প্রিয় দাদা,

আমি তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে ভালবাসি । কিন্তু এই মধুর সম্বোধনে সচরাচর যে ভাব প্রকাশিত হয়, তদপেক্ষা অনেক প্রকারের অব্যক্ত মধুর ভাব আমার ইহার ভিতরে আছে । এক কণায় সে সমস্ত ব্যক্ত হয় এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই না । তুমি আমার প্রাণের ভাই, জীবনের বন্ধু, হৃদয়ের সখা, আশ্রয় আশ্রয় । আমি ভূমিদলুপ্তি নিরাশ্রয় লতা, তুমি আমার আশ্রয়পাদপ । তুমি আমার কে তাহা জানি না, এবং কে যেনও তাহাও বলিতে পারি না । আমার সকল অবস্থার সকল তুমি, আমি তোমার দাসী । হৃদয়ের মধ্যে সমুদ্র সমান ভাবরাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না । দিবানিশি আঁধার তরঙ্গে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি । আমি অবলা অনাথা জামহীনা, যাহাতে আমার কল্যাণ হয়, যাহাতে আমি মনে শান্তি পাই তাহা কর । আমি তোমার পদে দেহ মন প্রাণ সর্ব্বই উৎসর্গ করিলাম ।”

পত্র পাঠ করিয়া বাহ্যারাম জনকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন । সন্তোষিণীর হৃদয়সিন্ধুর একটী প্রবল তরঙ্গ তাহার হৃদয়ের উপর যেন সবলে পতিত হইয়া ভাঙিয়া গেল । ঈদৃশ প্রেম তাহার চির অপরিচিত ; কারণ, ইহা মৃগের ভালবাসা নয়, প্রাণ দিয়া প্রাণকে টানিয়া লওয়া ; সুতরাং মনের ভিতর ভারি একটা গোল বাঁধিয়া গেল, চিত্ত মহাবেগে আন্দোলিত হইল । শূণ্য এবং অশূণ্য, তরু প্রলোভন, লজ্জা এবং দয়া, দুর্ভাবনা এবং আকর্ষণে মিশ্রিত

সে ভাব, না বুঝা যায়, না কাহাকে বুঝান যায় । এই অপরিচিত ভাবো-
দগমই সন্তোষিণীর পত্রের স্বার্থ উদ্ভব । যে অবস্থায় ইহারা এখন আসিয়া
পৌঁছিলেন ইহা অব্যক্ত প্রেমরাজ্য, এখানে কোন রূপ ভাষা প্রচলিত নাই ।
এখানে চক্ষু চক্ষের সঙ্গে কথা কয়, মুখের মুখ হাসি হাসির কথা উদ্ভব হয়,
আত্মা আত্মার সঙ্গে নীরবে আলাপ করে, হৃদয়ে হৃদয়ে মাথা মাখি হয় ।
যদি সে প্রেম এক গুণ কথার প্রকাশ পায়, সহস্র গুণ বাহিরে বাধা পাইয়া
মূল প্রভবের দিকে পুনরায় ফিরিয়া আইসে । অবসর সময়ে তাহা আপ-
নার নিকট আপনি বিস্তীর্ণ পূরণ কাহিনী রচনা করিবে । বিধাতার
আশ্চর্য্য লীলা খেলা, দুইটি বিভিন্ন জাতীয় স্বতন্ত্র প্রকৃতির মনুষ্যকে তিনি
প্রেমমহাদ্রাবকে গলাইয়া যেন এক করিয়া ফেলেন ।

পরদিন দিব্যবাসনে সন্তোষিণী একাকিনী নিভৃতে বসিয়া আশাতত্ত্ব মনে
আপনার অসহায় অবস্থা চিন্তা করত বিষর মুখে ভাবিতেছেন, “বুঝি আমার
মনের আশা মনেতেই মিলাইয়া গেল । হায় ! এমন দয়ালু বিজ্ঞ জ্ঞানী
পুরুষ হইয়াও তিনি আমার দুঃখ কেন বুঝিলেন না । তবে কি আমি উপে-
ক্ষিত হইলাম ? বিজ্ঞানের উদ্ভব কি এতই মিষ্ট যে জীবন্ত প্রেমরস ত্যাগ
করিয়া তাহাতে মাহুকের মন ভুগিয়া থাকে ? বুঝিলাম, ইহা আমার অদৃ-
ষ্টেরই ফল । হায় আমার জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিল ! তিনিরাছি
পাষণেও বীজ অঙ্গুরিত হয়, কিন্তু বাহ্যারামের হৃদয় কি পাষণ অপে-
ক্ষাও করিন ?”

সন্তোষিণীর অভিমান করিবার অধিকার ইহা মনো অধিরাছে কি
না তাহা বিচার সাপেক্ষ । তথাপি দুঃখ বিষাদের সহিত অভিমানকে
মিলাইয়া তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন । এই ভাবে নিজীব প্রায়
হইয়া শোক করিতেছেন, এমন সময় সহসা বাহ্যারাম তথায় আসিয়া দেখা
দিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সন্তোষিণীর নয়নে বারিধারা বহিল, তিনি চিত্র
পুঙ্খলিকাৎ নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন । বাহ্যারাম সে মুখের পানে
যেন আর চক্ষু চাহিতে পারেন না, ভরস্বঃকরণে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাই-
লেন । কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় দ্বারা স্নেহে গলিয়া গেল । অলক্ষিত
অবশ ভাবে ভিতরে ভিতরে প্রেমের অনলও জলিয়া উঠিল । যখন এইরূপ

দশা ঘটিল, তখন ইঁঠাং নিমেষের মধ্যে উভয়ের দেহ মনের অতীতের যেন
 ডুড়িতে প্রবাহ ছুটিল। তাহাতে বাহ্যারামের সর্বত্র কাঁপিল, অস্তঃকরণ
 আলোড়িত হইল, শিরা ও নায়ুসগুলো মহাবেগে শোণিত ধারা বহিল,
 জ্বলিও ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল, জলপিপাসায় কণ্ঠ শুকাইল, লজ্জা
 ভয় দুঃখ দয়া মায়া ভালবাসায় মিশিয়া মনের মধ্যে কি একটা মহা কাণ্ড
 কারখানা হইতে লাগিল। আসল কথাটা এই যে এত দিন পরে ইঁঠারা
 পরস্পরের নিকট নিঃশব্দরূপে পরিচিত হইলেন। পরিচয়ের সময়
 উভয়ের জ্বলন্তদীর্ঘ মিলনস্থলে যে ভয়ানক তুফান উঠিয়াছিল তাহা এক
 অতীব আশ্চর্য ব্যাপার। মনের মানুষকে পাইলে জীব বড় কৃতার্থ এবং
 আনন্দিত হয়, তাই এই সমারোহ। মেঘে মেঘে সংবর্ষণ কালে যেমন
 বিজলী চমকে, ভীমনাথে অশনি গর্জনে করে, এবং সেই মহা আন্দোলনে
 আকাশ মেঘিনী কাঁপিতে থাকে, এই মহা প্রেমমিলনে তেমনি একটা
 ঘোরতর বিপ্লব ঘটয়া গেল, জীবনতরীর রসা রসি ছিঁড়িয়া একাকার হইল,
 বানের জলে যেন দুই জনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। নাবিকদ্বয় তুফান
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রতিকূল স্রোতমুখে দৃঢ়মুষ্টিতে হাল
 ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এই ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রমশালী প্রেম মহাবীরের
 সঙ্গে কয় জন বোদ্ধা সংগ্রাম করিতে পারে? তাহার হৃদয় শক্তি এক
 জন্ম হইতে যখন অন্য জন্মে প্রবিষ্ট হয় তখন এইরূপই ঘটে। ইঁঠা
 শক্তির সমতা এবং সমন্বয় সাধন। বাহ্যারাম সন্তোষিনী অনেক কষ্টে প্রথম
 ধাক্কা সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর বেগ কথঞ্চিৎ মন্দী-
 ভূত হইলে ক্ষতগামিনী সেই প্রেমতরঙ্গীর উচ্ছলিত মধুর হিল্লোলে
 ভাসিতে ভাসিতে উভয়ে উভয়ের মাদুর্য্য রস পান করিতে করিতে প্রেম-
 সিদ্ধুর অভিমুখে ধাবিত হন।

মহারসপ্রসূত প্রগল্ভা প্রীতির বড় প্রভূত পরাক্রম; যেমন তাহার
 ধরতর তেজ, তেমনি মিষ্টতা কোমলতা; যেমন বিস্তৃতি, তেমনি গভী-
 রতা; এমনি ভয়ঙ্কর তেজ, যে সেই তেজে পুরুষ স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী পুরুষেতে
 মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব সুন্দর মূর্তি ধারণ করে। পরস্পরের
 আদান প্রদানে পরস্পর বিপুল সম্পদশালী হইয়া উঠে। উভয়ের আত্মার

নির্দিষ্ট বৃত্তি সকল তখন জাগ্রত এবং প্রস্ফুটিত হয়। ইহা একটা নতুন
বিধ বিদ্যালয়, এখানকার শিক্ষাপ্রণালীর গুণে পুরুষ প্রকৃতি মনুষ্যাত্মের
পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই জন্য ভক্তিরসবিহারক বৈকুণ্ঠ সাধুগণ প্রকৃতি
পুরুষের আধ্যাত্মিক মিলনের স্বর্গীয় মহত্ত্ব, অপূর্ণ মাদুর্য্য রস বিবিধ চন্দ্রো-
বন্ধে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অল্পমতি সুলদর্শী বৈকুণ্ঠদল এবং ভাস্কর্য্য
এই সাধনের পক্ষপাতী, কিন্তু সিদ্ধিলাভে ব্যস্ত। উচ্চ নীতির অভাবে
পবিত্র প্রণালীকে তাহার ঘৃণার বিষয় করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষারস্তে
ইহাতে অনেক কষ্ট। কোন শিক্ষাই বা প্রথমে সুখপ্রদ হয়? শিক্ষা,
পরীক্ষা, তাহার পর সুখ শাস্তি।

সন্তোষিণী ও বাস্তারাম প্রেমতত্ত্ব শিক্ষার জন্য এত দিন পরে বিদ্যালয়ে
ভর্তি হইলেন। এক জনের বহু বৎসরের চেষ্টা যত্নে বিদ্যালয়টী প্রতি-
ষ্ঠিত হইল। এখন কত দিন ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে তাহা কে জানে?
সম্মুখে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহা কে বলিতে
পারে? ভালবাসা স্বর্গীয় অমৃত, তাহা পান করিলে জীব অমর হয় এবং
চরমে পরমানন্দ লাভ করে। কিন্তু হায়! এ পৃথিবীতে সে অমিশ্র
নির্ম্মল প্রেম কোথায়? প্রেম, তুমি কোণায়? বিবাহের সাত পাকের
ভিতরে কি? না বহুদূর বসন ভূষণের মধ্যে? অথবা মোহান্ত ইন্দ্রিয়সঙ্ক-
রনরারীর হৃদয়ে? কোণায় তোমার সন্ধান পাইব? অবশ্য তুমি অসার
লৌকিক মেহ মমতা, এবং মোহনরলের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত আছ।
সেই স্থান হইতেই আমরা তোমাকে টানিয়া বাহির করিতে চাই। স্বভাবের
ভিতর তোমার জন্ম, কিন্তু স্বর্গের দিকে তোমার গতি। স্বভাবজাত
লৌকিক প্রেম স্বর্গীয় প্রেমের আভাস, সাধনবলে ও ভগবৎপ্রসাদে স্বভা-
বের অতীত দেববাহনীর পবিত্র প্রেম পরিণামে জীব প্রাপ্ত হয়।

এই অজ্ঞাতসমুত্ত ভক্তবোদ্ধগণমুৎপন্ন সহজ প্রেমের বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে
স্বর্গীয় প্রেমলক্ষণের ব্যবহার ও ভাবগত অনেক সৌন্দর্য্য আছে। ইহা
কোন শাসন বিধি বা স্বাৰ্থসমুত্ত পদার্থ নহে; যখন হৃদী অপরিচিত বহিরঙ্গ
হৃদয় পরিচিত অন্তরঙ্গ হইয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায় তখনই কেবল সে
লক্ষণ লোকে দেখিতে পায়। সামাজিক নিয়ম বন্ধনে বাহ্যধর্মকে বলপূর্ব্বক

দশ। ঘটিল, তখন ইঁঠাং নিমেষের মধ্যে উভয়ের দেহ মনের অত্যাশ্চর্যে বেম-
 ডড়িতের প্রবাহ ছুটিল। তাহাতে বাহ্যারামের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, অস্তঃকরণ
 আলোড়িত হইল, শিরা ও নায়ুসগুলো মহাবেগে শোণিত ধারা বহিল,
 অংপিণ্ডে ঘন ঘন শব্দ হইতে লাগিল, অলপিপাসায় কণ্ঠ শুকাইল, লজ্জা
 ভয় দুঃখ দয়া মায়া তালবাসায় মিশিয়া মনের মধ্যে কি একটা মহা কাণ্ড
 কারখানা হইতে লাগিল। আসল কথাটা এই যে এত দিন পরে ইঁহারা
 পরস্পরের নিকট নিঃশব্দস্বরূপে পরিচিত হইলেন। পরিচয়ের সময়
 উভয়ের হৃদয়নদীর মিলনস্থলে যে ভয়ানক তুফান উঠিয়াছিল তাহা এক
 অতীব আশ্চর্য ব্যাপার। মনের মাহুসকে পাইলে জীব বড় কৃতার্থ এবং
 আনন্দিত হয়, তাই এই সমারোহ। মেবে মেবে সংঘর্ষণ কালে যেমন
 বিজলী চমকে, ভীমনাভে অশনি গর্জ্জন করে, এবং সেই মহা আন্দোলনে
 আকাশ মেঘিনী কাঁপিতে থাকে, এই মহা প্রেমমিলনে তেমনি একটা
 ষোরতর বিপ্লব ঘটয়া গেল, জীবনতরীর রসা রসি ছিঁড়িয়া একাকার হইল,
 বানের জলে যেন দুই জনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। নাবিকদ্বয় তুমুল
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রতিকূল স্রোতমুখে দৃঢ়মুষ্টিতে হাল
 ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এই ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রমশালী প্রেম মহাবীরের
 সঙ্গে কয় জন যোদ্ধা সংগ্রাম করিতে পারে? তাহার দুর্জয় শক্তি এক
 হৃদয় হইতে যখন অন্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন এইরূপই ঘটে। ইঁহা
 শক্তির সমতা এবং সমধর সাধন। বাহ্যারাম সন্তোষিণী অনেক কষ্টে প্রথম
 ধাক্কা সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর বেগ কথঞ্চিত মন্দী-
 ভূত হইলে দ্রুতগামিনী সেই প্রেমতরঙ্গিনীর উদ্বেলিত মধুর হিল্লোলে
 ভাসিতে ভাসিতে উভয়ে উভয়ের মাপুর্ন্য রস পান করিতে করিতে প্রেম-
 সিদ্ধুর অভিমুখে ধাবিত হন।

মহারসপ্রসূত প্রগল্ভা প্রীতির বড় প্রভূত পরাক্রম; যেমন তাহার
 ষরতর তেজ, তেমনি মিষ্টতা কোমলতা; যেমন বিস্তৃতি, তেমনি গভী-
 রতা; এমন ভয়ঙ্কর তেজ, যে সেই তেজে পুরুষ স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী পুরুষেতে
 মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব স্থলর মূর্ত্তি ধারণ করে। পরস্পরের
 আদান প্রদানে পরস্পর বিপুল সম্পদশালী হইয়া উঠে। উভয়ের আত্মার

মিড্রিড বৃষ্টি সকল তখন জাগ্রত এবং প্রকৃতিত হয় । ইহা একটা নতুন
বিধ বিদ্যালয়, এখানকার শিক্ষাপ্রণালীর ওপে পুরুষ প্রকৃতি মনুষ্যত্বের
পূর্ণ বিকাশ লাভ করে । এই জন্য ভক্তিসম্বিশারদ বৈকব সাধুগণ প্রকৃতি
পুরুষের আধ্যাত্মিক মিলনের স্বর্গীয় মহত্ব, অপূৰ্ণ মাধুর্য্য রস বিবিধ চন্দ্রো-
বন্ধে প্রচার করিয়া গিয়াছেন । অন্তর্যমি সুলদর্শী বৈকবদল এবং তাত্ত্বিক
এই সাধনের পক্ষপাতী, কিন্তু সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত । উচ্চ নীতির অভাবে
পবিত্র প্রণালীকে তাহারা ঘৃণার বিষয় করিয়া ফেলিয়াছে । শিক্ষারস্ত্রে
ইহাতে অনেক কষ্ট । কোন শিক্ষাই বা প্রথমে সুখজনক হয় ? শিক্ষা,
পরীক্ষা, তাহার পর সুখ শাস্তি ।

সন্তোষিনী ও বাহ্যারাম প্রেমতত্ত্ব শিক্ষার জন্য এত দিন পরে বিদ্যালয়ে
ভর্তি হইলেন । এক জনের বহু বৎসরের চেষ্টা যত্নে বিদ্যালয়টী প্রাতি-
ষ্ঠিত হইল । এখন কত দিন পরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে তাহা কে জানে ?
সম্মুখে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহা কে বলিতে
পারে ? ভালবাসা স্বর্গীয় অমৃত, তাহা পান করিলে জীব অমর হয় এবং
চরমে পরমানন্দ লাভ করে । কিন্তু হায় ! এ পূণিবীতে সে অমিশ্র
নির্মূল প্রেম কোথায় ? প্রেম, তুমি কোথায় ? বিবাহের সাত পাকের
ভিতরে কি ? না বহুমূল্য বসন ভূষণের মধ্যে ? অথবা মোহান্ব ইন্দ্রিয়সক-
ল নরনারীর জুড়য়ে ? কোথায় তোমার সন্ধান পাইব ? অবশ্য তুমি আমার
লৌকিক স্নেহ মমতা, এবং মোহপরলের অভ্যাসেরই লুকাইয়া আছে ।
সেই স্থান হইতেই আমরা তোমাকে টানিয়া বাহির করিতে চাই । স্বভাবের
ভিতর তোমার জন্ম, কিন্তু স্বর্গের দিকে তোমার গতি । স্বভাবজাত
লৌকিক প্রেম স্বর্গীয় প্রেমের আভাস, সাধনবলে ও ভগবৎপ্রসাদে স্বভা-
বের অতীত দৈববাহুনিয় পবিত্র প্রেম পরিণামে জীব প্রাপ্ত হয় ।

এই অজাতসমুদ্র ভুতবোণাসমুৎপন্ন সহস্র প্রেমের বাহু লক্ষণের মধ্যে
স্বর্গীয় প্রেমলক্ষণের ব্যবহার ও ভাবগত অনেক সৌন্দর্য্য আছে । ইহা
কোন শাসন বিধি বা স্বার্থসমুদ্র পদার্থ নহে ; যখন দুইটা অপরিচিত বহিঃস্থ
জন্ম পরিচিত অন্তরঙ্গ হইয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায় তখনই কেবল সে
লক্ষণ লোকে দেখিতে পায় । সামাজিক নিয়ম বন্ধনে বাহ্যিককে বলপূর্ব্বক

স্বামী স্ত্রীরূপে গ্রহিত করে, তাহার নাচার হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া ভাল বাসিতে বাধ্য, নতুবা তাহাদ্বয়কে রাজদ্বারে দণ্ডিত, সামাজিক বিচারে অপমানিত হইতে হয় । উনি আমার স্বামী, ইনি আমার স্ত্রী, অতএব আমাদের ভালবাসা উচিত ; এই উচিতবোধ প্রথমে পরস্পরকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করে । এক দিকে উত্তম বসন ভূষণ, ধন সম্পদ সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রদান, অপরদিকে মিষ্ট বচন, সেবা ভূজাশা, স্নেহানুগত্য, প্রেমব্যবহার প্রতিদান ; ইহা দ্বারা এবং অন্য পাঁচ প্রকার পীড়াপীড়িতে এক সঙ্গে বসবাস করিতে করিতে, কালক্রমে অল্পে অল্পে নরনারী স্বামী স্ত্রীরূপে পরিণত হয় । ইহাকে বৈধ প্রেম বলে । বিবাহের প্রথম সংস্কারটা একরূপ হাতে ধড়ী দেওয়া, তার পর কার কত বিদ্যা হইবে মা শরস্বতী জ্ঞানেনা । বাল্য-বিবাহ আর বৌবনবিবাহ, এ দুইটা কেবল আঁটির গাছ আর কলমের গাছ আমাদের মনে হয় । কোন্টা টক কোন্টা মিষ্টি, তা ফলেন পরিচীয়েতে । পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ আর সামাজিক আহার পান বাজনা বাদ্য, এই হইলেই বিবাহ হইয়া গেল । কিন্তু ইহার অমুরোধে প্রেম সর্বত্র অন্বে না । তথাপি এ সকলকে প্রেম সাধনের বাহ উপকরণ বলা যাইতে পারে ।

আগে প্রেম, তাহার পর বিবাহ, সুসভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত । অর্দ্ধসভ্য হিন্দুরা আগে বিবাহ করিয়া তাহার পর প্রেম তৈয়ার করিয়া লয় । জিনিষটা প্রস্তুত হইতে না কি অনেক সময় লাগে, তাই ইহারা বহুদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় আট দশ বৎসর ব্যয়ক্রমে প্রেমের চাস আরম্ভ করে । যাহারা বেশী বিজ্ঞ তাহারা গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন । স্মৃতিকাগূহে দুইটিকে বোড়কলম বাধিয়া দিলে বোধ হয় আরো ভাল হইতে পারিত ! যা হউক, বাল্যবিবাহ প্রথাটা মন্দ নয় ; কারণ, বাহাকে আমি বিবাহ করিব, মড়াই মরুক আর চ্যাঙড়াই ছিঁড়ুক, কাঁদিয়া হউক, হাসিয়া হউক, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে । ইহারা দুই জন যেন সংসাররূপ ব্যবসায়ের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী বিশেষ, এক সঙ্গে না থাকিলে ব্যবসায় চলে না । এ প্রেম অবশ্যাস্তাবী, না হইলে আর উপায় নাই । “ধরে বেঁধে প্রেম” ইহাকে বলিতে পারি । কিন্তু প্রেমমূলক বিবাহ অপেক্ষা বিবাহমূলক

প্রেম যে একটা নিত্য লোকমানের কারবার, কল-বেধিয়া তাহা বড় বোধ হয় না। পড়পড়তার লাভ খেব প্রায় সমানই হাঁড়াইয়া যায়। কলতঃ স্বাধীন প্রেম বড় হুস্তাশ্য, ধরে বেধে প্রেমই পৃথিবীতে প্রচলিত। মুক্তপ্রেম অনেক সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া বশ দিকে ছুটিয়া পলায়। বাল্য-বিবাহসিদ্ধ অধীন প্রেম নিরাপদের সামগ্রী, যেন খালকাটা নদী; জল আছে, তাহাতে নৌকা চলে, কিন্তু ডুববার আশঙ্কা নাই। ইহাতে প্রেমের বেশী বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু শান্তি আছে। অধিক আমোদ উন্নাস রস বিলাস না থাকিলেও নির্ঝিল্লী জীবন কটাইবার বেশ সুবিধা আছে।

এ মন্তব্যটা শুনিয়া কোন মহাশয় যেন রাগ না করেন। পৃথিবীর পনর আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি নরনারী যখন এতরূপ প্রেম-বন্ধনে চির কাল সুখী হইয়া আসিয়াছে তখন মনে হইতে পারে, “তবে কি আমরা ভূতের বেগার খাটিতেছি? আমাদের স্বামী স্ত্রীরা তবে কি কাঠ পাষাণে নির্মিত?” না, না, সে কথা নয়; আপনারা ভ্রমিত হবেন না। সেই জন্যই আগে থাকিতে আমরা বলিয়া রাখিয়াছি, আপনাদের অবস্থা বেশ নিরাপদ। আপনারা বেশ সুখে আছেন। ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে ইহাই বিধাতার সাধারণ ব্যবস্থা এবং মঙ্গলের বিধান। বাহ্য প্রয়োজন তাহা আপনাদের আছে। বরং সন্তোষিণী বাস্তারাম এ বিষয়ে নিত্য হুস্তাশ্য। আহা, যখন দম্পতিদ্বয় একত্রিত হইয়া সন্তানাদিসহ পানাহার, আমোদ প্রমোদ ধর্ম্য কর্ম গৃহকাঙ্গা সমাধা করেন, যেন গিমনী পানটী সাজিয়া কর্তাকে দেন, এবং কর্তৃটি প্রেমিক কপোতের মত আক্লাদে বহু বহু বকমু শব্দ করিতে করিতে তাহা চর্কণ করেন, ব্যাক্সমা ব্যাক্সমীর মত হুটীতে যখন মুখোমুখী করিয়া বলিয়া থাকেন, তখনকার শোভা দেখিয়া কোন বিবাহপ্রার্থী নরনারীর মন না প্রেলোভিত হয়? এক আশুট বিবাহ কোঁদল থাক, তাতে কিছু যায় আসে না। স্ত্রী যদি কর্কশভাষিণী মসিবরণী পেতিনীর মতনও হন, কিম্বা স্বামী মহাশয় যদি ভগ্নবস্ত্র পুরুষের কুজপৃষ্ঠ ধ্বংসও হন, অথচ উভয়ের মধ্যে যদি বাস্তার চলন প্রেমবন্ধন থাকে, তাহা দেখিয়া কে না হিংসার মরিবে? আমাদের বিকট বাবুর কপালে

ভেমন একটা জুটিলে তিনি কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু আমরা না কি মহারস-কাব্যের পত্তন ফেলিয়াছি, সুতরাং এখানে স্বনীভূত মূর্তিমান আদর্শ প্রেম প্রয়োজন। এই অন্য প্রচলিত বিধির বহির্ভূত প্রস্তুত প্রেমের সঙ্গে সাধারণ প্রেমের তারতম্য এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

সে কথা এখন থাক, বাহা বলিতেছিলাম সেটা আমরা শেষ করিয়া লই। হিন্দু স্ত্রীরা বেশ লোক, যেন ছাছাছের ল্যাংবোট, সস্ত্র ছাড়ে না। তুমি খীষ্টান হও, সেও খীষ্টানী হইবে। জাতি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্ম হও, সেও গন্ধাম্বান শিবপূজাত উপবাস ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মিকা হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বুজিবে। আবার যদি তুমি পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অর্কহিন্দু কি পুরো হিন্দু, অথবা না হিন্দু না মুসলমান হও, সেও ঠিক তাই হইবে। অর্থাৎ তুমি যে দিকে যাবে, সেও পাছে পাছে সেই দিকে যাবে। ভোগেতে সুখেতে জীবনে মরণে পাপে ধর্মে বিধর্মে অধর্মে স্বর্গে নরকে কোন অবস্থাতেই তাহাকে তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে না। বিলাতে গিয়া হ্যাট কোট পরিয়া যদি তুমি সাহেব সাজিয়া দেশে ফিরিয়া আস, রাতারাতির মধ্যে তোমার স্ত্রীও গাউন পরিয়া মেম সাজিয়া তোমার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া যাবে, টেবিলে খানা খাবে, বোড়ায় চড়িবে। (পড়ে হাত পাটা না ভাঙ্গে এখন এই প্রার্থনা।) মোদ্দা তুমি বিলাতে গিয়া বাহা না পারিয়াছ, সে দেশে থাকিয়া তাহা অপেক্ষা এক কাটি বাড়াইবে। বিলাতী বিবির ফাদারেরও সাধ্য নাই যে ভেমন করিয়া চলিতে পারে। বলহারী বাঙ্গালীর মেয়েকে! কিছুতে পিছ পা নয়। হিন্দুস্থানের এ প্রেম বড় মজার জিনিস। যদি মরিতে যাও, স্ত্রী তোমার সঙ্গে মরিতেও রাজী আছে। তুমি মৃত্যুর পর পুড়িবে, সে জীবন্তে পুড়িয়া মরিবে। তার নাম এই অন্য সহধর্ম্মিনী। কঁটালের আটা, শেরাকুলের কাঁটার মত তার প্রেম। তুমি ইহাতে জ্বালাতন হও, আর দস্ত কটিমিটি কর, আর আঙ্গুল কামড়াও, সে তোমায় ছাড়িবে না। বিলাতেরত সাহেব বাবু, তুমি যে মনে ভাবিতেছ, কোন রকমে পৈতৃক ওস্তদ অশিক্ষিত নেতিভ স্ত্রীটাকে গেটরিড্ করিয়া আর একটা মেম বিবাহ করিবে তা বড় হচ্ছে না! যদি

আর পাঁচটা সতীন আসিয়া তাহার প্রেমে ভাগ বসায়, তবু সে তোমার একটা পালইয়া টানাটানি করিবে। কিন্তু হায়! সে যুগের দিন ক্রমে চলিয়া গেল, আর রয় না! বসন্তঃ হিলু স্ত্রী যেন ছিলেন জোঁকের মত নাছোড়বান্দা। চাকরীর স্থান হইতে দুই চারি বৎসরান্তর একবার আসিয়া যদি দেখা দাও, তাতেই সমুদ্র। মিষ্টই লাগুক আর তেজই লাগুক, তাহার হাত এড়াইতে পারিবে না। যদি উদাসীন হইয়া নির্জাক থাক, সে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়িবে, নাকে কাঁদিবে, অবিশ্রান্ত বকিবে। যদি ক্রোধ অভিমান করিয়া উপবাস কর, সে তোমার মুখে ভাল ভাল খাওয়া গুঞ্জিয়া দিবে। “না দেখলে রটতে নারি, দেখলে করে চুলোচুলি।” সংক্ষেপে এই সে প্রেমের লক্ষণ। ভাল কি মন্দ তাহা তোমরা এখন বিচার সিদ্ধান্ত কর, কিন্তু পত্নী পেত্রীর মত চির কাল তোমার সঙ্গে সঙ্গে কিরিবে। যদি সে আগে মরে, তবে তোমার বাড়ীর চারি ধারে ধোতাস্থা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে আর বলিবে, “আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়িব না। তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার কাঁচা ধরে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।” ইহাকে এক প্রকার অবরুদ্ধতার প্রেম বলা যায়।

কিন্তু শুভ সংযোগে যখন পুরুষের জ্বর নারীজ্বরের সহিত সম্মিলিত হয় তখনই উপর উল্লিখিত মহারসের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোপীগণের সঙ্গে না কি স্তনিত পাই কৃষ্ণের প্রেম এইরূপ ছিল। সত্য মিথ্যা গোপিনী জানেন। ফলতঃ এইরূপ মহাপ্রেমের ভিত্তি বিধাতার বেশ লীলা খেলা আছে।

একলে যে প্রেমের কাহিনী আমরা লিখিতেছি তাহা গরলমিশ্র। যখন এই গরল মন্থনে অমৃত উঠিবে, তখন পূর্ণ শ্রীতি ভরকে পরিহার করিয়া সেই অনন্ত প্রেমসিদ্ধিতে গিয়া মিশিবে। যে মহাবীর প্রেমিক আস্তা এই হলহল জীর্ণ করিয়া তাহাকে অমৃতে পরিণত করিতে পারেন, তিনি মহাযোগী শক্তের ন্যায় নির্জিকার চিত্তে মহাসত্য গোপীকে উদ্ধদেশে বসাইয়া নিত্যকাল নিত্যানন্দ রস পানে কুড়কুড়ার্ণ হন। আমাদের প্রেমিক পণ্ডিত বাস্তবাস এখন গরল হইতে সমুদ্র উদ্ধারের অন্য সাধন আরম্ভ করিলেন। এ সাধন মহা মহা যোগী উপদ্বীপেরও অসাধ্য।

অনেকে এ পথে পদার্পণ করেন না, কারণ বাকুদের সঙ্গে আঙনের বন্ধুতা স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য। সচরাচর লোকে বৈধপ্রেমের আশ্রয়ে ভক্ততা বাঁচাইয়া ইচ্ছামত জীবন বাপন করে। আইনে তাহাদের সাত খুন মাপ। কিন্তু হরগৌরী, কি রাধা কৃষ্ণের প্রেমের উপমা দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা মুখে বলেও আবার অনেকে; কাজের বেলায় কার কত দূর উচ্চ পবিত্রতা রক্ষা পায় তাহা কেবল অন্তর্যামী পুরুষ জানেন। যাহাই হউক, যখন নীতির নির্মূল ভূমিতে নির্বোধের বিস্তৃত সমীপমধ্যে এই প্রেম আপনাপনি অন্তরিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমরা ইহা হইতে পরিণামে অবশ্যই মোক্ষ ফলের আশা করিতে পারি। সাধু ভক্ত পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করুন, সবুরে মেওয়া ফলিবে। পৃথিবীতে যাহা সচরাচর দেখা যায় না, পবিত্র চরিত্র জ্ঞানী বাহ্যারামের জীবনে তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মহোদাস ।

যে দূরত্বক্রমণীয় শক্তির প্রভাবে বাস্তবায়নের মত কঠোর নির্মম
নিঃসেহ যৌর গন্তীর চিত্ত বিচকল এবং প্রেমোন্মত্ত হয় তাহা সামান্য শক্তি
নহে । ইহাকে মায়ামুক্তি অবিদ্যা বল, চায়া অপদার্ব বল, আর কালকূট
গরলই বল, যে কোন ঘূর্ণাহ' নিম্ননীর শব্দে অভিহিত করিতে চাও কর,
কিছু পৃথিবী ইহার দুর্জয় প্রতাপে সর্বদা সশক্তি এবং ব্যতিবাক্ত । ইহা
অসং হইয়াও কাব্যাতঃ সংরূপে প্রকাশিত হয় । এমন কি, মায়াবাদী
সংন্যাসী বা ষ্টোয়িকধর্মের ন্যায় বিকট বহনে কর্কশ স্বরে তীব্র ভাবায়
বাহারা ইহার ঘোষ ঘোষণা করে, ভিতরে ভিতরে এপিকিউরিয়ানের মত
তাহারাও ইহার সেবায় আয়োজিত হয় । এমন লোকও আছে, বাহারি নিম্না
কুংসার ছলে অন্তরের নিকট কামনা চরিতার্থ করিয়া লয় । বাস্তবায়ন
বাস্তবায়ন, কত কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীর বহু বৎসরের কঠোর সাধন,
দুঃস্বর তপস্যার ফল এই মায়ামুক্তি প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া পিঠাতে । ইহার
অনিষ্টকারিতা পণ্ডিত নিতান্ত অনবগত ছিলেন না । সাময়িক মোহ-
বিকার শ্রেম নামে সচরাচর গৃহীত হয় ইহাও তিনি বুঝিতেন । এই জন্য
তিনি এখন সন্তোষিণীর প্রেমের গভীরতা এবং সারবত্তা নিরূপণ করিতে
বসিলেন ।

কোন কাব্যই বাস্তবায়নের জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়া নয় । বুদ্ধি হুক্তির
• স্তীক দ্বয়ে তাবৎ বিষয় বও বও করিয়া দেখা চির অন্ত্যাস । প্রেমিক ভাবুক
হইয়াও তত্ত্বানুসন্ধানস্পৃহা কমিল না, বরং তাহা আরো সরস এবং উজ্জ্বল

হইল। প্রেমসত্ত্বাংগ অপেক্ষা প্রেমের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার আগ্রহ অধিক অঙ্গিল। এক্ষণে তিনি এক নবীন মূর্তি ধারণ করিয়া আর এক নূতন পথে চলিলেন, নূতন আলোকে নূতন চক্ষে জগৎসংসার দেখিতে লাগিলেন। মধুর প্রেমামুরাগে নয়ন অমুরঞ্জিত হইল। সে মাছু-বও আর নাই, সে পৃথিবীও আর নাই, সমস্তই একবারে যেন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাহ্যারাম যাহা শুনে, যাহা দেখেন সব যেন কেমন এক-প্রকার নবতর স্মৃতি এবং অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক জীবকে ভালবাসবার জন্য তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। এক ব্যক্তির প্রেমলাভ করিয়া তিনি মানবজাতিকে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই জন্যই বোধ হয় সম্বন্ধীকে লোকে এত ভালবাসে। সমস্ত ভূমণ্ডল একটা সুরমা প্রমোদ কাননের ন্যায় তাঁহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সকলি মধুময়।

অনন্তর তিনি সেই নবজাত প্রেমস্থাপানে বিভোর হইয়া নিশানাথের গৃহসংলগ্ন উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুষ্করিণীর বাধা ঘাটের সোপানের উপর বসিলেন। বসন্তসমাগমে প্রকৃতি নবীন বেশ পরিধান করিয়াছে। নান দেশ দেশান্তর হইতে বিচিত্র বিহঙ্গ সকল আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের মধুর কূৰ্ণধ্বনিতে উপবন কুঞ্জকানন ধ্বনিত হইতেছে। যেন যাত্রাবলের ছেলেরা চারিদিকে ছড়াইয়া গীত গাইতেছে। সরসীৰ নিখুঁত সলিলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু বহিয়া অঙ্গে লাগতেছে। কামিনী ও গোলাপকুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী ও মক্ষীকাগণের মহামহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। চাতম্বুলের মধুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। বাহ্যারামের হৃদয়ে মধুর প্রসবণ উৎসারিত, বাহিরে বসন্ত ঋতুর শোভায় প্রকৃতি সুসজ্জিত সজ্জীবিত। সরস রূক্ষপত্রাবলা, কুসুমিত তরুকুঞ্জ, মুকুলিত চাত-শাখা সকল শ্যামল সৌন্দর্য্য এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যভরে মলয় মারুতের মূহ-হিল্লোলের সঙ্গে খেলা করিতেছে, সরসীর স্বচ্ছনীরে তাহার প্রতিবিম্বিত ছায়া আন্দোলিত হইতেছে। বাহ্যারাম সেই নববসন্তের প্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া কুসুমপরিমলবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিতে করিতে একাকী যেন মাদুর্য্য রসসাগরে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। জীবনের এই অংশটী

তাঁহার পক্ষে বড়ই সুখকর হইয়াছিল। এইভাবে কিছু কাল আনন্দ সন্তোষ করেন মনে বড় ইচ্ছা। এক দিন পরে এই বিজ্ঞানী ধরাগমে একজন সুখের সুখী সুখের সুখী তিনি পাইয়াছেন, কিছু কাল সুখভোগ করুন এটা আমাদেরও ইচ্ছা। আহা! ভদ্রসন্তান বড় মনঃপোড়া পাইয়াছে। তাঁহার বিজ্ঞানদক্ষ, শোকসন্তপ্ত নীরস হৃদয়ে একটু প্রেমাসুত বর্ষিত হউক! কেবল কি “অগরাইট্, ব্যাকিউ” বলিয়া বেড়াইলে আশা বাঁচে! অকৃতঃ একজনও ভাবের ভাসুক চাই। আজ কালের দিনে-হুইটা লোককে অকৃত্রিম প্রেমে মিলিতে দেখিলে মনে আশা হয়। প্রাণের দে-সর জীবনসং-চর অভাবে মনুষ্য বড় কষ্ট পায়, পৃথিবী যেন তাঁহার পক্ষে অরণ্যভূমি।

কিন্তু মানবের অদৃষ্ট চক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে; অদ্য পূর্ণচন্দ্রের কমলীয় জ্যোৎস্নায় জগৎসিন্দু উদ্ভেলিত, কলা অমানিশার ঘোর অন্ধকার আবরণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমাচ্ছন্ন। সে ভগবানের হাতের খেলার সামগ্রী। ভগবতী মহাবিদ্যার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান। অনন্তরূপিনী লীলাময়ী মা তাকে লইয়া প্রতিফলনে নব নব রঙ্গে ক্রোড়া করিতেছেন। কখনো হাসা-ইতেছেন, কখনো কাঁদাইতেছেন। ঘোর বিপদাঙ্ককারে ফেলিয়া কখনো ভয় দেখাইতেছেন, কখন রূপালোক দেখাইয়া আশা আনন্দে পুলকিত করি-তেছেন। তাকে উচ্চ আকাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার কোল পাতিয়া লুফিয়া লইতেছেন। এইরূপে তিনি পাকা পিটাইয়া ঘোড়া, গোড়া হইতে মানুষ, মানুষ হইতে দেবতা প্রস্তুত করেন। ছেলের সঙ্গে চেলেমি করা তাঁহার চিরকালের রোগ। মা আমাদের পাগলনী উদ্ভাষিনী। বাহ্য-রামকে তিনি লংসারচকে ক্রমাগত ঘুরাইতেছেন। তাঁহার এই সুখের আরম্ভ এক শেষ। অথবা উচ্চতর মগভাব সাধনের জন্য বাহ্যর জীবন, পার্শ্বব সুখে সুখী হইলে তাঁহার চলিবে কেন? ইহজীবন তাঁহার সংগ্রামের জন্য। মা আনন্দময়ী যশা সময়ে তাকে শাস্তি দান করিবেন।

বাহ্যরাম উন্মাদনস্থ সরসী তটে বসিয়া আছেন, সন্তোষবিশী বাড়ীর এ ঘর ও ঘর ছাড়া বারগা নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া শেষে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রেমবজ্রের ব্যবতীর উপকরণ সংগৃহীত হইল। বাহ্যরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বল দেখি সন্তোষবিশী, কেন তুমি

আমায় এক ভাল বাসিলে ? আমিত হতভাগ্য গৃহবহিষ্কৃত পুস্তকের কীট, নীরল পাষণ্ড সূচক ; না আছে রূপ গুণ, না আছে ক্ষমতা শক্তি ; আমার নিমিত্ত তোমায় এত ব্যাকুলতা কেন জন্মিল ? আমি নিষ্ঠুর কঠোর অগ্রে-মিক, নারীর মৰ্যাদা আমিত কিছু জানি না। নিজের দুঃখ বহন করিতে আমি ভীত নহি, কিন্তু আমার জন্য এক জন দুঃখ পাইবে এটা বড় অসহ্য। বিজ্ঞানোদ্ধারের হাতে পড়িয়া শেষ কি কষ্ট পাইবে ? আমার মন সংশয় আঁধারে আবৃত, কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহাকেও আমি কোন বিষয়ে সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু তোমার ভালবাসায় আমি বড় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমার দুঃখে আমার প্রাণ নিরন্তর কঁদিতোছে, কিছুতেই বারণ মানিতেছে না। আমার এ জীবন যদি তোমার কোন কাজে আসে তাহা আমি উৎসর্গ করিয়া রাখিলাম। তুমি শূন্য হও, সদা হাস্য বদনে নির্বিকার মনে প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে কাল বাপন কর ইহাই কেবল আমি দোষিতে চাই।”

যে বাহ্যারামের সাত চড়ে কথা বাহির হইত না তাহার কণ্ঠে যেন দেবী সরস্বতী আবির্ভূত হইলেন। একটু বিলক্ষণ মন্তস্তর সহিত তিনি ছদ্ম খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, প্রাণটা যেন সমস্ত তাঁহাকে ঢালিয়া দিলেন। মাতৃবিয়োগ অবধি ভালবাসা কি সামগ্রী তাহা এত দিন জানিতেন না, পৃথিবীতে সচরাচর যে ভালবাসা দোষিতে পাইতেন তাহাতেও লোভ জন্মিত না, এক্ষণে সন্তোষিণীর সরল মধুর প্রেমপানীয় পান করা মন্ত হইয়া উঠিলেন। ভাবোদ্ধারের বিরাম নাই, কথারও শেষ নাই, নবীন প্রেমিকের প্রেমকাহিনী কিছুতেই আর ফুরায় না। সে দিন ভাবের আবেশে বাহ্যারাম কত কথাই যে বলিয়া ফেলিলেন, তাহা আর লিখিয়া শেষ করা যায় না। তোমার আমার পক্ষে সে সব কথা ভালও লাগিবে না, বরং বিরক্তিকর বোধ হইবে। প্রণয়ীদিগের পরস্পর গূঢ় প্রণয়ের অফুরন্ত কথা কেবল তাহাদেরই ভাল লাগে। তাই আলাপ করিতে বসিলে আর তাদের জ্ঞান থাকে না। আমরা গৃহীত জীব, খাটিয়া খাই, ইহাদের প্রেমকাহিনী শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া বালামের ঘর কত, তাই এস এখন আলোচনা করি।

অনন্তর বাহ্যারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই যে ভালবাসা, অর্থাৎ আত্ম-

সম্পর্কের ভালবাসা ইহা কি তোমার একটা সাময়িক উত্তেজনা? ইহা যে উকলুয়েৎপন্ন কেনপুঞ্জের ন্যায় নারীস্বতন্ত্রলভ তরলতার পরিচয় নয় তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?" ঘটালে দেখছি বিপদ! অকৃত্রিম প্রেম কাপট্যের বিন্দুমাত্র অভিযোগ অসহ্য, অথচ অত্যন্ত প্রেমের ভিতর অত্যন্ত কপটতা লুকাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত হইলেও, সন্তোষিনীর বকে যেন শেল সম বাজিল। তিনি বাবিত্ত অন্তঃকরণে ভগ্নবরে বলিলেন, "সাময়িক কি স্থায়ী তাহা আমি না, কিন্তু বহুবৎসরের পোষিত, আত্মকর্তৃত্বের অতীত, অবস্থা এবং ফলাফল নিরপেক্ষ এই মাত্র আমি। বিচার কর্তৃক দ্বারা কি আমি আমার আন্তরিক ভাব তোমাকে বুঝাইতে পারি? সম্ভাবের কঠি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

উত্তরটা জনদের ভাবে ভাবে বাজিল, তাড়াত্তে কক্ষার উঠিল, সে মধুর ক্ষনি প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল।—যেমন বোণার কক্ষার আকাশে মিলাইয়া যায়। তখন বাহ্যিক অজ্ঞানচিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেহ যদি কক্ষাল মাত্র অবশিষ্ট হইয়া রোগশয্যায় মৃতবৎ পতিত থাকে, বাক্য বন্ধ হইয়া যায়, আন্তরিক ভাব প্রকাশের সমস্ত উপায় বিনষ্ট হয়, সে অবস্থাতে কি তোমার এ ভালবাসা রক্ষা পাইবে?"

উত্তর। আমার প্রেম অস্থি মাংসের উপর নয়, কিন্তু তাহা দ্বারা তোমার সমস্ত অঙ্গ অত্যন্ত ব্যবহার আচরণ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

চিন্তাশীল বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সচরাচর কিছু হাস্যজনক নিরর্থক হয়, সেই জন্য আমরা বাহ্যিকামকে এ যাত্রা ক্ষমা করিলান। এরূপ অবিদ্যাস-বিজুস্তিত কথা পুনরায় যদি তাঁর মুখে বাহির হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতকে আমরা সমুচিত হওবিধান করিব।

সন্তোষিনীর আড়ম্বরবিহীন সরল সহজ উত্তর শ্রবণ করিয়া বাহ্যিকাম একটু অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইলেন এবং জদয়দ্বার উল্কাটনপূর্বক বলিলেন, "সে বাহা হউক, আমার প্রাণকল হইতে বড় মিষ্ট বোধ হইতেছে। তোমার মধুর ভাব আমাতে সংক্রামিত হইয়া আমাকে বড় সুখী করিয়াছে। এখন ইচ্ছা হইতেছে একবার খুব হাসি। তোমার চিত্ত-বিনোদন উদ্ভাদক হাসির সহিত হাসি মিলাইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসি।

হাসিটে কি অপূর্ণ সামগ্রী ! ইহার ভিতর কত গভীর বিজ্ঞানই আমি পাঠ করিতেছি ! বড় বড় বিজ্ঞান দর্শনে এত রস পাই নাই । মনুষ্যের হাসি যেন সেই অনন্তের প্রেমউদ্যানের একটা মাধুরীময় প্রসুটিত ফুল । দস্তোভ্‌ ব্যতীত আরো কিছু নিগূঢ় বিজ্ঞানরহস্য ইহার ভিতর লুক্কায়িত আছে সন্দেহ নাই । কিন্তু সাময়িক মন্তব্যের উরলগ্রেমের হাসি, আর স্থায়ী বিশ্বাসের হাসি এ উভয়ের মধ্যে বোধ হয় অনেক প্রভেদ ।”

বৈজ্ঞানিক প্রেমের সন্দেহমিশ্র বাক্যালাপ শ্রবণে সন্তোষিণীর কোমল হৃদয় বারম্বার বড় ব্যথা পাইতে লাগিল । তিনি একটু অভিমান এবং বিরক্তির ভাষায় তখন বলিয়া উঠিলেন, “তোমার বিজ্ঞানবিচারের জালায় আমার হাড় জ্বালাতন হইয়াছে । কি কষ্ট যে তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহা জান না, যদি জানিতে তাহা হইলে কখন দিতে পারিতে না । আমার ভালবাসা উক দুকের ফেনার মত, কি ঠাণ্ডা পাথরের মত তাহা । আমি জানি না, কেবল জানি যে তুমি আমার সর্ব্ব স্ব ।”

বাস্তবিকের হৃদয় হইতে বিজ্ঞানের ভাঁটা সম্পূর্ণরূপে এখনো সরিয়া যায় নাই ; ভাটার টান থাকিতে থাকিতে তাহাতে প্রেমের জোয়ার দেখা দিয়াছে, মাথার উপর দিয়া এক দিন একটা কোটালে বানও ডাকিয়া গিয়াছে । এরূপ স্থলে দুই একটা সন্দেহের কথা শুনিয়া সন্তোষিণীর কিছু বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । সংশয়বাদী বিচারপ্রিয় লোকদের এ রূপই দশা । বাস্তবিক বিজ্ঞানের ষাঁকেই এখনো কথা কহিতে লাগিলেন ।

তিনি বলিলেন, “তোমার কথায় আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই । তবু মানুষ কি না সচরাচর বড় ভাবপ্রবন, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি, সেই জন্য একটু আলোচনা করিয়া দেখিতেছি । আর যতটা বেশী মনে করিতেছি, পরিমাণে তোমার তত প্রেম আছে কি না সেটাও জানা আবশ্যিক । কেহই আমরা আত্মপ্রতারিত না হই এই ইচ্ছা । রূপজনিত মায়ার আর প্রেম এ দুইয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে ।”

সন্তোষিণী এ সকল কথা শুনিয়া একবারে যেন বিশ্ব হাত জলের নীচে পড়িয়া গেলেন । ভাবিলেন, “এত কালের চেড়ার বাহা হইল, তাহা

বুঝি শেষ বিজ্ঞানের কঠোর বিচারে নামজুর হইয়া যার।” কিন্তু আমরা বলিতেছি, সে ভয় করিবার আর বরকার নাই, ঠিক আরগায় গিয়া লাগিয়াছে, পুরুষের স্বভাবে প্রকৃতি মিশিয়াছে। বাহারাম বাহা বলিতেছেন, তাহা ভুলিয়া যাও। পাঠক মহাশয়রাও অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। প্রতাপূর্বক ইহা শ্রবণ করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্তি হইবে।

বাহারাম বলিতে লাগিলেন, “আমি ভাবুক ধর্মোন্মত্ত কল্পনাশ্রয় অবৈজ্ঞানিক লঘুচিত্ত লোকদিগকে বড় অপদার্থ জ্ঞান করি। সেই কারণে কবি কাব্যকার কাব্যপাঠক, কিশ্বা বাহারা নাট্যাভিনয় করে, বা বেধে, বাহারা পান গায়, নাচে, বেশী হাসে, ফুলের মালা গলায় দেয়, পানতোরা রসগোল্লা খায়, তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা হয় না। সেলী, বাইরণ, গেটে, জর্জ ইলিয়ট, কালিদাস সেক্সপিরার ইহাদিগকে আমি প্রশংসা করি না। বাহাদের রচিত গ্রন্থের আগা গোড়া সমস্ত মিথ্যা, তাহাদের জন্ম এবং মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কল্পনাবিকারগ্রস্ত; এ সকল লোকের সারবস্তা কিছুই নাই। ইহারা ভাবে গলিয়া সত্যের প্রতি অন্ধ হয়। কবিকল্পনা অপেক্ষা কি বৈজ্ঞানিক সত্য অধিক আশ্চর্যজনক নহে? সুরাপানী আর ভাবুক এ দুই ভূমি সমান জানিবে। যেটা স্পষ্ট জানিতেছি সত্য নয়, তাহা পাঠে লোকের আমোদই বা কেমন করিয়া জন্মে আমি বুঝিতে পারি না।”

“কতকগুলি মিথ্যা কথা সাজাইয়া কেহ হইলেন কবি, কেহ হইলেন কাব্যকার! একটু কথাও সত্য নয়, অপর এমনি রচনা যেন লেখক সব নিজচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন: ‘আচ্ছা বাপু, তুমি কি অস্ত্রধারী, না সর্সর্দারী? হুঁ পুরুষ কে কোথায় গোপনে কি কথা কহিয়াছে, কি ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছে, তুমি তা জামিলে কিরূপে? তাহারা কি তোমাকে মনের মধ্যে বসাইয়া প্রণয়লাপ করিয়াছিল? না তুমি গ্রন্থ লিখিবে বলিয়া তোমাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল? পড়িলে মনে হয় গ্রন্থকার যেন বহুদ্রুপী। খুব চতুরালী বটে, বেশ ক্ষমতা। কিন্তু সব মিথ্যা।’ আপনিই তিনি এক সময় প্রণয়ী, আবার অপর সময় আপনিই প্রণয়িনী। কখন ভক্ত, কখন সাধু; কখন অপরাধী, কখন বিচারপতি। আপনিই

হাসছেন, আবার আপনিই কাঁদছেন। কি এ সব ছেলেমানুষী ! ছি ! ভাল লাগে না।

সজ্জাধিনী। তা ভাই আমি কি করিব বল। আমি ত কাব্য লিখিতে কাহাকেও বলি নাই, নিজেও লিখি নাই। কল্পনাকে সত্য বলিয়াও কখনো বুঝি নাই।

বাহ্যারাম হাসিয়া বলিলেন, “আবে মাই ডিয়ার লেডি, তাই বলছি। মিথ্যা লইয়া এত বাড়াবাড়ি কেন ?”

সজ্জা। তুমি যে দেখাছি ধান ভানতে শিবের গীত হইতে বসিলে। তাদের সঙ্গে আমার সংশ্রব কি ? আমি কি তোমার কাছে কবি, না কাব্য-লেখক পণ্ডিত ? আমার ভালবাসা কি তুমি কবিত্ব কল্পনা মনে কর ? অত ঘাচাই করিলেও আর বাঁচা যায় না !

বাহ্য। না, না, তা কেন করব। এর মানে এই যে ভাবাক্ত প্রণয়ী আর কবি এরা এক জাতীয় লোক। ইহাদের মধ্যে ফিলোজফিকেল্ সিকোয়েন্স আছে।

সজ্জা। এরূপ জ্ঞান না হইলে আর তুমি আমাকে এত কষ্ট দাও। কত দিন যে তুমি আমার কাঁদাইয়াছ, তা আর কি বলিব। দুই একটা মুখ হুঃখের কথা বলিব মনে করিয়া কাছে দাঁড়াইলাম, আর তুমি কেতাবে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিলে। যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছে। এক এক বার এমনি রাগ হইত যে বই গুল সব টেনে ছুড়ে দূর করে পুকুরজলে কেলে দিই।

পুনরায় বাহ্যারাম বলিলেন, “তুমি যে আমাকে এত ভালবাসিতে তাহা আমি কিছুই জানিতাম না।”

এ কথা শুনিয়া এবার সজ্জাধিনীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি চমৎকৃত হইলেন, এবং বিশ্বয়বিস্ফারিতলোচনে বলিলেন, “আমি যে তোমাকে আজ বার চৌদ্দ বৎসর হইতে ভালবাসিয়া আসিতেছি, বরং বেশী হবে তবু কম নয়; তাহা কি তুমি জানিতে না ? কেন আমি তো অনেক সময় আমার ভাবের সুস্পষ্ট উত্তর তোমার নিকট পাইয়াছি; তবে জানিতে না তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?”

ইহা শুনিয়া বাস্তারাম একটু হঃষিত এবং কুণ্ঠিত হইলেন এবং মুহূৰ্ত্তে বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যদি পারিতাম, তাহা হইলে এত দিন আমি আরো সুখী হইতাম। আমার মন এত দিন এ পৃথিবীতে ছিল না, বিজ্ঞানচিন্তায় আমি ডুবিয়াছিলাম।"

সন্তোষিনী। সে কি! আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি যে পরিষ্কার বুঝিয়া আসিয়াছি, আমি যেমন ভালবাসি তুমিও তেমনি আমার ভালবাস। তুমি হয়তো আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ।

বাস্তা। না সন্তোষিনী, তামাসা কাহাকে বলে আমি কিছুই জানি না।

সন্তো। তাইত, কিছুতেই যে আমি ইহা মনে করিতে পারিতেছি না! হুই এক দিনের কথা নয়, পুনঃ পুনঃ যে আমি ইহার প্রমাণ পাই-
রাছি। চক্ষু কৰ্ণ বুদ্ধি জ্ঞান সকলেই কি তবে আমাকে উপহাস করিয়াছে?

বাস্তা। তা সম্ভব। আমি এক জন সে বিষয়ে ভুক্তভোগী। কত বিধ মত বিশ্বাস জ্ঞান সংস্কার এই জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ বদল করিতে হইয়াছে। বাস্তবিক সময়ে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কৰ্ণেন্দ্রিয়গণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে। তা না হইলে আমি কি সহজে সংশয়বাদী হইয়া
রহিয়াছি?

সন্তো। বা হউক, বড় কৌতূহলের বিষয়। আমার মাথার ভিতরটা যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতেছে। কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার ভুল হয় নাইত?

বাস্তা। তাই বাকি জানি, আমিও এই রোগে চিরকাল ভুগিতেছি। এখন বাহা বলিতেছি বা বুঝিতেছি তাহার ভিতর কত ভুল আছে না আছে কে ঠিক করিয়া দিবে? সত্য নির্ধারণ করা বড় কঠিন কাজ। কিন্তু এ কথা বলিলে লোকে এখনি পাগল মনে করিবে। সাধে কি মানুষ পাগল হয়? কে বুকে, কেই বা বুঝায়? যে বুঝায় সেই বুকে; সুতরাং সে যদি ভ্রান্ত বিকৃত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা কেবল ভ্রান্তিরই বিলাস। ণীক, আর ও সব ভাবিতে পার না, এখন প্রেমের মিষ্টতা একটু উপভোগ করি।

সন্তোষিণীর এই সকল পরিতাপের কথা শুনিয়া কণকাল দ্বিত্তার পর বাজারাম নিভান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত মনে বলিলেন, “তাইত, তবে কি তুমি ভুলক্রমে অপাত্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়া এখন কষ্ট পাইতেছ ? বাস্তবিকত এটা ভুলই বটে। ভালবাসা কি তবে এখন আবার ফিরাইয়া লইবে ? আহা এক্ষণে তবে উপায় ! অন্যের প্রাণ আমি কেন লইলাম ?” নির্দোষচরিত্র সরল হৃদয় বাজারামের নিঃস্বার্থ ভাবের কথা শুনিয়া সন্তোষিণী মহা আত্মদেহ গভীর হাসি হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতে চক্ষে জল বাহির হইয়া পড়িল। পূর্বের সমস্ত দুঃখকাহিনী স্মরণপথে জাগিয়া উঠিল। ক্রন্দনের অশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে সেই মুখে আবার হাসির জ্যোৎস্না দেখা দিল। বাজারামের ঘটে যদি একটু কাব্যরস থাকিত, তাহা হইলে তিনি হাসি কান্না এক সঙ্গে দেখিয়া বলিয়া ফেলিতেন, “রোদ হচে জল হছে শেয়াল কুকুরের বিষে হছে।”

পরে সন্তোষিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “না, না, ফিরাইয়া আর লটে হইবে না, সে অন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। আমি ঠিক পাত্রেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, আসল কাজে কোন ভুল হয় নাই ; কেবল মনে বড় একটা গ্লানি অনুভব করিতেছি যে এত ভুল আমি কেন বুঝিলাম ? দুই একটা ঘটনাত নয়, শত শত ঘটনা কথা ব্যবহার ; সে সমস্তই কি তবে কল্পনা ?”

বাজারাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন, “তা কি জানি, কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না। হয়তো তুমি ভালবাসার প্রমাণরূপে বাহা বাহা দেখিয়াছ তাহার মধ্যে কতক কতক সত্যও থাকিতে পারে। কিন্তু আমার কিছু মনে পড়িতেছে না। যা হইবার হইয়াছে, এজন্য তুমি আর আমার কোন অপরাধ লইও না।

সন্তোষিণী পুনর্বার অট্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তোমাকে পুলিশে দিব, যাবে কি ? না জেলখানায় পাঠাব ? অপরাধের কথা হইতেছে না, আমি যে কি নির্যোষ মূর্খ তাই কেবল ভাবিতেছি।” পূর্বের কথা মনে করিয়া একটু দুঃখ হইতেছে, আবার হাসিও পাইতেছে। পরে বলিতে লাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য এত ভুল ! আমি মনে মনে জানিতাম, আমি খুব বুঝি, আমার মত চতুর কেহ নাই, আজ সে অহঙ্কারটা চূর্ণ হইয়া গেল।

সে কথা থাক্, এখন তোমার সব খুলিয়া বলিতে হইবে । আচ্ছা তবে সে সকল কথার মানে কি ?

বাহা । তুমি বল আমি শুনি ।

সন্তো । না, তুমি আগে বল ।

বাহারাম আর কি বলিবেন, মুখ হাঁ করিয়া বোবার আনন্দের হাসি হাসিয়া ভাঙিতে লাগিলেন, “আমি কিছু টের পাউতাম না, আর উনি ভিতরে ভিতরে এত কাল এই কাণ্ড করখানা করিয়া আসিয়াছেন ! আচ্ছা আমি আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি ।—“বাস্তবিক এটাত বড় মিষ্ট প্রেম ! কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, একটা প্রত্যুত্তরও দিতে পারি নাই, অথচ ইনি আমাকে এত ভালবাসিয়াছেন ! শুণ্ড প্রেম ! লুক্কায়িত প্রেম ! স্বভাবজাত অকৃত্রিম প্রেম ! আপনাকে তুলিয়া পরের জন্য প্রেম ! আহা বড় উপদেশ ! সন্তোহিণী যখন সংগেপনে আমাকে ভাল বাসিতেন, তখন আমি গোপনে লুকাইয়া যদি তাহা দেখিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভারি আশ্চর্য হইত । অবাক প্রেম বড় গভীর এবং মধুর, কিন্তু অবাককে বুঝিবার জন্য এক বার তাহা বাহির হওয়া আবশ্যক । এখন আমি শুণ্ড এবং প্রকাশ্য দুই প্রকার প্রেমেরই আশ্বাসন পাউতেছি ।”

এইরূপে তিনি ভাবে গলিয়া প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা ও সম্ভোগ করিতেছেন, আর সন্তোহিণী স্থির ভাবে ঐচ্ছার প্রেমচিন্তা-বিস্তারিত মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময় বাহারামের জ্বরে এই স্বর্ণীর প্রত্যাদেশ হইল,—“আমার প্রেম এইরূপ মিষ্ট জানিবে । তুমি আমাকে ছাড়িয়া কখন পাণ্ডিত্যের অভিমানে অন্ধ থাকিতে, কখন বা আমাকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিতে, কখন নিন্দা করিয়া বেড়াইতে ; কিন্তু আমি তোমাকে জ্বরের মধ্যে অতি বহুে ধরিয়া রাখিতাম, তোমার পাছে পাছে কিরিতাম ; কবে তোমার মন কিরিবে, কবে তুমি আমাকে ভক্তি করিবে ভাল বাসিবে, তাই ভাবিতাম ।”

এই প্রত্যাদেশে বাহারামের জ্বরে একবারে দিব্যজ্ঞান, মহাভাব, এবং জলন্ত বিখালের বীজ এক সঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, জীবনের গুড় রহস্য খুলিয়া গেল, মানবীয় ও স্বর্ণীয় প্রেমে প্রাণ প্রমত্ত হইল ।

তখনস্তর সন্তোষিণীর মনে যখন যে ঘটনা উপলক্ষে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তদ্বিবশে স্থান কাল অবস্থা সমস্ত বর্ণন করিলেন, বিশেষ বিশেষ কথা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন ; কথায় মিলিল, কাজে মিলিল, স্থান কাল অবস্থা অনেক মনে পড়িল, কিন্তু ভাবে মিলিল না। সন্তোষিণীর এ বিষয়ে ভ্রমাত্মক ভ্রম হইয়াছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তথাপি স্ত্রীজাতি-মূলত অভিমান ও লজ্জা বশতঃ তিনি সে ভ্রম স্বীকার করিতে যেন তত প্রস্তুত নহেন।

আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে উভয়েরই জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের কিছু কিছু ভুল ছিল। নতুবা কি এক হাতে কখন তালি বাজে ? হঠাৎ না বুঝিয়া রাতারাতি কি এত ভালবাসা কখনো জন্মে ? বাঙ্কারামের তখন প্রবল জ্ঞানভুকার সময় ; তদ্বানুসন্ধানের দিকে বেশী ঝোক থাকতে এ ভাবটা তত বাড়িতে পায় নাই। যাহা হউক, এ জন্য সন্তোষিণীর আর হৃঃখিত হওয়া উচিত নহে ; মনের ভিতর যেমন সম্ভ্রম, তেমনি অজ্ঞানেও অনেক কার্য্য হয়। বাঙ্কারামের জন্মের নিভৃত স্থানে এত দিন কি ভাবে প্রেমের কণ্ঠ্য চলিয়াছিল তাহা কে বলিবে ? আমরাও আর সে অব্যক্ত অক্ষুট প্রেমের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না, সে সকল মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতের অধিকৃত রাজ্য।

সন্তোষিণীর প্রীতিবৃত্তি অগ্রেই বিকসিত হয়, এক্ষণে তাহার সহানুভূতি পাইয়া তিনি শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বাঙ্কারাম হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড সাহারা মরুভূমি হইতে একবারে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে পড়িলেন। অবশ্য সে জল লবণাক্ত, পান করা যায় না, করিলেও পিপাসা মিটে না, কিন্তু শীতলতাতে তাঁহার প্রাণ আপাততঃ ঠাণ্ডা হইল ; তাই এত ভাবের উচ্ছ্বাস, তাই এত প্রেমের মত্ততা। পণ্ডিত এখন নূতন চক্ষে সন্তোষিণীকে দেখিবেন, নবানুরাগের সহিত পূর্ব্বের কথা শুনিবেন, নব ভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবেন, কি নিঃসঙ্করে প্রেমবিজ্ঞানের নব নব তত্ত্ব অধ্যয়ন আলোচনা করিবেন তাহা আর বুঝিতে পারিলেন না। দুই দিক হইতে দুইটী প্রবল প্রেলোভন তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বাহিরে বর্শনশাস্ত্র ভিতরে বিজ্ঞানতত্ত্ব। তাই তাঁর জন্মসমুদ্রে

আজ এত তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উথলিত হইয়া সারি গাঁবিয়া চলিতেছে। বেন এক অতলস্পর্শ পতীর প্রস্রবণ হইতে ভাবরস উৎসারিত হইতেছে। ভারি আনন্দ। বড়ই উল্লাস। এক্ষণে জ্ঞানী ভাবুক হইলেন, বৈদ্যাস্তিক মায়াবাদী পৌরানিক প্রেমিক হইলেন, সর্বভ্যাগী বৈরাগী পারিবারিক সুখের আস্থা পাইলেন।

আর সন্তোষিণী ? তাঁর মনের ভাব এখন কিরূপ ? কেবল মুহু মুহু হাসি, আশাবিকসিত প্রাণভরা হাসি। মুখে বেশী কথা নাই, বাহ্যচাক-ল্যের কোন চিহ্ন নাই, আপনাকে জীবনবল্লভের হাতে সমর্পণ করিয়া একবারে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আর প্রেমের বিবিধ রঙ্গ দেখিতেছেন। তিনি যে বনবিহঙ্গের বিচিত্র শোভা দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য এত দিন বনে বনে ফিরিয়াছিলেন, তাহাকে এখন তিনি শিঙুরে বাধিয়া কেলিয়াছেন। আর সে উড়িয়া বাইতে চাহে না; নদীর অলে বনের ফলে, প্রমুগ্ন আকাশের মুগ্ন বায়ুতে আর তাহার বাসনা নাই। একা নির্জন গৃহে বসিয়া আর সে পুস্তক পড়িতেও ইচ্ছা করে না।

উপভ্রাসের উদ্দেশ্য প্রেমের উৎপাদন এবং নায়ক নায়িকার মিলন; কিন্তু আমাদের এ উপভ্রাস সেরূপ নহে। এত অণ পরে মোহপরল উৎপত্তি হইল, ইহাকে মন্থন করিয়া অমৃতে পরিণত করিতে হইবে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞান সামঞ্জস্য ।

সর্বসংশয়ী চিত্ত বাহ্যারাম এত দিন যে ভ্রান্ত প্রণালীতে জ্ঞানানুশীলন করিতেন তাহা দ্বারা কখন এক দিক কখন অন্য দিকের উন্নতি হইত ; এক্ষণে প্রেমপ্রভাবে তাঁহার জীবনের সমস্ত অংশের বিকাশ এবং সামঞ্জস্য হইল। তাই এত আনন্দ । বাদ্যযন্ত্র যতক্ষণ তান লয় বিশুদ্ধ না হয় তত ক্ষণ তাহার সুর কানে ভাল লাগে না, ষাট সমস্ত তারগুলি সুরে সুরে মিলিয়া যায় অমনি শ্রাণ আফ্লাদিত হয় ; মনোরাজ্যের বৃদ্ধি সমুদায় তদ্রূপ । বাহ্যারামের জীবনবীণা এখন মধুর স্বরে বাজিতে লাগিল ।

যত দিন মনুষ্যমানে জ্ঞানের উন্নতি অধিক থাকে তত দিন একটার সঙ্গে আর একটার জমাট বাঁধে না । কেন না উত্তাপের ধর্ম্য বিয়োগ ; ইহাতে ঘনীভূত পদার্থ তরল হয়, অথবা ঋণ ঋণ হইয়া যায়। সগুণ নিগুণে পরিণত হয়, সে সময় ধরিবার ছুঁইবার আর কিছু থাকে না ; সমস্তই আকাশ, সকলই নিরাকার, অবিশেষ । তখনস্তর প্রেম ভক্তির রস সঞ্চারিত হইলে উন্নতি ও শৈত্যের সামঞ্জস্য হয় । তখন প্রেম নিগুণকে সগুণ, সাধারণকে বিশেষ, সূক্ষ্মকে সূক্ষ্ম স্পর্শনীয় এবং তরলকে ঘনীভূত করে । বাহ্যারাম এখন শক্তির বিস্তীর্ণ অসীম রাজ্য হইতে ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলেন, নিগুণ নিরাকার তত্ত্ব ছাড়িয়া সগুণ পুরুষের চরণ ধারণ করিলেন । বিজ্ঞানস্রগতে একতা দেখিবার জন্যই তাঁহার আত্মা এত দিন ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু ভাবরসের অভাব হেতু একটার সঙ্গে আর একটার যোগ সম্পাদন করিতে পারে নাই, সুতরাং সর্বাবস্থায় সম্পন্ন পূর্ণ সত্য আংশিক বিজ্ঞানালোকের সম্মুখে কিরূপে প্রকাশিত হইবে ? ভাবময়ী রসদায়িনী সন্তোষিণী হইতে সে অভাব এখন পূর্ণ হইল । পূর্বের মতামত সকল পরিবর্তিত হইয়া গেল । ইচ্ছা প্রীতি জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সমতা সাধন করিল ।

বসন্তপুর গ্রামে বকেশ্বর এবং মকেশ্বর মিত্র নামে দুই ভাই বাস করিতেন। বকেশ্বর মাথাপাগলা রকমের গোঁড়া হিন্দু আর মকেশ্বর সেকলে শিক্ষিত সিনিয়র স্কলার। বকেশ্বর বকিয়া বকিয়া আচার বিচার করিয়া খেব পাগল হইয়া মরিয়া যায়। মাসের মধ্যে পনের দিন তার আহার হইত না। নির্বোধ অন্ধবিশ্বাসী হইয়া আল চাল কাঁচা কলা খাইয়া উপবাস করিয়া করিয়া তাহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। কেহ কখনো তাহার মুখে হাসি দেখে নাই। কেবল বকিত আর লোককে গালি দিত। মকেশ্বর ইহার বিপরীত। তিনি সংশয়বাদ স্থলের ছাত্র। পড়িয়া পড়িয়া এক্ষণে তাঁহার দুইটি চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বয়ঃক্রমও প্রায় আশির উপর হইবে। পূর্বে ইহার সঙ্গে বাহ্যারামের অনেক সময় বিজ্ঞানবিষয়ে কথোপকথন হইত, ভাবে ক্রটিতে জ্ঞানবিচারে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সজ্জয়তা ছিল। মকেশ্বর বহু শাস্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, রোম গ্রীশ ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস সকল তাঁর মুখস্থ বলিলেই হয়।

বাহ্যারামের হৃদয় যখন প্রেমসম্প্রতিষিদ্ধ হইল, এবং তদ্বারা জ্ঞানের বিকার ছুটিয়া গেল, তখন তিনি মকেশ্বরের সঙ্গে যাতায়াত বন্ধ করিলেন। অনেক দিন তাঁহার দর্শন না পাইয়া মিজ্জার মনে বড় কোহুল জন্মিল। অন্য কাহারো সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি সুখ পান না। এক দিন লাঠী ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহ্যারামের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। “কি হে নাতি, আর দেখা পাই না কেন, ভুলে গেলে নাকি? এই দেখ তোমার জন্য আমি পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পড়া শুনার চর্চা চলিতেছে ত? আমিও অন্ধ মানুষ, এখন তোমার উপরেই আমার ভরসা। নূতন পুস্তকাদি আর কিছু বাহির হইয়াছে কি সংবাদ রাখ?”

বাহ্যারাম যেন একটু ঠাণ্ডা, কণ্ঠ উত্তর দিলেন, কিন্তু নিতান্ত কর্তব্যানুরোধে। “কৈ নূতন পুস্তকাদি আর দেখি নাই। আপনি আবার এত কষ্ট করিয়া কেন আসিলেন? ডাকিয় পাঠাইলেই ত হইত।

• তাঁহার কথার শূন্য এবং ভাবে মকেশ্বর বৃদ্ধিলেন, এ লোক সে লোক নয়। বস্তুতঃ ও তাই বটে। এখন বাহ্যারামের জ্ঞানের ক্রটিও পরি-

বর্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি যোগ ভক্তি বৈরাগ্য বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুরাগী হইয়া গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ট এবং প্রাচীন পুরাণাদি অধ্যয়নে মন দিয়াছেন। এই সকলই এখন তাঁর খুব ভাল লাগে। মিত্র মহাশয়কে অস্পষ্ট সুরে বলিলেন, “আমি আর বিদেশীয় তত্ত্ব শাস্ত্র বড় পড়ি না, কেবল বাইবেল মাঝে মাঝে দেখি, আর প্রাচীন আৰ্য্যদিগের যোগ ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের ঋষিরা বড় চিন্তাশীল গভীরদর্শী লোক ছিলেন।”

মিত্রকার জ্ঞানচর্চার প্রভাবে চর্মচক্ষু অন্ধ হইয়াছিল কেবল তাহা নহে, অন্তর্চক্ষুও ভিতরে কেবল আঁধার দেখিত। বাহ্যরাম পূর্বে যে অনিশ্চয় সংশয় জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন ইনি এখন ঠিক তাহাই আছেন। জীবনে সুখ শান্তি কিছু নাই, কেবল সুখের মধ্যে জ্ঞানাভিমান। একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, “তোমাদের মত চকলমতি যুবার এই দশা তা জানাই আছে। এত কাল পরে গাঁজাখোর ঋষিদিগের কল্পনারহস্য তোমার মন মজিল? হায় হায় হায়! এতে তোমার বুদ্ধি কি চরিতার্থ হইয়াছে?”

বাহ্যরাম। আজ্ঞে বুদ্ধি চরিতার্থ হোক না হোক প্রাণে বড় আরাম শান্তি সম্ভোগ করিতেছি। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের আলোচনাতেও আমি আমার মনকে এত দিন নিঃসংশয় করিতে পারি নাই, কেবল আঁধার টিল ছুড়িতাম। ভক্তিমিশ্র জ্ঞান বড় মিষ্ট এবং শান্তিপ্রদ। সামঞ্জস্য প্রকৃত জ্ঞান। একটি হরিভক্ত ব্রাহ্মবন্ধু “ব্রহ্মগীতোপনিষৎ” নামক দুই খণ্ড গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন তাহা পাঠে আমি বড় সাহায্য পাইয়াছি। তাহাতে যে সকল সাধনতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, অতি পরিষ্কার, যেন স্বর্গের সোপান।

মকেশ্বর গর্ভিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন, “স্বর্গ আবার তুমি ইহার মধ্যে কোথায় পাইলে? কি ভ্রান্তি! একবারে তবে গেছ বল! এ কালের এম, এ, বি, এ, তোমরা, নিতান্ত যেন এডুকেটেড বোর। ছি! বড় অপদার্থ। এই জন্য আমি এ সকল লোকের সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। তোমাকে একটু বুদ্ধিমান বলে জ্ঞান ছিল, তাও এখন দেখছি সব ভুল।

বাহারাম। কেবল নেগেটিভ জ্ঞান আর সংশয় লইয়া কি প্রাণ বাচে ?

মকেবর। তাহারই অন্য একটা কল্পনার পরসেবা করিতে হইবে না কি ? কি বিপদ ! তুমি যে নিহাত মূর্খের মত কথা কহিতেছ দেখি । একটা লোকও লেখা পড়া জানে না গা, কি আশ্চর্য্য । অবচ বেডেল খুলিয়ে, হড্ পরে, টাইটেল্ নিয়ে জাঁক করে বেড়ায় ।

বাহারাম। জীবন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যখন নিশ্চয় আসন্ন সম্ভোগ করিতেছি তখন আর কল্পনা কিরূপে বলিবেন ? জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানময়কে অধ্যয়ন করা বড় মূর্খের বিষয় ।

মকেবর এক কথা শুনিয়া একবারে কোণে অভিযানে অগ্নি অবতারণ হইলেন । “কি ! আমার সঙ্গে পরিহাস !” একে কানা মানুষ, তাহাতে প্রাচীন বয়স, অধিকতর জ্ঞানগর্ভ, অবিখ্যাসাতিমান, তিনি চটিয়া ঠুনিড্ কুল সেল্‌ক্‌উলিউডেড্ ইত্যাদি কটু বচনে বাহারামকে তিরস্কার করিলেন এবং রাগভরে লাঠী ঠক ঠক করিতে করিতে ক্ষতপথে গৃহাভিমুখে চলিলেন । ক্রোধাক্ত কানা মানুষ চলিতে পারিবে কেন ? দরজার চৌকাঠে ঠেকিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া গেলেন । এমনি পড়িলেন যে একেবারে মৃতপ্রায় অচেতন । তখন বাহারাম তাড়াতাড়ি ধরিয়া ভুলিলেন, চখে মুখে জল দিলেন, বাতাস করিতে লাগিলেন । পাড়াপ্রতিবাসীরা চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল । নাড়ীর পতি অতি ক্ষীণ, আন্তে আন্তে এক একটু কথা বাহির হইতেছে, জ্ঞান বিহ্বা বৃন্দ বিলোপ হইয়া গিয়াছে । বাহারাম অিজ্জাসা করিলেন, “ঠাকুরবাধা, এখন কি মনে হইতেছে ?”

মকেবর। আর ভাই মলাম, বড় কষ্ট, প্রাণ হাঁপ হাঁপ করিতেছে, কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছি না, সব অন্ধকার, সমস্ত অকূল পাথর । আমি কোথায় ঘাচি বলিতে পার ? আমার স্ত্রী পরিবার সব কোথায় ? উঃ বড় কষ্ট । কেবল অন্ধকার ! যেন অনন্ত অন্ধকারময় মহাসমুদ্রে ডুবিয়া বাইতেছি ।

বাহারাম। অন্ধকারের ভিতরে ষোড়শবিধ সত্য পুঙ্খ আছেন বিশ্বাস ভক্তির সহিত তাঁহাকেই দেখুন ।

মকেশ্বর। আর ভাই দেখা শুনা। সব ফাঁকি, কেবল কষ্ট আর অধার। যেন কয়লায় খনির মধ্যে নামিতেছি। যমের বাড়ী যাইবার পথে কি ছাই একটা প্রদীপ নাই! যাক, বাঁচা গেল, বোকা ধার্মিক ব্যাটার। মরণের তর দেখাইয়া ভজাইতে আসিত। এইত মরছি! এনাইহিলে-সন্ট। মন্দই বা কি! পরকাল নাই বা রৈল? ইহকালই কাটে না, আবার পরকাল!

বাহুরাম বৃদ্ধের হৃদশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, “ভাগ্যে ভগবান আমার উপর কৃপা করিয়াছিলেন, নৈলে আমারও এই দশা ঘটত।” অনন্তর তিনি বলিলেন, ঠাকুরদাদা, “ভবকর্ণবার দয়াল শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকুন। তিনি বড় পতিতপাবন দয়াময়। ঐ অন্ধকারের ভিতরেই তিনি লুকাইয়া আছেন।” বাহুরাম এই কথা শুনি এমনি ভক্তি বিশ্বাসের দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, যে তাহা শ্রবণে পাবাশ জন্ম গলিয়া যায়। মকে-শ্বরের কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি সহজেই পত্তর ন্যায় নিশ্চন্দ হইলেন।

মকেশ্বরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে বাহুরাম অনেক শিক্ষা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি ভগবদ্ভিষ্ঠা বাড়িল, ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল। নাস্তিক মরিবার সময়েও যে নাস্তিক থাকিতে পারে ইহাও তিনি দেখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বৈরাগ্যোদয় ।

মিত্রজার এই অপবাত মৃত্যু সংশয়াত্মা ভগবন্তভিহীন অবিবাসী-দ্বিগের পক্ষে একটি বড় ভয়ঙ্কর শিক্ষা। বাহুরামের মনপ্রেমের মত্ততার উপর ইহা এক প্রবলতর বৈরাগ্যাবাত। তিনি এমনি জাগ্রত হইয়া উঠিলেন যে শববাহকদ্বিগের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে আশানবাট পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

রতনী অঙ্ককারময়ী, মেঘশূন্য আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ কলমল করিতেছে; দুই ধারে বিস্তৃত শুভ্র সৈকত ভূমি, মধ্যে নীলকান্তি নীর্থল তটিনী প্রবাহ শুমন্ম বায়ু তাড়নে অনন্ত ক্ষুদ্র বিচিমালা উখিত করিয়া কুল কুল নাদে চলিয়া বাইতেছে, তত্পরি তলতলগণ এক এক বার মাথা তুলিয়া দেখিতেছে আবার ডুবিতেছে। অতি ভীষণ রমণীয় স্থান। তারকা-মালা ষচিত স্থনীল গগনের ছবি ধানি তাগীরথীর বহু নীরে পতিত হইয়া তরঙ্গভঙ্গের সহিত যেন নৃত্য করিতেছিল। নক্ষত্রালোকে তটস্থ রজতময় বালুকাবাশি মৃদুমৃদু দীপ্তি পাঠতেছিল। মাঝে মাঝে তলহংসের কলরবে শাশানের নীরব আকাশ ধ্বনিত হইতেছিল। কখন বা দুই এক ধানি নৌকা পাল তুলিয়া বাইতেছিল এবং তাহার নাবিকদিগের সম্মুখবৎ কর্ণে আসিতেছিল।

বাহ্যারাম বাটে গিয়া দেখিলেন, দ্বিগন্তবালী অঙ্ককার মধ্যে ধূম্ব করিয়া একটা চিত্তানল জলিতেছে, তাহা হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিদূলিক উড়িয়া পড়িতেছে, শবভোজী স্থল কলবর কুহুরে। ধলে ধলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাটের চারিদিকে ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাছ, ফাটা বালিস, পোড়া কাঠ, সর। কলসী, মড়ার মাথা ও অস্থিপত্রের উত্পত্ত: বিক্ষিপ্ত; তাহার মধ্যে এক ভীষণাকৃতি পুরুষ মাথায় গামছা বাধিয়া, হাতে প্রকাণ্ড এক বংশদণ্ড লইয়া সবলে শবের নশ্তক এবং চপ্ত পেষের অস্থি-গ্রন্থি চূর্ণ করিতেছে। অদূরে জন কয়েক লোক বসিয়া হাসিতেছে, তামাকু খাইতেছে, গান গাইতেছে, অটপ্পা করিতেছে, আর প্রাণে আহ্বারাদির ব্যবস্থাটা ক্রিপ প হইবে তাহা ভাবিতেছে। মাঝে মাঝে ভৈরব গর্জনে “হরি হরি বল! হরি বোল!” বলিয়া চৌংকার করিয়া উঠিতেছে। সে লোমহর্ষণ ভীষণ হরিধ্বনি শ্রবণে বাহ্যারামের প্রাণ কাঁপিল, অস্থ সিহরিল, শবদাহর বিভৎস দৃশ্য দর্শনে চিত্ত চমকিত হইল। পরে তিনি ভুলিলেন, দূর হইতে পবনবিম্বোলে ভাসিতে ভাসিতে নারীকণ্ঠবিনিঃসৃত করুন শবের এইরূপ রোহনধ্বনি আসিতেছে;—
“আমার ফেলে তুমি কোথায় চলে গেলে গো মা! আমি কোথায় বাব, কি করিব মা গো মা! তোমায় ছেড়ে একা আমি কেমন করে যব যাব

গো মা !” জলপ্রোভের মুহূ কল নাহ, বাতাসের স্বন্ স্বন্ ধ্বনি, তৎসঙ্গে ঘোর নিরাশবাক্তক এই শোকের ক্রন্দন রব এমনি এক প্রকার মর্যাদাসিক কাতরতা ব্যক্ত করিতেছিল যে, তাহা শ্রবণে শ্রাণ একেবারে উদ্বাস হইয়া যায়। বাহ্যারাম এখানে বাহা দেখিলেন, এবং বাহা ভুলিলেন তাহাতে তাঁহার নবীন শ্বেমানুরাগের সঙ্গে প্রচণ্ড বৈরাগ্যানল জলিয়া উঠিল।

শব্দহনকারী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দর্শনে মনুষ্যস্বভাব যে কত দূর অস্বাভাবিক, বিকৃত হইতে পারে তাহা বাহ্যারাম বুদ্ধিতে পারিলেন। তাহার শ্রমশানে শবের পার্শ্বে বসিয়া মদ্য পান করিতে করিতে বৃথা সঙ্গীত গাইতেছিল। পরে আনিলেন তাহার মদ্যের লোভেই এই কাজ করিয়া থাকে। আর এক স্থানে জলের ধারে দেখিলেন, একটা প্রাচীনা মুমূর্ প্রায় স্ত্রীলোককে বালির উপর শোয়াইয়া তাহার আধ খানা শরীর জলে ডুবাইয়া কয় জন লোক বিকট স্বরে “ও গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মরামঃ” বলিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। বাহ্যারাম কৌতূহলী হইয়া তাহাবিগকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন হাসিয়া উত্তর দিল, “জান না, পাট করা যাচ্ছে !” অর্থাৎ অন্তর্জাল করিয়া বুড়ীকে শীঘ্র সমালয় প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে। শ্রমশান ভূমি দর্শনে পৃথিবী অসার অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, আবার ইহা-দের পৈশাচিক ব্যবহার দর্শনে নরজাতির প্রতি ঘৃণা জন্মে।

তখনস্তর মিত্র মহাশয়ের মৃতদেহের সংকারের আরোজন হইতে লাগিল। বাহকবিশেষের সঙ্গে এক জন ঠোটকাটা অকাল কুন্ডল গোছের লোক ছিল, যুগ্মধির সময় সে বলিল, “ও ভায়া, ঠাকুরদাদার মুখে শুধু আগুন কেন দিচ্ছ, একটা চুরটে আগুন ধরাইয়া দাও।” এ দলের ভিতরেও আমোদ আফ্লাদ হাস্য কৌতুক, মদ্য পান তামাক সেবনের ক্রটি হয় নাই। কোমল তমু ভক্তসন্তানেরাত এ সব কাজ আজ কাল পারিয়া উঠেন না, কাজেই গুলিখোর মাতাল প্রভৃতি যথা গোছের লোকের দরকার হয়। সে কাল আর নাই, যে কেহ শব্দহনকে সংকার্য্য মনে করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে। মিত্রজার সন্তানাবি ছিল না, কয়েকটা ভাতুপুত্র ছিল, তাহার বিবয় বর্চনের কাজে ব্যস্ত থাকায় ঘাটে ঘাইতে পায় নাই।

মকেশ্বরের মৃতদেহ সংকার সম্বন্ধে পরে গ্রামের মধ্যে একটা কথা

উঠে যে কিছুতেই তাঁহার শরীরটা পড়িল না। এক গাছি লোমেও আগুন ধরিল না। যত কাঠ চাপায় ততই রাশি রাশি ধোঁয়া বাহির হয়, কোন মতেই আর জ্বলে না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় শবের পেটটা ফুলিরা ঢাক হইল, মুক খান বিকট বিভীষণ মূর্তি ধারণ করিল, চক্ষুর তারা ছুইটা প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া রহিল। শেষ ধোঁয়াটে আগুনে সর্ব শরীর এমন কাল ভূত হইয়া উঠিল যে ভয়ে সে দিকে আর তাকাইতে পারা যায় না। অবিশ্বাসীরা কষ্টের মুহূর্ত্ত, মুখ খানি আগুনেই কেমন একটা বেয়াড়া রকম হইয়াছিল, তার পর আগুনের ধোঁয়ায় কালী মূর্তিতে একবারে রাক্ষসের মত হইয়া দাঁড়ায়। সে দিন বারটা ছিল শনি, তিথিতেও ছিল অমাবস্যা ত্রয়স্পর্শ। দাহকারিগণ মনে গাঁজার ভোঁ হইয়া ঐ মূর্ত্তি ঘরন দেখিলেন, তখন স্থির করিলেন ইহাকে নিশ্চয় ভূতে পাঠরাছে। কেহ বলিলেন, “ঐ দেব, দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।” কেহ দেখিলেন, মিত্রজা বাঁ পাটা উপরের দিকে আস্তে আস্তে তুলিতেছে। কেহ বলিল, “ঐ দেব দেব! উঃ নুকে ভাল ঝুকিতেছে! চল ভাই এই বেলা পালাই।” দলের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, “মকেধর বাবু নাস্তিক ছিল, দেবতা বামন মানিত না, তাই চিলু জ্বলিতেছে না।” নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিতেছে, কেহ হাস্যমোক্ষ করিতেছে, কেহ বলিতেছে “বাটাকে ভূতেই পাউক, আর ব্রহ্মহত্যাকেই ধনুক, আমবাত পেট ভরে আজ মজ বাই।” “ওহে ভাই, মস্তির আর শরীর যদি নাই পোড়ে, তবে এস আংগোড়া মাংস খানিক নিয়ে মদের চাটনি করা থাকু।” এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, হঠাৎ শবদেহের পায়ের দিকের কাঠ-গুল ধমিয়া পড়িল, আর অমনি তৎক্ষণাৎ মাথাটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিল। বাই শব মাথা চাড়া ধরাছে, অমনি সকলে ভয়ে হাট মাউ চাউ করিতে করিতে ধে ছুট! “ভূতে ধরলেই পালা! পালা! পালা! রাম রাম রাম!” কেউ হঁকাহাতে, কেউবা গাষকাঁধে ছুটিতেছে; দৌড়িতে দৌড়িতে কাহারো কাছটা ফুলিয়া গেল, কাহারো পায়ের হোঁচোট লাগিল, কাহারো টিকি কাঁটার কোপে জড়াইল। মাঝে! মাঝে! মলামরে! ভয়ে গলা শুকিয়ে, পা থেমে, পৌ পৌ শব্দে দৌড়! দৌড়িতে

ছোড়িতে এক জন আপবে গিয়া বাড়ি মুড় ভাঙ্গিয়া গর্তে পড়িয়া মরিল, অন্য এক জন আবার তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। গর্তেপতিত ব্যক্তি ভাবিল, এই রে এই বার বুঝি আমাকে ভুতে ধরিয়াকে। ছাড়! ছাড়! ছাড়! আর ছাড়, হুইটাতে জড়ামড়ি ছড়াছড়ি মারামারি ঘনটা ঘনটা, ভয়ে কেহ কাহাকে ছাড়িতে চাহে না। আঁধার রাতে গর্তের মধ্যে উভয়েই মনে করিতেছে, আমি ভুতের হাতে পড়িয়াছি। শেষ দেখে যে সেটা ভুত নয়, সন্দের এক জন ইয়ার, তখন হাসিয়া মরে আর দোড়ায়। এইরূপে উদ্ধাধাসে সকলে পলাইয়া গেল, মৃত দেহ সংকারের যাহা অবশিষ্ট ছিল, স্থানবাসী মিউনিসিপাল করপোরেসেনের সভ্য শৃগল কুকুরেরা ধরা করিয়া তাহা সমাধা করিল। সকলে মিলিয়া তাহার। সেই অর্ধ দণ্ড দেহকে উদরে স্থান দিল।

আসল কথাটা ভুতে পাওয়া টাওয়া কিছু নয়, সব মিথ্যা, দাহকারীরা নেশার খোঁকে কাঠ কিনিতে গিয়াছিল, কাষ্ঠবিক্রেতা সুযোগ ছাড়িবে কেন? স্বত রাজ্যের কাঁচা কাঠচালাইয়া দিয়াছে, কাজেই ঘোঁরা হবে নাও কি হবে? শেষ গ্রামে প্রচার করিয়া দিল যে মিত্রজাকে ত্রয়স্পর্শে পাইয়াছে।

বাগ্ধারাম এ সকল ভুতের খেলা দেখেন নাই, তিনি স্থানবাসীদের অদূরে এক বালির চড়ার উপর বসিয়া জীবনের অসারতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সন্তোষিনীর প্রতি নবোজ্জ্বলিত প্রেমতরঙ্গ তখন এই প্রচণ্ড বৈরাগ্যের প্রভূত ঝঞ্ঝা বায়ুতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পৃষ্ঠাই তিনি অনুভব করিলেন, হরি ভিন্ন সকলই মিথ্যা। সমস্তই মায়ার খেলা। যে স্থানে কাঁদে, সেই আবার কণ কাল পরে বাড়ী গিয়া হাসে। জগৎ সংসার শূন্য দেখিয়া, নিরাশ্রয় হইয়া অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে তিনি পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ হরির চরণে আশ্রয় সমর্পণ করিলেন। দৃঢ় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে জ্বরে ধরিলেন। মিত্রজার মৃত্যু এবং স্থানবাসীর দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে এমনি বৈরাগ্য জন্মিল, যে তিনি বাড়ী আসিয়া মাথা মুড়াইলেন, বাড়ি গোঁকত কামানো অভ্যাসই ছিল, এবার চকের ড্র এবং পাতার লোম পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া কেলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ভক্তিবিকাশ ।

প্রথম বয়সে বাহ্যারাম প্রকৃতির শোভা দেখিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাহার ভিতর কোন পুরুষকে দেখিতে পাইতেন না। ব্যক্তিত্ববিহীন এক সর্বব্যাপী নিগূর্ণ শক্তি মাত্র অনুভব করিতেন। মানব প্রকৃতির মধ্যেও সেই নিগূর্ণ শক্তির মায়ায়ই ক্রিয়া দেখিতেন। পরে যখন শুভ কালে সন্তোষবীর প্রেমপৌষ বসে জ্বর বিপ্লিত হইল, তখন সেই প্রেমের মধ্যে এক জন অবিভার্য্য সগুণ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সে ব্যক্তি মিষ্ট মিষ্ট কথা কয়, তাঁহার সুখ শাস্তি আনন্দ বর্জনের জন্য চেষ্টা করে, তাঁহার অন্য ব্যাকুল হইয়া তাবে, কত একারে ভালবাসে। এ সকল কাণ্ড কি অন্ধ শক্তিপ্রসূত আকর্ষক ? এই প্রশ্ন মনে উঠিল। তখন সেই প্রেমের মিষ্টতার ভিতরে প্রেমময় পরম পুরুষের স্পষ্ট আবির্ভাব তিনি দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ মধুময় জ্বরানন্দকর প্রেম নিগূর্ণ শক্তি বা জড় পরমাণুর কল নয়, অদৃষ্ট চক্রে বা পঞ্চভূতের বড়বস্তু নয়, এক জন সুবাসক সুনিপুন সুন্দর মহাজ্ঞানী পুরুষ ইহার ভিতরে আছেন। ভিতরে লুকাইয়া তিনি বহুবিধ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। অতাবতঃ আপনি এই জ্ঞান জমিল। তখন আপনাকেও স্বত্ত্ব এক জন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাসহস্তে ধরিতে পারিলেন। জগতের অন্তরালে প্রত্যেক ঘটনার এক লীলাময় পরম পুরুষের বিবাকৃত ক্রিয়া যখন তিনি এইরূপে ধর্শন করিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত স্বাভাবিক জগৎ চরাচর বিধ পণ্ড ও মানব এক অবি-
নব সুন্দর মূর্তি পরিগ্রহ করিল। উদ্যানে বৃক্ষকূলে নানা বিধ ফুল ফুটিয়া
বাহ্যে, তাহা দেখিয়া বাহ্যারাম মনে করিলেন, সেই অনন্ত গুণাকর দ্বিবা
পুরুষ ফুল ফুটাইয়া ডালি সাঝাইয়া ফুলের হাসিতে হাসি এবং গন্ধে সুগন্ধ
মিশাইয়া আপনি স্বয়ং হাসিতেছেন। জ্বরে এতই তাব রস উচ্ছৃঙ্খিত

হইয়াছে যে তিনি বুকের খাণ্ডা ফুল ফল পক্ষী প্রকাপতি মক্ষিক! ভ্রমর এবং সমীরণের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “কি হে তোমরা কেমন আছ? আমাকে দেখিয়া হাসিতেছ কেন? হে নবীন তরু সখে! আমার আফ্লাদে আফ্লাদিত হইয়া কি তুমি নাচিতেছ? এস এস, আজ তোমাদের সকলকে আমি আলিঙ্গন করি। তোমরা আমার শৈশবের বন্ধু, নিরুজ্জ্বলের সখা। ভগ্নী মাধবী, হৃৎখী ভাতার মুখে তোমরা কি আজ বড় সুখী হইয়াছ?” বসন্তের মধু মাকড় হিল্লোলে পুলকিত চিত্র হইয়া তিনি ভাবিতেন, সেই পুরুষ আমার অঙ্গে চামর বাজন করিতেছেন। শীতল জলে অবগাহন করিয়া শরীর বধন স্নিগ্ধ বোধ হইত, তখন বিখাস করিতেন সেই পরম পুরুষ জননী বেশে আমাকে কোলে লইয়া আমার তাপিত অঙ্গ জুড়াইলেন। জলের শীতলতা আর কিছুই নয়, সেই মায়ের স্নেহবিগলিত অমৃত রস। আকাশেশ্ব চাঁদের সহাস্য বদনে মায়ের স্নেহহৃৎ, পক্ষী-দ্বিগের সঙ্গীত রবে মায়ের কীতি সযোজন, সৌদামিনী শোভিত মেঘমালায় সৌন্দর্য্যে মায়ের মুখের হাস্যহাস্য; আবার বজ্রের গভীর নির্দোষে, নদীর ভীষণ জল কল্লোলে, প্রবল প্রভঞ্জন প্রচণ্ড তেজে সেই জননীর হৃর্জ্জ্বল পরাক্রম প্রকাশিত; এইরূপে তিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যসমাজ গৃহাশ্রম পরিবার, শস্যক্ষেত্র, বিপনীশ্রেণী বাণিজ্যাগার সর্বত্র সেই এক ত্র্যম্বকব্যাপিনী মহালক্ষ্মীর প্রসন্ন মূর্তি তাঁহার দ্বিবাঞ্ছান-নেত্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়া এখন যেন মায়ের কোল পাইয়া কৃতার্থ হইল। সমস্ত আকাশ, সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন সেই জননীর অনন্ত বিস্তৃত প্রেম কোল। বাহ্যারাম এখন আর তিলার্দ্ধ কালের জন্য মাতৃকোল ছাড়া রহিলেন না। ভোজন করিতে বলেন, হুই চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। তখন স্পষ্টই বোধিতে পান, যা অন্নপূর্ণা বহুশ্রেণী মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন। সুপক ফল ভোজন করেন, দেখেন তাহার ভিতরে মাতৃস্নেহ পরিপূর্ণ। দাস দাসীদ্বিগের সেবার ভিতরে কেবল সেই বহুবিধ চৈতন্যময়ী মায়ের আবির্ভাব। রন্ধন-শালায়, ভাণ্ডার গৃহে, শয়ন মন্দিরে যথা তথা মা লক্ষ্মী বিরাজিত।

বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবেন, আমি হাতের খীতল কোলে শয়ন করিলাম। বহু বাক্য অপর লোকের ভালবাসা স্নেহ সমভাৱ ভিতরে স্পষ্ট দেখিতেন সেই পরম পুরুষ প্রাণসখা হইয়া মানবদেহে লুকাইয়া রহিয়াছেন। শরীরের রক্ত সঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাস্থ্য মৌল্য এবং ইন্দ্রিয়পথের ক্রিয়ার মূলে সেই দেবতাকে ব্রহ্মী এবং শক্তি-রূপে দেখিতে লাগিলেন। রাজার রাজত্বে, প্রভুর প্রভুত্বে, মহতের মহত্বে প্রত্যেক ঘটনায় সেই এক জনকেই দেখিতে পাইতেন। আর সন্তোষিনীর হাসিমাখা মুখ, মধুমাখা কথা, তাঁহার কৃত সেবা বহু আশ্রয় সমভাৱ ভিতর সাফাৎ মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি মহাদেবীকে দেখিয়া একবারে প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতারসে তিনি গলিয়া গেলেন। পূর্বে সর্লস্বানে সমস্ত ঘটনায় সকল লক্ষ্যের অভ্যন্তরে যেমন এক অনন্ত মহাশক্তি দর্শন করিতেন, এক্ষণে তেমনি প্রত্যেক বিষয়ে এক জন মঙ্গলসম্বন্ধ পরমজ্ঞানী পুরুষকে ব্যক্তিত্ব ভাবে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বিশ্বের বাবতীর ঘটনাপুঞ্জ সেট এক মণ্ডাবিল্লর সঙ্গে মিলাইয়া গইয়া বিজ্ঞান ও ভক্তি-নিপাতা চরিতার্থ করিলেন। এক জন ব্যক্তি সর্লক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় সহচর হইয়া আতেন এ জ্ঞানটী বড় উজ্জ্বল হইল। এ বিশ্বাস বড় শান্তিপ্রদ বিশ্বাস। যেখানে পূর্বে আপাতদৃষ্টিতে বিবাহ অসামঞ্জস্য বোধ হইত, এখন সেখানে গূঢ় মিলন দেখিতে পাউলেন। এক আদিপুরুষ হইতে সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতে সমুদায়ের অবস্থিতি, এবং তাঁহাতেই সমস্ত সৃষ্টির পুনর্দলন, এই মহাসত্য দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি স্তম্ভোস্তম্ভ অবস্থন করিলেন। এক বিন্দু গেম্বে মহাসিদ্ধ উন্মলিয়া উঠিল। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি তিনের সম্মিলনে মস্তিষ্কের বিকার, হৃদয়ের অন্ধতা সমস্ত চলিয়া গেল। অন্তঃপর বাঞ্ছারাম সেই অপূর্ন ভাবে বিস্তার হইয়া কিছু দিন সন্তোষিনীর সঙ্গে কেবল উজ্জ্ঞানের আলোচনা করিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গরলমস্থন ।

প্রায় ছই তিন বৎসর তীর্থ পর্য্যটনের পর সস্ত্রীক নিশানাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন । ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, নানা স্থানে নানা দেব-মূর্ত্তি দর্শন, পাণ্ডা ঠাকুরদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ এবং সতযাত্রীদিগের দৃষ্টান্তে উত্তরেই বেশ সাত্ত্বিক হিন্দুর আকার ধারণ করিয়াছেন । নিশানাথের পত্নী নয়নতারা দেবী বাটীতে প্রবেশ করিয়াই গৃহদ্বার প্রাক্তন অপরিষ্কার দেখিয়া একটু চটিলেন, তখনস্তর বাপের বাড়ীর যে ঘটিটী হাত পা ধুইবার জন্য সচরাচর ব্যবহার করিতেন তাহার দর্শনাভাবে নিতান্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হইলেন । তীর্থে গিয়া কত কত দ্বিভূজ চতুভূজ ষড়ভূজ ঠাকুর দেখিয়া আসিয়াছেন, সেজন্য কিছুই কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহাদের দর্শন-বিরহে কোথাও কান্দিতেও হয় নাই, কিন্তু এই ঘটি ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া চক্ষে জল আসিল ; সে জন্য কত বকিলেন, কত কান্দিলেন, কেহই সে গৃহ-দেবতার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না । পথে আসিবার কালে লেঙ্গা-ডোতে নামিতে উঠিতে বোধ হয় ঘটিটী কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল । নিশা-নাথ ভরে যড় সড় হইলেন, পাছে ঠাকুরাণীর রাগের ঝড় তুফানে পড়িয়া তাহার জীবনভরী বানচাল হয় এই ভাবনার তাঁর মূখ ধানি শুকাইয়া গেল ।

ঠাকুরাণী ঘরের ভিতরে গিয়া দেখেন, এ ঘরের সামগ্রী ও ঘরে, ও ঘরের সামগ্রী এ ঘরে বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত । বহুদিন অবসর পাইয়া ক্ষুদ্র মুখিক দম্পতী পুত্র পরিবারের সহিত শয়নাগারে গর্দির ভিতর বাসা করি-য়াছে, তাহারা বালিস ও তোষকের তুলা বাহির করিয়া দেখিয়াছে, ঘরময় তাহা ছড়াইয়াছে । জানালা দরজার উই ধরিয়াছে । ঘরের কোনে কোনে আরস্তলা ছুঁচোর বিষ্ঠা, বাজ্ঞ তোরঙ্গ আলমারী মাকড়শার জালে ও হুল্লার ঢাকা । রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, পুণ্ডন প্রিয় পাকা চুলাটী ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে, ভাণ্ডার গৃহে চাষিকার সঙ্গে প্রবেশ করা হুশাখ্য, হাঁড়ি কলসী কোনটা তখন, কোনটা অস্বহীন, শিল নোড়া ফুলা খুচনী ফুলকালী মাথা, যেকের ভিতরে বড় ইন্দুরেরা মাটী ভুলিয়া রাশীকৃত করিয়াছে।

এই সকল ছেঁষিয়া নয়নভারা মনে মনে বড় চটিলেন, পা ধোয়া আর হইল না, ধূলপায়ে নিজেই কাঁটা খরিলেন। এক হাতে কাঁটা এক হাতে অপের কলসী, আর মুখে বকুনি, ক্রোধভরে অস্থিরে বলে গৃহমার্জনা আরম্ভ করিলেন। কটিভটে অকল বহু করিয়া সম্মার্জনী হস্তে আরম্ভ-লোচনে যখন তিনি অবিভ্রান্ত বকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অপের উপর জল ঢালিয়া ঘর ঘর প্রাঙ্গনভূমি প্রাণিত করিয়া ফেলিলেন, তখন যথেষ্ট হইতে লাগিল যেন মহাকালী বসুন্ধরালী অহরমর্দনের অন্য বর্ণরঞ্জে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিতে বসিয়াছেন। ইহার দোহে তমঃপের উপাদান কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। সম্ভ্রামণী অগ্রে গৃহকাণ্ডে মাসীর অনেক সাহায্য করিত, ইহানো প্রায়ই অনামনত থাকিত বলিয়া বাড়ী ঘরের দশ। এইরূপ ঘটিয়াছে। কতী ঠাকুরাণী নিজেই বেলা একটা দুইটা পর্যন্ত যতবা খাটিলেন, ততবা বকিলেন। পরিভ্রমজন্য বত খরীর ক্রুট ও প্রান্ত হইতে লাগিল, মনও তত বিরক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সেই পরিমাণে যথেষ্ট হইতে অনর্গল দুঃখের কাহিনী বাহির হইল। দুই তিন বৎসর তীব্র পড়াটনে কত ব্যর্থ করিলেন, কত কষ্ট সহিলেন, দান দান প্রাণপণভোজন, শেষ দীর্ঘ সমস্ত পুণ্য তীর্থস্থানে ফিরিয়া গেল, যে সংসারী সেই সংসারী হইয়া পুনরায় তিনি ঘরকরার মন দিলেন।

বাহ্য হউক, প্রতিবাসিনী বিধবা সখবা বাহারা কখন বাড়ীর বাহির হয় নাই তাহার নয়নভারাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি কোন তীর্থই প্রায় বাকী রাখেন নাই, তৎসময়ে লোকের প্রশংসাবাদ শুনিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন। প্রসাদ মালা ফুলী হীরাবলী নামাবলী ফুঁড়কালী ভিলকমাটী জ্বের রজ কত কি সামগ্রী বিলাইলেন। কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁগা বলি, বুন্দাবন যথুঁরা কি গিয়াছিলে?” এবং তদ্বিষয় তখন নয়নভারা দেবী অতি বিনীত পত্নীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, “হ্যাঁগা বাহা,

তা বার ভাগ্যে থাকে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনের কৃপায় সব দেখে শুনে এসেছি।” অপর নারী জিজ্ঞাসা করিল, “বলি হ্যাগা, রাধাকৃষ্ণে নেয়েছিলে কি ? তার জল নাকি শুনেছি মিছরির পানার মত মিষ্ট ?” নয়নতারা বলিলেন, “ওগে, পাপ যুগে কি সে সব কথা বলিতে আছে ? বার ভাগ্যে থাক সব হয়েছে।” পরে তিনি বেখানে বাহা করিয়াছেন, দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, সমস্ত অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণন করিলেন। যেমন যান নাই, বাহা দেখেন নাই, বাহা করে নাই, তাহার বিষয়েও বলিলেন। সব কথা খুলিয়া না বলিলে হয়তো পেট কাঁপিয়া শীত্ৰই মারা পড়িতেন। তবু পাপ যুগে সে সব বলিতে নাই ! তীর্থভ্রমণের ফলের মধ্যে এই টুকু শেব দেখা গেল, বৈকালে মেয়েমহলে গল্পটা খুব জমিত।

বহু পক্ষীর স্বামীর উপর বড় একাধিপত্য। নিশানাথ বাবু মার্জিত বুদ্ধি জ্ঞানী হিন্দু এ কথার পরিচয় পূর্বেই সকলে পাইয়াছেন। যৌবনে তিনি একটু অত্যাচারী ছিলেন ; বেখানে সেখানে ঘাটতেন, যা তা খাইতেন, কাহাকেও মানিতেন না। নয়নতারা দেবীর চরিত্র তখন সম্রাট প্রফুটিত হয় নাই, কাজেই তিনি স্বামীকে বড় বাগ মানাইতে পারিতেন না। কিন্তু মনে মনে সে রাগটা ছিল, এক্ষণে তাহার পরিশোধ লইবার সময় উপস্থিত। নয়নতারা বাড়ী হইতে বাহির হইবার কালে নিশানাথকে প্রথমে বলিয়াছিল, “তুমি কেবল আমাকে সঙ্গে করিয়া সব দেখাইয়া আনিও, আর তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তুমিও আর এ সব কিছু মান টান না, আমিই সব করিব।” এই বলিয়াত সে তাঁকে পথে বাহির করিল, শেষ গরায় পৌঁছিয়া বলিয়া বসিল, “স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে না হইলে কোন কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় না।” এই বলিয়া সর্বাগ্রে সে নিশানাথের মাথা মুড়াইল, কাঁহাকে দিয়া গরালোর পা পূজা করাইল, বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেওয়াইল, নানা স্থানের পচা পুকুরে ডুগাইল, ছাই ভস্ম কত কি ধাওয়াইল। অবশেষে গলায় মালা পরাইয়া, নাকে তিলক লাগাইয়া, মাথায় টিকি ঝুলাইয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইয়া দিব্য করিয়া পাঞ্জির সংক্রান্তির ব্রাহ্মণের মত সাজাইল। হা নিশানাথ ! একি তোমার ধোয়ার ? স্ত্রী দেখিয়া যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে ! আর বে তোমাকে চিনিতে পারা যায় না ? হার হার হার !

শেষে ঠাকুরাণী তাঁহাকে বেখানে বাহা করিতে বলিয়াছেন নিশানাথ নিরাপত্তিতে তাহা করিয়াছেন । বৃদ্ধ বয়সে আতিচ্যুত হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়া, পরলোকে সঙ্গতির লোভ দেখাইয়া স্বামীকে তিনি হস্তগত করেন । “যেরে মরিয়া ফুলে ঢোল হইয়া পড়িয়া থাকিবে, প্রতিবাসীরা কেহ ছোঁবে না, শরীর পচে পক্ষ হবে, পোকা পড়িবে, চিল শকুনিতে চোকরাবে,” এ বলিলে কার না মনে ভয় হয় ? তীর্থযাত্রীর দল ও পাতা ঠাকুরেরা এ কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন । বশচক্রে তগবান্ ভূত । কুসংস্কারে অশিক্ষিতা বহুকিঙ্করী স্বরূপা স্ত্রীর পাম্রায় পড়িয়া নিশানাথ বিদ্যা বুদ্ধি হারাইলেন, ভায়ায় ন্যায় স্ত্রীর অশুগমন করিলেন । আর কিছু দিন এইরূপে সঙ্গে বেড়াইলে তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত মেয়ে মানুষ হইয়া বাইত ।

এই অবস্থায় তিনি বাড়ী আসিলেন । এখন বর্ষ অপেক্ষা সম্রাজের ভয়টাই তাঁর অধিক । পাছে মরিলে সজ্ঞানে পক্ষা না পান, যেরে মরিয়া পড়িয়া থাকেন, এই ভাবনাতেই প্রাণ আকুল হইত । ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যা আত্মিক পূজা হোম ত্রয় একাদশী অন্ত্যেষ্টমীর উপবাস করিতেন । পাছে কোন দেবতার ক্রোধ হয়, এই জন্য বস্তু মাকাল পকানন্দ ঘেঁটু মঙ্গলচণ্ডী ওলাদেবী শীতলা মনসা পীর প্যাগদ্বর বেখানে যত গ্রাম্য দেবতা ছিল সকলকেই পূজা দিতেন । নিত্যন্ত লেকেলে অন্ধবিবাসী স্ত্রী পুরুষেরাও বাহা মিথ্যা কুসংস্কার বলিয়া বহু পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাও তিনি মানিতে আরম্ভ করিলেন । পূর্বে যখন যখন কলিকাতার বেড়াইতে বাইতেন, তখন গোপনে কখনো পাঁটকুটী, কখনো হোটেলের তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিয়াছিলেন । সে সমস্ত মনে হইয়া আরও ভয় বাড়িল, কি আনি সে সকল কেহ টের পাইয়া যদি আতিচ্যুত করে এই ভাবনার মুডপ্রায় হইলেন । সময় বুঝিয়া অপদেবতার দল দেখা দিল । তখন ভূত ঐশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অশ্লিল, স্বভাববিরুদ্ধ যে কোন সাক্ষ্যবুরি কথা পুরাণে বর্ণিত আছে সমস্তই সত্য বলিয়া মানিতে লাগিলেন । অদৃষ্টের নিয়ামক গ্রহগণের তুষ্টির জন্য ঘোম্ স্বস্ত্যয়ন প্রায়ই করিতেন ।

• ঐশ্বরিগণের প্রণীত শাস্ত্র সমস্তই অজ্ঞাত, তাঁহারা যে বিধি দিয়াছেন তাহা নমস্তবিরোধী হইলেও তাহা অতিক্রম করা বাইতে পারে না, এই

সংস্কার তদ্বিধ। সংস্কৃত ভাষায় বাহা কিছু লিপিবদ্ধ আছে, সমস্তই তাঁর পক্ষে এখন শাস্ত্র ।

নিশানাথের এই সকল মতামত এবং আচার ব্যবহারের সহিত ভাগিনের বাহ্যারামের কিছু মতভেদ দাঁড়াইল। তিনি বিস্তৃত জ্ঞানের সহিত বিস্তৃত তত্ত্ব প্রেমের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন; আর ভাবুকতাও নাই, শুধু জ্ঞানমূলক নীরস কৃতর্কের ধর্ম। তিনি মানেন না, কাজেই তত্ত্ব কুসংস্কার কল্পনা উপলব্ধির সহিত কোন সহানুভূতি দেখাইতে পারিলেন না। মামা ভাগিনার সম্বন্ধটা পূর্বের মত আর তত মিষ্ট রহিল না। তদ্ব্যতিরিক্ত নিশানাথের অনুপস্থিতিতে বিষয় কার্যেরও কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। প্রজ্ঞা-ধের নিকট আদার পত্র রীতি মত হয় নাই, বাহা হইয়াছিল তাহারও পরি-কার হিসাব পাওয়া যায় না, বাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ঠিকে ভুল। বাহ্যারাম একে ভুলো লোক, এখন আরো কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন। আগে পড়া শুনার কত আঁট ছিল, এখন পুস্তক ছুঁইতেও চাহেন না। লাইব্রেরির ঘরে আলমারিতে যে সকল ভাল ভাল দামো বই ছিল তাহার কোনটার মলাট ছেঁড়া, কোনটার কতকগুলি পাতা নাই, কোল কোন বই একবারেই অন্তর্দীন হইয়াছে। নিশানাথ দেখিলেন, বাহ্যারাম যেন নিরুদ্ভা অলসের ন্যায় শিথিলচালাপন্ন। কোন কথা প্রজ্ঞাসা করিলে তাহার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। কর্মচারীরা অবসর পাইয়া কয়েক বৎসর ক্রমাগত ঘুমাইয়াছে, আর দাবার বড়ে টিপিয়াছে। বাহ্যারামের ইদানী-ন্তন এ সকল কাজে বড় একটা মনোবোগও ছিল না, সুতরাং সমস্তই গোল-মাল। ইহাদের উভয়কেই গৃহকার্যে অমনোবোগী এবং পরস্পরের প্রতি আশঙ্ক দেখিয়া কঠা গিয়া বিরক্ত হইলেন। স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিছু বুঝ ভার করিয়া থাকিতেন। ইহাতে বাহ্যারাম ও সন্তোষিনীর প্রণয় ত্রুট সাধনের বড় বাধাত তদ্বিধ। ভিতরে ভিতরে নীরবে সন্তোষিনীর প্রাণ ক্রমশঃ করে, বাহ্যারাম নির্জনে বলিয়া বিষয় বদনে ভাবে।

নিশানাথ বাবু উদার হৃদয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি, প্রেমমাহাত্ম্য অনেক অব-গত ছিলেন। বাহ্যারাম ও সন্তোষিনীর মধ্যে যে নিগূঢ় প্রেম সঞ্চারিত হই-
রাছে তাহা বুঝতে পারিলেন। অন্যান্য তাঁহার মনে বড় দয়া হইল। হিন্দু

বিধবানিপেয় প্রতি তাঁহার সজ্জবৃত্তা পূর্ণ হইতেই ছিল । মনে মনে ভাবিলেন, “যে বাহাকে পাইলে সুখী হইবে মনে করে, তাহাকে তাহার পাণ্ডরাই উচিত । কি করিব, আমার যে কোন কামড়া নাই । ত্রী বেক্রপ প্রাপ্ততা প্রস্তাব শুনিলে এখনি সম্বন্ধিনী লইয়া আসিবেম । আমার যদি সাহস থাকিত, তাহা হইলে বিধবা বিবাহ আইনঅনুসারে ইহাদের দুই জনকে পরিণয় সূত্রে আমি প্রেষিত করিতাম । আপনা হইতে যে প্রেম উৎপন্ন হয় তাহাতে বাধা দেওয়ার মত মহাপাপ জগতে আর কিছু নাই । বাউক, আর ও সব ভাবিব না । শেষ আবার কি সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যবে মরিয়া পড়িয়া থাকিব ? সকলি কৃকের ইচ্ছা ।”

পিজরাবত পক্ষীর ন্যায় সম্বোধিনী ও বাহ্যারামের মন ছট কট করিতে লাগিল । অন্তরে প্রেমামুরাগের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, বাহিরে প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাহা ভিতরে গিয়া মহা দৌরাণ্ড্য আরম্ভ করিল । কোন কালে মন লাগে না, আহাৰ নিজ্ঞার সুখ নাই, লোকসঙ্গে মিশিতে কিবা নিৰ্জ্বনে থাকিতে, কিছুতেই উৎসাহ জন্মে না । বাহা চায় তাহা পায় না, বাহা পায় তাহা চায় না । আশা ছাড়িতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, তাহা চরিতার্থেরও উপায় নাই । প্রবৃত্তির পথ বন্ধ দেখিয়াও মন নিরুত্তিমার্গে ফিরিয়া আসিতে চাহে না । সম্বোধিনীর এখন পূর্বের মত ভেমন উদ্বিগ্ন অশান্তি নিরাশ দুর্ভাবনা ছিল না, বাহার পক্ষে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন তাঁহাতে সর্বত্র অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইরাছেন । তাঁহার দায়িত্ব এখন বাহ্যারামের স্বখে চাপিয়া বসিল । সুতরাং নবানুগাগমভূত অপরিহৃত প্রেমভরনের আঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার স্তব্ধ ভয় চূর্ণ হইল । কিন্তু উভয়েই ইহাতে বিশেষ শিক্ষা পাইতে লাগিলেন । দুঃখের শিক্ষা পরিণামে বড় কল্যাণপ্রদ, বিষ হইতে অমৃত উঠিবে তাহারই অন্য এ শিক্ষা । বিধাতার চক্রে পতিত হইয়া উভয়েই আধ্যাত্মিক নিকার প্রীতির পথে বাইবার জন্য ধাবিত হইলেন । একদে বাহির হইতে ভিতরে, রূপ হইতে গুণে, ঈশ্বরগ্রাম হইতে অতীশ্বর শান্তির রাজ্যে অমৃতের অন্বেষণ করিতে হইবে । বিধাতার দুৰ্জয় শাসনে বাধ্য হইয়া তাহা-

দিককে সেই দিকে অনিচ্ছার সহিত ফিরিতে হইল। বিধাতা বিকারী রোগীর জন্য যেন বিষক্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে অবশ্য এক দিকে আন্তরিক পিপাসা আশা কামনা বাসনা উত্তেজনা অনুরাগ, অপরদিকে বাহ্য প্রতিবন্ধক শাসন ও প্রতিকূল অবস্থা পরস্পর দুই দলের মধ্যে মহাসংগ্রাম বাঁধিল। অন্তরঙ্গগতে কাটাকাটি মারামারি রক্তপাত আরম্ভ হইল। এই শোণিতে নবজীবনের অঙ্কুর বাহির হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সামাজিক উৎপীড়ন।

নিশানাথ তীর্থ হইতে আসিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ন্যায় কালযাপন করেন এ কথা গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই রাষ্ট্র হইল। হরিসভার সভাগণের পক্ষে এটা বড়ই মঙ্গলের কথা। সভার প্রধান উদ্যোগী সেই কুড়ারাম ও বনশ্যাম প্রযোগ বুঝিয়া অবিলম্বে নিশানাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। এবার আর আদরের সীমা নাই, নিশানাথ অস্ত্রে বাস্তে উষ্ণিয়া খাড়াইলেন, এবং সম্মুখের সহিত পাক্য অর্ঘ্য আচমনীয় দিয়া দুই জনকে বসাইলেন। তাঁহার সাম্বিক বেশ ভূষা ভদ্রতা কণ্ঠন, বিনম্র বাহ্য প্রবণে পাণ্ডুর আক্সাদে পুঙ্কিত হইয়া শত মুখে তদীয় গুণগ্রামের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাহ্যারাম কৃকতক, সুভরাং হরিসভার নব্য হিন্দু সভা মহাশয়গণ এমন শিষ্ট শাস্ত ব্যক্তির উপর আদিপত্য স্থাপন করিবেন না ত কি করিবেন? নিশানাথের এটাই বড় ভয়, পাছে তাঁহার পূর্ব জীবনের অভ্যন্তর ভঙ্গের কথা ঘরিয়া কেহ পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু তিনি বাহ্যদিককে ভয় করিতেছেন তাহাঙ্কের মধ্যে অনেকে লুকাইয়া এখনো নজরদার কোচমানের আন্তাবোলে হুগির আণ্ডালিক খাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলে কার সাধ্য? বিশেষতঃ নিশানাথকে এখন

সামাজিক জরাজীর্ণতার হতবীর্য ভীত কাণ্ডকর করিয়া ফেলিয়াছে, তিনি আপনার অপরাধ ভাবিয়াই শশব্যস্ত, অমোর ঘোষ ত্রুটি ঘোষণার বা বলিবার সাহস নাই। তদ্ব্যতীত ভাগিনের বাহ্যারামের স্বাধীন আচার ব্যবহারের জন্য তাঁহার একটা ভাবনা আছে।

কুড়ারাম বলিলেন, “খুঁড়, আপনার উপর সমাজের ভক্তলোক সকল বড় চটিয়াছে। তাহারা আগামী কল্য বৈকালে সভা করিয়া আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে। বিশেষতঃ বাহ্যারাম সম্বন্ধে আপনি কি জানেন তাহা আপনাকে বলিতে হইবে। শুনিয়াছি সে না কি সঙ্গটাচরণের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছে!” কথা শুনিয়া নিশানাথের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি নিতান্ত ভীত এবং সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “বাপু, আমি এখন তোমাদের শরণাপন্ন, তোমরা আমাকে পক্ষা দিও। তোমরা যা বলিবে তাই আমি করিব। এক্ষণে একটু অনুগ্রহ করিতে হইবে। যদি দয়া করে আমার বাড়ী পদবুলি দিলে, একটু অন্ন গ্রহণ কর।

কুড়ারাম দনশ্যাম মহা আশ্চর্যচিত্তে অষ্ট হাসি হাসিলেন, এবং জলযোগের প্রস্তাব শুনিয়া ধেরূপ সৌজন্য পরিবার প্রণা আছে তাহা করিলেন। নিশানাথের বড় ভয় ছিল কেহ তাঁহার বাড়ীতে জলগ্রহণ করিবে না। সেই অন্য সস্ত্রীক বিশেষ যত্নের সহিত দুই জনকে জলযোগ করাইলেন।

নিশানাথকে নবাবুরাগী কৃষ্ণকৃষ্ণ ঘোষণা দনশ্যাম নবীন ভাবে কৃষ্ণ-চরিত্রের কিছু প্রশংসা উপাধন করিলেন। তিনি বলিলেন, “শ্রীকৃষ্ণই পূর্ব-ব্রহ্ম ভগবান, তিনিই জীবনের সর্বাঙ্গমূলক আদর্শ, তাঁহার পথ অনুসরণ ব্যতীত এই পাতত হিন্দুজাতের আর উন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই।” কৃষ্ণকথা শ্রবণে নিশানাথের দুই চক্ষে জলধারা বাহিতে লাগিল। পদপুঙ্খ কণ্ঠে সাক্ষরনরেন তিনি বলিতে লাগিলেন, “আহা, রাধাকৃষ্ণের সুগল মূর্তি কি মনোহর! তাই দর্শন করিয়াই ত আমি আবহিংস মংস্য মাংস পরি-
 ত্যাগপূর্বক ভক্তমার্গ অবলম্বন করিয়াছি। আহা! কবে বুঝাবেন বাব,
 * -মাধুকরী মেঘে ধাব, নিরাধিব সুগল মূর্তি।”

কিন্তু এ কথা গুলির সঙ্গে হারিসভার নব্য সভা দনশ্যামের বড় সহানু-

ভূতি হইল না ; তাঁহার মতে নিশানাথ এক জন অন্ধবিশ্বাসী ভ্রান্ত কুসংস্কারী ভাবুক মনুষ্য । নিরামিষভোজী শ্রেয়ভক্তিপিপাসু সে কেলে রকমের গোড়া বৈষ্ণব দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে না এটা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস । নবীন হিন্দুর নবহিন্দুধর্মের সঙ্গে যদি আধুনিক সভ্যতার যোগ না থাকে তাহা হইলে উহা কেহ লইবে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন । এই জন্য প্রচলিত ধর্মের যে কিছু আন্তঃস্থ সুখ সুবিধা আছে তাহা যোল আনা বজায় রাখিয়া বৈদেশিক সভ্যতার আঠার আনা সুখ সুবিধার সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া লইয়া নূতন হিন্দুশাস্ত্র এবং আচার ব্যবহার তাঁহার প্রবর্তিত করিতে চাহেন । ইহার জন্য কোন একটা ঠাকুর দেবতা প্রয়োজন, নতুবা কেবল যুক্তি বিজ্ঞান সুবিধার দোহাই দিলে জাতিসাধারণে তাহা মানিবে কেন ; তাই হিন্দুধর্মমন্দিরের ভিতর হইতে কৃষ্ণঠাকুরকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে । নিহাত পিলেরোগা ভ্যাবা গঙ্গারামের মত ভাল মানুষ ঠাকুরের দ্বারা পতিত ভারত উদ্ধার হইবে না, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বুদ্ধিমান চতুর ঠাকুর চাই ; অতএব যতকুলপতি শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রই সে কাণ্ডের উপযুক্ত পাত্র ।

পরে কুড়ারাম ঘনশ্যাম বিদায় হইলে নিশানাথ বড়ই ভাবিতে লাগিলেন । প্রকাশ্য সভার দাঁড়াইয়া কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন এটা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইল । সে বিষয়ে গোপনে গৃহিণীর সঙ্গে অনেক রাত্রি পম্যস্ত জাগিয়া কত যুক্তি পরামর্শ করিলেন । শেষে স্থির হইল, পুরোহিতের দ্বারা গ্রহবৈগুণ্য বিনাশার্থ হোম সন্তায়ন আদি কিছু দৈবক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন । এটা সঙ্গে এটাও স্থির হইয়াছিল, সন্তোষিণী ও বাজারামকে বাড়ী হইতে বিদায় দিবেন ।

নয়নতারা অনেক ক্রিয়া কর্ম্ম তীর্থধর্ম করিয়াছেন, সামাজিক দণ্ডভঙ্গ, পৌরহিত্যের অত্যাচার হইতে কিরূপে সহজে মুক্তি লাভ করিতে হয়, কোথায় কি ভাবে কত পরিমাণে টংকোচ দান করিলে শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ম রক্ষা করা যায়, এ সমস্ত তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । তাঁহার সাহস ভরসাও যথেষ্ট । তবে ভীত নিশানাথকে তিনি বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিলেন না । নিশানাথ বাবু ইতঃপূর্বে বেশ লেখা পড়া জানিতেন, বুদ্ধি বিবেচনা, সং-

সাহস বেশ ছিল। স্ত্রীসংসর্গে তীর্থে গিয়া অবধি কেমন যে মনে একটা বিষম ভয় ছুকিয়াছে, কিছুতেই আর সে ভয়ের হস্ত হইতে তিনি উদ্ধার হইতে পারিলেন না। তবে অতিভূত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “বিষম সম্পত্তি বাহা কিছু আছে সব হরিসনার দ্বানপত্র লিখিয়া দেওয়া যাউক, আমাদের আর কেই বা আছে, আর কেই বা ভোগ করিবে। তাহা হইলে আমাদের সাক্ষণ সজ্জন সকলে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। আর তুমি এক কর্ম কর, এট এক শত টাকার নোট আছে লও, লইয়া কলা সভার আগে বাহাতে সম্মানন পূরণ কর হর তাহা করিও। পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া আনাও।”

কতী ঠাকুরানী সকল বিষয়েই পাকা কাম লোক, বর্ণভাবে গলিয়া কিসা ভয়ে ভীত হইয়া সতসা যে কিছু বেশী ব্যয় করিয়া ফেলিবেন সে প্রকৃতির লোক নহেন। নিম্নাংশে দ্ব্যপবন হইয়া কোন বৈক্য ভিখারীকে যদি কিছু দান করিতেন, ঠাকুরানী আবার তাহার ভিতর হস্তরি কাটিতেন। বিনা পরিশ্রমে তাঁহার নিকট হইতে কোন দ্রব্য বৈক্য যে কিছু লইয়া যাইবেন সে পথ ছিল না। হয় কাঠি চেলা, না হয় কোন দ্রব্য বস্তু আনি-স্তর করা, কিম্বা পুণ্ড্রন কাননা দরদার আলকাতরা মাখা। ইহা ভিন্ন এক মৃষ্টি ততুল কেহ তাঁহার নিকট পাইত না। বাড়ীতে রাতমিস্ত্রী কুলি মজুর যখন যখন কাজে লাগিত, তাহাদের নিকট হইতে বেশী কাজ আদায় করিবার জন্য তিনি কাহাকেও বলিতেন, “তোকে কাপড় বকসিস্ দিব।” কাহাকেও বলিতেন, “তোকে বুদ পেট ভরিয়া কণার খাওয়াইব।” মজুরগণ হাসিয়া বলিত, “আহা। মা ঠাকুরানীর কি দ্ব্যর শরীল। কেবল কাজ লইবার জন্য তুমি লোভ দেখাও। নহনতারা তাহা-দ্বিগকে বক্ষিত করিতেন না। কাহাকেও উকলি খুকলি ছেঁড়া কাপড় পান, কাহাকেও পচা কাঁটালটা আমটা দিতেন। তাহা পাইয়া কুলি মজুরগণ নানা বস্তু ভয়ে ঠট্টা তামাসা করিত আর হাসিয়া বলিত, “মা ঠাকুরানী গো, বড্ড ধেরিয়েছ! পাট বেন কেটে পড়ছে! এবড়ুত প্রকৃতি যে নহনতারা তিনি দামীকে বলিলেন, “তুমি অত তর পাইতেছ কেন? কিছু চিন্তা নাই, আমি সব ঠিক করিয়া লইব।”

অতঃপর পাড়ার নসিরাহ ঠাকুরকে ডাকাইয়া একখানা ছয় পয়সার জেলে কাচা, দুই পয়সার মধুপুস্তকের বাটী, একটু সোনা, একটু রূপা, কিছু তিল কিনিবার জন্য সর্বশুদ্ধ বার আনার পয়সা বাজার করিতে দিলেন, বাকী চারি আনা পুরোহিতের দক্ষিণার জন্য রহিল । বলা বাহুল্য যে নসিঠাকুর সেই বার আনার ভিতর হইতেও আপনার দৈনিক অহিফেন এবং তস্য চাটের উপযোগী দামটো বাহির করিয়া লইয়াছিল ।

পর দিবস প্রাতে রোগা রোগা গোটাকতক আধপাকা কাঁটালি কলা, শুকনা দুই চারি খানা শশার কুচি আর সের খানেক বুকড়ি আতপ চাল, তাহার উপর গোটা দুই দুর্গমণ্ডা দিয়া গিল্লী স্বহস্তে নৈবিদ্য সাজাইলেন, একটু ধূনয় আগুন দিলেন ; ঘরে লুচিভাতার জন্য খানিকটা ঘৃত ছিল, ডাঁড়ের তলা চাঁচিয়া তাই গোমের জন্য বাহির করিয়া রাখিলেন । পাছে সেই ঘৃত আবার পুরোহিত ঠাকুর চুরি করে কিম্বা মস্ত কাঁকি দেয় এইজন্য নয়নতারা তীব্র কটাক্ষে, কাণ খাড়া করিয়া সমস্ত সময় বাটিনি দিয়া কাছে বসিয়াছিলেন ।

ক্রিয়া সমাপনান্তে উপকরণ সামগ্রীগুলির অর্দ্ধেক পুরোহিতকে, বাকী অর্দ্ধেক বাড়ীত্ব ষি চাকরদিগকে প্রদত্ত হইল । সময়ে সময়ে কোন সমা-
রোহ ক্রিয়া উপলক্ষে ঐ রূপ দুই চারি খানি বেশী নৈবিদ্যও হইত এবং তাহার এক খানি প্রতিবাসী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে তিনি পাঠাইয়া দিতেন । কিন্তু বিদ্যারত্নের ছেলেরা সে নৈবিদ্যের কথা শুনিলে লাঠি লইয়া বাহির হইত । ঐদৃশ ক্রিয়া কাণ্ডে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য প্রায় কখন বাহিরে ষাওয়ার দরকার হয় নাই, নিষেধ স্বামীকেই সে দিন গিল্লী ঠাকুরাণী ভাল করিয়া ভোজন করাইতেন । কোন ব্রত নিয়ম তাঁহার বান্ধ পড়িত না, কিন্তু সব কাজেই তিনি এইরূপ মুক্ত হস্ত । পুরোহিত ও প্রতি-
বাসী গ্রামস্থ লোকেরা এজন্য বড়ই বিরক্ত ছিল । নয়নতারা যে কৃপণাব-
তার তাই সকলে জানিত । এবার কড়াটাকে সকলে বিপাকে কেলিয়াছে, কিছু না খসাইয়া ছাড়িবে না ; কিন্তু নয়নতারা বড় শক্ত খানি, তাঁহার হাত দিয়া এক ফোঁট জল সরে না, টকা ব্যয়ের ভার তাঁহার হাতে ।
তাঁহার ঘরের কোন দানযোগ্য অতিরিক্ত সামগ্রী পচিয়া গলিয়া তাহাডে

পোকা না পড়িলে আর তাহা অপরে পাইত না। ঘান বিতরণটা সমস্ত বাড়ীর ভিতর এবং অতি নিকটস্থ আশ্রয়স্থানের ভিতরেই বন্ধ ছিল। এই সকল দেখিয়া স্ত্রীরা নসিরাম ঠাকুরের মনে বড় বৈরাগ্যের উদয় হইত। তথাপি সে ভজমান ঘরটা হাতছাড়া করিত না। শ্রমিকের সমস্ত যদি কিছু দিয়া যায় এই আশা।

নয়নতার ঠাকুরাণীর এই বর্তমান দৈবকর্ম্য উপলক্ষে দেবতারিঙ্গের সমস্ত সাধন তত প্রয়োজন ছিল না, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগকে চমকিত করাই প্রয়োজন, এই জন্য ব্রাহ্মণ ভোক্তার আয়োজন কিছু বাহ্যিকরূপে করা হইয়াছে। পাঠকগণ অবশ্য এটা স্মরণ করিতে ভুলিবেন না, যে নয়নতারার বাহ্যিক আয়োজন। ব্রাহ্মণেরা মধ্যাহ্নে লুচি কচুরি মালপুয়া ভোজন করিবেন বড়ই আনন্দের কথা। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া দুইটার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ কেহ তামাক খাইতেছেন, কেহ হাঁটুর সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ প্রাক্তমার্জ্জুনী দ্বারা বন্ধনপূর্বক স্খালিত নিম্ন অঙ্গুল হইয়া ভুলিতেছেন। ঘাহার অঙ্গপিত্তের রোগ আছে, তিনি অগ্নি-নলের কঠোর ক্রেশ সস্তাপ ভোগ করিতেছেন আর চটিতেছেন। লুচি চিনির ফলার বেশী চটিবার যো নাই। সকলেই তীর্ধের কাকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন, অপেক্ষা না করিয়াই বা এত বেলায় ঘান কোথায়? বাড়ীতে গৃহিণীর চুলোয় আগুন দেয় না। এ কালের সভ্য যুবকেরা নয়নতার ঠাকুরাণীকে চিনিতে। তাহার দিনের বেলায় নিমন্ত্রণে কোথাও যাইতেও বড় চাহে না। বাধ্যবাধকতার জন্য যে দুই একটা গিয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া বাড়ী গেল। অবশিষ্টেরা বীণা ম'র খাটতে লাগিল। স্খালিত হেলে গুলর মুখ ভুকাইয়া গিয়াছে, মহাপ্রাণী ছটফট করিতেছে, এমন সময় "মহাশয়রা গা ভুলে আসুন!" এই শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। আহা সে যেন স্বর্গের দৈববাণী। স্খালিত শব্দের ন্যায় ব্রাহ্মণেরা "আ! রাম বল, বীণা গেল, ওঠরে! রেমো সেমো, বগলা চপলা সন্মাই আমার কাছে বসিস, আগে তুলিস, তার পর ধাস।" (তুলতে আর বড় হবে না। নয়নতারার পাছের দিকে চারিটা চক্ষু) এই বলিয়া আহারে বসিলেন। নিশানাথ ভক্ত গুরুয়ের ন্যায় এক পাশে দণ্ডায়মান। আগে আগে তিনি ধাইয়া বসিয়া

ধাকিতেন, এখন বড় ভয় চুকিয়াছে, কাজেই তাঁকেও উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল।

পাতা পড়িল, হারাধন শর্মা বলিলেন, “ওহে আমি যদি খাট না, পাতা-টাটা বিবেচনা করিয়া দিও।” লবণ দ্বিবার সময়েও এই কথা। তিনি দই খাবেন না, তাহার দাবি আর কিছুতে মেটে না। পাতা লবণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন। অপরাহ্নে ভোজন, পরিবেশক এবং ভোজ্য সকলেই ক্ষুধায় ষিট্‌ষিটে হইয়া আছে। গৃহকর্ত্রী লুচি কচুরি মালপুয়া মিঠাই সন্দেশ সমস্ত হালুয়াই দোকানে বিশেষরূপে কর-মাইস দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। যথা সময়ে লুচি সকল ঠক ঠক শব্দে পাতে পড়িতে লাগিল। তার সঙ্গে ঘরে তৈয়ারি তেলের তরকারি। আস্তে পিঠের মত স্তিতিস্থাপক মালপুয়াগুলি এমনি প্রেমিক যে মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া দস্তকে আর চাড়িয়া দিতে চায় না। তাহাতে মিষ্ট অতি-কম, ডায়বিটিসের রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। সন্দেশগুলি বেশ মজবুদ গাঁথনি, পাতে দ্বিবারাত্র লাফাইয়া উঠে; জিলাপি তাহার বিপ-রীত, পেমরসে যেন তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে। স্তম্ভকর্ষ নিপ্রগণ অত্যন্ত ক্ষুধা বশতঃ তাহাই খাটতে লাগিলেন। কিন্তু পরিবেশনকর্ত্তাগণ এমনি সাবধানী লোক, প্রতি বারে এক খানির বেশী লুচি পাতে দিবে না। স্মরণ্য ইহাতে ভোক্তাগণের ধৈর্য্যচ্যুত এবং বৈরাগ্যোদ্ভব হইতে লাগিল। তজ্জন্য কেহ ক্রোধকষায়িত করে “ওহে ও লুচি, বলি ওহে ও হাঁড়িতে! চক্ষে দেখতে পাও না নাকি? এই পাতে দিয়ে যাও!” শেষ লুচি সন্দেশ আর কুলাইল না, চিড়া মুড়ি খই পাশ্চাত্য কলা কঁটাল ঘরে যাহা কিছু ছিল সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণগণকে দিয়া গৃহ-স্থামিনী তাহাদের ক্ষুধিবৃত্ত করিলেন। যাহা কিছু বাকী রহিল তাহা বচনে পুরাইয়া দিলেন। কেহ মনে মনে, কেহ প্রকাশে বলিতে লাগিল, “ও জানাই আছে পেট ভরিবে না। বেশীর ভাগ ঠোঁট মুখ ছিঁড়িয়া গেল। এদের নাম করিলে অন্ন হয় না।” এইরূপ জনপ্রবাদ শুনা গিয়াছে, যে গ্রামের লোকেরা আহারের পূর্বে কেহ নয়নতারার নাম গ্রহণ করিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

দলাদলির সভা ।

গ্রামের মধ্যস্থলে কেপ চণ্ডীতলার সভার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
পর দিবস অপরাহ্নে গ্রামস্থ বিজ্ঞ সভ্য ভদ্র লোকেরা এক এক করিয়া
আসিতে লাগিলেন । ক্রমে সভা লোকে পরিপূর্ণ হইল । সভাপতি
ব্রহ্মর তর্কচক্ৰ তর্কচক্ৰ মতাম্বর বিদ্যা উপাধি মান সম্মান তাবৎ
বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, তদ্বিন্ন তাঁহার মতি বাহিনী এ কাষের বিশেষ উপযোগী ।
তাঁহার উদ্বোধন বৈদ্য এতৎ গভীরতার পরিমাণ আট বর্গ হস্ত । দুই জন
লোক না হইলে তাহা আঁকড়িয়া ধরা যায় না । লোমাবলীতে সর্পিদ আচ্ছন্ন ।
মুহাসমুদ্রবক্ষে যেমন দ্বীপ, তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যভাগে তেমনি
শিখা প্রতিষ্ঠিত ছিল । ফৌকার সেই সমুদ্রে পতিত হইয়া সময়ে সময়ে
যখন বাড়ী আসিবার পথ ভুলিয়া যাইত, তখন সে ঐ শিখার অবলম্বনে
দিগ্‌ নিরূপণ করিয়া লইত । তর্কচক্ৰ চৌধুরী নাসার অভ্যন্তরস্থ চিত্তস্থ
কাশীর নস্যপ্রভাবে অতিশয় নিশ্চুত হইয়া আসিয়াছিল । যখন তিনি
উদ্বাররূপ তুমেরু পর্বত উল্কে উত্তোলন করিয়া হাশ পা চড়াইয়া চিংপাত
হইয়া নিদ্রা যাইতেন তখন সেই নাসা গঙ্গার হইতে সিংহগর্জনবৎ শব্দ
নির্বোঁষে প্রচণ্ড বেগে নিবাসবায়ু প্রবাহিত হইত । তাহার দর্পের কঁকর
রবে বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত কেবল তাহা নহে, প্রতিবাসীরাও
সময়ে সময়ে আগিয়া টুটিত, এবং অকালে নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রোধ
বিরাজিতে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রতি সকলে মস্ত্যাস্তিক অভিসম্পাত
প্রদান করিত, কটুকটব্য বলিত । কখনো কথুকারের ভদ্রার ন্যায় শব্দ শব্দ
শব্দে, কখনো বজ্রের ন্যায় কড় কড় নাড়ে, কখন কখন পক্ষিপক্ষ্মিবিবাসী
কঁট কটে বাজের ন্যায় পট পট রবে, কখন বা বংশী স্রনিতে উহা বাজিত ।
এক একবার নিশ্চক্ৰ থাকিয়া আবার কঁকরায় মুক্ত নদী কল্লোলের ন্যায়

ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিত । গভীর রজনী কালে মৃতবৎ নিদ্রিত পৃথিবীর নীরব আকাশের স্থির সমীরণবক্ষে সে শব্দতরঙ্গের লীলা লহরী কত বিধ রঙ্গে যে ক্রোড়া করিত তাহা আর বর্ণনা করা যায় না । কিন্তু এত যে কোণা-হল আন্দোলন ভোমগর্জ্জন, নাসিকাস্বামী তাহার বিন্দু বিসর্গের টের পাই-তেন না । নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রেশের কথা কেহ অভিযোগ করিলে, তিনি হাসিয়া বলিতেন, “আমার কি নাক ডাকে ? কৈ আমিতো কিছুই শুনিতে পাই না !” সৌভাগ্যের বিষয় এই, ধূরন্ধরের ধূরন্ধরী অল্প বয়সেই প্রাণ-ত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করিবার কেহ ছিল না । কোন কোন্সলপরায়ণা বরাঙ্গিনীর সাহিত যদি হইঁর পুনঃপরিণয় হইত, তাহা হইলে আমরা শুনিয়া বড় আফ্লাদিত হইতাম । এরূপ প্রবাদ আছে, যে নিদ্রাকালে তর্ক চক্কর নাসিকান্দরের ভিতরে ক্রোড়াশাল ক্ষুদ্র মুখক শাবকবৃন্দ স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিয়া আবার প্রমুক্ত মুখগহ্বর দিয়া বাহিরে আসিত । তাহার বঙ্গবিলাসিত সুগন্ধ স্বনদয়ের নিম্নভাগে উদররাজ্যের রোমা-বৃত্ত সামান্ত রেখা ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় সেই বিশাল বপু পারবেষ্টন করিয়া-ছিল । গ্রীষ্ম সমাগমে উদরানহিত দণ্ডিমষ্টান, অস্ত্র এবং কণ্টকী ফল-সজ্জাত উত্তপ্ত বাষ্পোদগমে যখন প্রাতঃলোকপ হইতে স্বপ্নাবল্লী সকল বৃষ্টিবারদ ন্যায় প্রবাহিত হইত, তখন জ্ঞান হইত যেন গঙ্গা ভাগীরথী মহা-বেগে সাগরসঙ্গমের পানে ছুটিয়া যাইতেছেন । সে দেহবাদ মধ্যে যে কত কত ক্ষুদ্র কীট জন্ম গ্রহণ করত এবং জাময়া অকালে মরিয়া অরশেষে সেইখানেই পড়িয়া থাকিত তাহা কে গণনা করিবে ?

সভাপাতর করীন্দ্রতুল্য বিপুল তমুর উপযোগা বেত্রাসন ভগতে এ পর্য্যন্ত স্ফটিক হয় নাই, এই অন্য এক খণ্ড বিস্তৃত তক্তাপোষের উপর তাহাকে বসান হইল । পল্লীগ্রামের দলাদালর সভা আর মেহহাটা কিম্বা এঁবো পোস্তা দুই সমান । সভার কার্য আরম্ভ হইল, সকলেই এক সঙ্গে কথা কাহতে লাগলেন । দশ পনরটা বিভিন্ন দলে কথা চালিতেছে, কে কার কথা শুনিবে । অতঃপর ঘনশ্যাম বাবু দণ্ডারমান হইয়া বাগলেন, “নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনা বাহ্যারাম হিন্দু আচারাবরণী হইয়াছেন, তিনি স্নেহান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, অতএব তাহাকে গ্রামবাহিন্দু এবং আতিচূত করা

হটক। অন্যথা নিশানাথ বাবু তাহাকে লইয়া একাকী সমাজচ্যুত হইয়া থাকুন।”

আহ্‌সান শুনিয়া নিশানাথ ভয়ে অবুধ হইয়া পড়িলেন। বাঁড়াইতে বান, পা ধর ধর করিয়া কাঁপে। কথা কহিতে বান, তো তো করিয়া কথা আটকাইয়া যায়। বহু কষ্টে কোন রূপে সাহসে ভর করিয়া বহি বা বাঁড়াইলেন, কিন্তু কটির বসন শিথিল হইয়া কাচাটা খুলিয়া গেল; কাচা স্তম্ভিতে কোঁচা খুলিয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গে ধর ধর ধারে বাম চুটিতে লাগিল, আরো কিছু গুরুতর শারীরিক ব্যাপার ঘটয়াছিল। নিশানাথ কাঁপিতে কাঁপিতে ভয় বরে বলিলেন, “আঁ—আঁ—আঁমাকে, গ—গ—গ—গঙ্গা দিও। আঁ আমি যেন য বরে ম মরে থা থাকিনে।” কুড়ারাম নিকটে ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন “তোমার কোন ভয় নাই, স্থির হও, আমরা তোমাকে বাঁচাইয়া দিব।”

সেই সময় সভার মধ্যে সহস্রজলকম্পোলবৎ বড় একটা গগণোল উঠিল। বাহ্যারামের পক্ষে যে দুই এক জন ছিল তাহারাই প্রথমে গোল ভোলে, শেষে ভুতের বাপের ভ্রাতা। পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া গুলি ছোঁষ, পারিবারিক হীনীতি কলক ঘোষণা আরম্ভ করিল। তখন ক্রোধভরে কেহ ঘুঁষি উচায়, কেহ হস্ত কাড় মিড়ি করে, কেহ চোঁচায়, কেহ টিকি নাড়ে, কেহ দাঁত খিচিয়ে গালাগালি ছেঁয়, কেহ সভাপতির গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে। দুই পাঁচ জন বাঁহারি বিজ্ঞ জীব শাস্ত্র শিষ্ট ছিলেন তাঁহার। যথায়োক্তি বক্তৃতা করিবার জন্য উঠিয়া বাঁড়াইলেন, হস্ত প্রসাধন করিলেন, গলায় সান দিলেন, দুই একটা কথাও বলিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিতে পাইল না, মহাপগণোলে সকলে মাতিয়া উঠিল। সন্তোচরণের ভ্রাতা বিকটবদনও সভায় উপস্থিত ছিল। সে তখন হিন্দু-মূর্ত্তি ধরিয়া হিন্দুভাবে কথা ক’হতেছে আর বলিতেছে, “বাহ্যারামকে জ্ঞাতিচ্যুত করা উচিত, নতুবা আমাদের সনাতন আৰ্য্যধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিস্মৃতিচরণ করিয়াছেন, আমি তার সাক্ষী আছি। এখন আর আমরা তাঁহার সঙ্গে কোন মতেই আহার ব্যবহার সংশ্রব রাখিতে পারি না।” বিকটের গুরুপ বৈরনিঘ্যাতনের একটু কুটিল রহস্য

ছিল। সে সম্ভাবনাকে পাইবার আশা রাখিত। তার বিশ্বাস যে সে বড় গুণবান হুপুরুষ, বাহ্যারাম নির্দোষ পণ্ডিত অরসিক ব্যক্তি। কিন্তু তাগর আশায় চাই পড়িল, সুতরাং হিংসায় জলিয়া ক্রুরপে কখন বাহ্যারামের অনিষ্ট সাধন করিবে, তাহারই চেষ্টায় ফিরিত। এক্ষণে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই নির্লজ্জের ন্যায় বলিতেছে আর্থাধর্ম্য লোপ হইল। বিকটের চীৎকার কোলাহল শ্রবণে কতিপয় উদ্ধতস্বভাব যুবা তাহাকে পাতিনেড়ে দুষ্ঠ সয়তান বলিয়া তিরস্কার করিল। মহা হল মূল হট্টগোল, কে কি বলিতেছে, তাহা শুনা যায় না। কেহ বলিতেছে, চরিসভার সভ্যরা গোপনে স্ববনের হাতে মূর্গিমাংস খায়। কেহ বলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সভার হিসাব দেন নাই, তিনি টাকা চুরি করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া অপর এক জন বলিয়া উঠিল, চাঁদার টাকায় লুচি পাঁটা খাওয়া হইয়াছে, আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আর এক টাকিধারী কৃতবিদ্য যুবা দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, “হরিহর চাটুর্ঘ্যের জামাই বিলাত হইতে আসিয়া গোপনে খণ্ডর বাকীতে সে দিন খাইয়া গিয়াছে।” তক্ষু বণে গের-বাধা লম্বাটিকি হুলাইয়া ক্রোধকম্পিত অধরে হরিহর বলিল, “কোন হারামজাদী এমন কথা বলে রে! তার মাধায় আমি দুশো জুতো গুণে মারি।” কিন্তু তিনি রাগ করুন আর যাই করুন, কথাটা সত্য আমরা জানি। মূর্গির ঠাং আর হাঁসের ডিমের খোলা প্রায় চাটুর্ঘ্য মহাশয়ের ঘরের কানাচে দেখা যাইত। যাহা হউক, সে কথা আর আমরা দেখী বলিতে চাই না। বলিয়া কে এখন বারাসং আর ঘর করিবে! পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন শনিবারের রাত্রে তত্ত্ব হইলে অন্য-রাসে জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি বলিব, এই স্নেহ-ভাষা হিন্দুর অধাদ্য (একধে সুধাদ্য) স্পর্শ করিয়া এক দিন আমাদিগকে পৌষ মাসের রাত্রে গঙ্গান্নান করিতে হইয়াছিল।

কুড়ারাম ভায়াও এ গওগোলে নিস্তার পাইলেন না। তিনি এক জন সুরাপায়ী সভ্য, পূর্বে যখন পৈতৃক বিত্ত বিভব ছিল, তখন নিজ অর্থে মন্দের হুজ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সাতার খেলিতেন। এক্ষণে সঙ্কীর্ণ সম্বল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাই ব্রজের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া

সমুদ্রী মাছিয়া খান। শেখাবন্দার তিনি ভিটে মাটি সর্বস্ব বেচিয়া এক খানি মদের দোকান খুলিয়াছিলেন। দোকান খুলিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, তিন শত টাকার মধ্যে তিন শত টাকা লাভ। সেই লাভের টাকার উপর নির্ভর করিয়া গ্রাম অর্ধেক মদ আপেক্ষে খাইয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা বিক্রয় কালে ঢালিয়া দিতে ভাঁড়ে গেলগে যে টুকু লাগিয়া থাকিত তাহা চাটিয়া খাইতেন। একবার এক জন জম্মাভাল সুখা মদের বোতল বগলে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিল, উঠিবার সময় অসাবধানতা জন্য বোতলটি পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, এবং সুখা ভয় ও লজ্জাবশতঃ প্রস্থান করে। কুড়ারাম তাহার সঙ্গ ছিলেন। মাচ দেখিলে যেমন পেটী পাছে লাগে, মদের বোতল দেখিলে তেমনি তিনি পাছে লাগিতেন; সুযোগ পাইয়া সেই পরাপতিত মদ টুকু চাটিয়া খাইলেন। অমূল্য ধন মরকে কোথাও অপচয় হইতে দেখিলে কুড়ারামের লব্ধ বিদ্যার্হ হইত। তিনি মদের দোকান করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া শেখ দেনার দ্বারে কিছু দিন কারাবাসও করিয়াছিলেন। এই সকল গৃহ রহস্যের কথা এক ব্যক্তি সভার মাঝে সমস্ত বলিয়া ফেলিল।

পরিশেষে সকলেই সকলের দোষ টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয়ের পরিবারমধ্যে কবে কার নামে কি কলঙ্ক রটয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সমস্ত কার্যবিবরণীর শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন গুণ্ডতার দোষে দোষী, প্রতি গরেই কেহ না কেহ চোচ্ছন্ন ভোজন করিয়াছে, অতএব সকলেই জাতিচ্যুত হও হও। অনন্তর মধুরেন সমাপনেষু, মারামারির উপক্রম হইল। সভাপতি, গোল ধামাইতে চেষ্টা করিলেন, কেহ মানিল না; অধিকন্তু তাহাকে পাঁচ জনে পাঁচ দিক্ হইতে নানা কুট প্রহ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একবারে উত্তম্ব কুত্তম্ব করিয়া তুলিল। তখন সেই স্থল কলেবর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চক্রে ঘেঁষা আঁধার দেখিতে লাগিলেন। অলঙ্কার গলা শুকাইয়া গেল, বাতুলের মত হতবুদ্ধি হইয়া কি সব প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত পা ছুড়িয়া “কাত হও! কাত হও!” বলিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিলেন। সভাপতিও ওকতারবিশিষ্ট

একাত্তর দেহখানি এত কণ তক্তাপোষের অনেক স্থান ব্যাপিয়া ছিল, যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সমস্ত ভার (ওজন) প্রায় সাত আট মোণ হইবে) অঙ্গ স্থানে চাপিয়া পড়িল, তাহার উপর আবার হস্ত পক্ষ লঞ্চালন, সজোরে চাংকার, কুর্দন, কম্পন, হুতরাং আর কত সহ হইবে; তক্তাপোষ খানি মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে তর্কচঞ্চুর বৈনাক পর্কিত সম দেহখানি পড়িয়া গেল। তক্তাপোষ ভঙ্গ এবং দেহের পতন কালে একটা অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়াছিল। সভাপতি তক্তাপোষের ভগ্ন স্থানের মধ্যে পড়িয়া ভুবিয়া গেলেন, তাঁহার গলদেশ এবং মস্তকটী মাত্র জাগিয়া রহিল। তৎবহ্নার থাকিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে প্রাণের দ্বারে সিংহকবলিত গজের ন্যায় গাঁ গাঁ শব্দ করিতে লাগিলেন, আঘাতে সর্কাকে রক্তধারা বহিতে লাগিল, তখন গোলমাল ধামিল এবং সভাও ভঙ্গ হইল। পরে মোটা মোটা বাঁশের সাঁই বাঁধিয়া তাহার উপর চড়াইয়া পঁচিশ জন বাহকে বুঝকরকে বাঁটি লইয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

কর্তব্য নির্ণয় ।

বাঁহীরামের মরা মালকে যেমন কুল ফুটিল তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বাহিরে ভয়ানক ঝড় তুমুল উঠিল। বাহ প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম দেশের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তখন তিনি বিশেষ অসুখাবনপূর্বক অন্তর্দৃষ্টিসহকারে দেখিলেন, “প্রেমবিকারজনিত তরঙ্গ তুফানের লীলালহরী রঙ্গ রস আশা পিপাসা অমুরাগ আকর্ষণ বিলাস উচ্ছ্বাস উত্তেজনা চাক্ষুষ মস্তভা একটী বিবম পরীক্ষা, অথচ প্রেলোভনের বিষয়। ইহাতে বিচিত্র পতিভ্রিয়া আছে। যদিও তাহাতে অনেক যন্ত্রণা পরিতাপ অবশ্য, তথাপি অভিশর লেভের সামগ্রী। এই দস্তই চিন্তাশীল জননীরা কখন, মস্তভার পরিণাম ফল অবশ্য নিজ্ঞীবত। নির্দোষের রাজ্যে একদ

বিশ্বাস বিকারও নাই, অশান্তি নিরাশাও নাই, সেখানে কেবলই শান্তি
আর আরাম ।”

বাহারা বলে “হৃৎকের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল,” শেখোক্ত অবস্থা তাহারদের
পরম প্রার্থনীয় । কিন্তু বাহারা বর্ষার মহাবেগবতী নদীর তরঙ্গাকোলাত বন্ধ
বিদীর্ণ করিয়া ক্ষুণ্ণগামী স্রোতের উপর অলসিক রিণু সমীরণ সেবন করিতে
করিতে জীবনভরী চালাইতে চায়, প্রবল পবনডাড়নে সহ্যিত উত্তাল তরঙ্গ-
মালায় তর তর পতপত কল কল শ্রুতি শুনিতে ভালবাসে, সেই লীলারস-
পিপাসু প্রেমিক বীরেরা নির্কীর্ণের শান্তি অন্বেষণ করে না । তাহারা
শোণিতস্রোতপ্লাবিত অগ্নিময় সমরক্ষেত্রে ভীষণ মৃত্যুর পশুপীণ হইয়া
রক্তরঙ্গে নাচিবে, হৌড়িবে, মার খাটবে, হাসিবে কাঁদিবে, অবশেষে প্রাণ
হান করিবে, এই তাহাদের নিয়তি এবং ইহাই প্রকৃতি । প্রকৃতিভেদে
এই শান্তি এবং প্রেমমত্ততার কার্য্য দৃষ্ট হয় ।

বাহারাম এখন প্রেমাবেশে হাসিতে এবং কাঁদিতে লাগিলেন । শান্তি
ও প্রেম দুইয়ের কোনটাই তাহার পক্ষে এখন আর উপেক্ষণীয় নহে ।
নির্কীর্ণের অটল শান্তি, প্রেমের রসবিশ্বাস মনস্তা পর্যায়ক্রমে মানবহৃৎকার
ভোগ করিতে চায় এটা তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিলেন । যদিও জঘননদীতে
হৃৎকর প্রেমের বান ডাকিয়াছে, কিন্তু জানী বাহারামকে একবারে ভাসাইয়া
লইয়া বাইতে পারিতেছে না । প্রাবৃত্তির নদী প্রবাহমধ্যে প্রোথিত বংশদণ্ড
যেমন কম্পিত হয়, তেমনি সার চরিত্রের হৃৎকর হৃৎমতে মূল বদ্ধ করিয়া
তিনি এক একবার প্রেমাবেশে কাঁপিতেছিলেন । তদবস্থায় বিচার করিতে
বসিলেন, কি করা কর্তব্য তাহা ভাবিতে লাগিলেন ।

“প্রেমটী বড় ভাল জিনিষ, কষ্টের সার পরার্থ । ইহাকে বিতুল্য ভাবে
আশ্রয় করিতে হইবে, মারা প্রলোভনে ভুলিয়া থাকিলে সে দেবদুর্লভ
ধন লাভ করিতে পারিব না, বক্তব্য সত্যোপদেশ সহিত বাহ সম্বন্ধ আপা-
ত্তঃ একান্ত পরিহার্য্য ।” সহসা এই সিদ্ধান্ত তাহার মনে উপস্থিত হইল ।

পণ্ডিত বিচার করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু এ বিচার শাস্ত্রীয় পরীক্ষা যুক্ত
জ্ঞানের বিচার নয়, ইহা জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রলোভন । তরু কিসা প্রলোভন বধন
কোন কল্পনার বিজ্ঞ হইয়া বহু দূরে অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে জ্ঞান-

বিচার বলে পরাভূত করা সহজ ; কিন্তু যখন তাহা মূর্তিমান আকার ধরিয়া সন্মুখীন হয় এবং মনুষ্যের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে তখনই বীরত্বের পরাক্রম বুঝা যায়। বরং লোকে ভয় বিপদের বিরুদ্ধে দাঁত খামাটি করিতে পারে, কিন্তু মনোমুগ্ধকর চিত্তোন্মাদকর প্রলোভনের সন্মুখে হালে পানি পাইলাম না বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে। গৃহে বসিয়া আপনাকে অনেকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন, যে অবস্থায় যিনি পড়েন নাই সে অবস্থাকে তিনি জয় করিয়াছেন ভাবিয়া গর্কিত ভাবে আশ্বরিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু অসাধারণ পুরুষকার ব্যতীত পরীক্ষা হইতে কেহ উদ্ধার হইতে পারেন না। এমন এক সময় ছিল যখন বাহ্যারাম নারীর সৌন্দর্য্যকে অসার মায়া বলিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তখন রূপের আকর্ষণ বা প্রেমের প্রলোভন তাঁহার চক্ষু এবং হৃদয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হয় নাই। যে বস্তুতে লোভ জন্মে না, বরং যাহার স্মরণে মহা সূণ্য বিরক্তির উদয় হয়, কিম্বা আদৌ যাহার মাধুর্য্য অনাস্বাদিত আছে, বিনা সাধনে তাহা মানবমনে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়। বাহ্যারামের মাংস-পিণ্ডবৎ চিরকাল বিবাহিতা পত্নী নিজন্তবে সে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। পৃথিবীতে এরূপ অবস্থার পড়িয়া অনেকে বৈরাগী হইয়াছেন, কিন্তু সে কেবল হৃৎস্পের বৈরাগ্য। বিকটবদনের জীবনে তাহার প্রমাণ পরে সকলে পাইবেন। একে তিনি আলা ভোলা পণ্ডিত মানুষ, তাহার উপর আবার এই প্রেমের উৎপীড়ন, হুতরাং মনের বাঁধন, জ্ঞানের শাসন সমস্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আহা, বিজ্ঞানের পাগলকে কেন সন্তোষিণী প্রেমে পাগল করিল! ইচ্ছা অমুরাগ আশা পিপাসা এবং প্রাণের সমগ্র টান একটিকে ছুটিতেছে, দুর্দল কর্তব্যজ্ঞান তাহার গতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করিতেছে। ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর কঠোর কর্তব্য। সহজে স্বইচ্ছায় কে তাহা করিতে চায়? কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগস্বীকারের যথার্থ পরিচয় এই ধানে। যে চিরকাল কষ্ট-সহিষ্ণু, হৃৎস্পেতেই যে চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছে, তাহার কষ্ট বহনকে প্রকৃত বৈরাগ্যের নিদর্শন বলা যায় না। ভগবানকে ভালবাসিয়া তাঁহার প্রেমের অমুরোগে যে ব্যক্তি সকল সুখে ললাড়পি দিতে প্রস্তুত হয়, এবং

কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকার করে উদ্ধার দর্শীর বৈরাগ্যো এবং ভগবৎ-
প্রেমানুরক্তির দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। দৈবশক্তির বিশেষ সাহায্য
বিনা ইহা কেহ পারে না।

বাহ্যারাম মনে মনে এইরূপ বিচার আরম্ভ করিলেন ;—“রক্ত মাংস অস্থি
ক্লেদবিশিষ্ট করা বার্কিকা মৃত্যুর ধ্বনি যে শরীর ভাঙতে কেন আমি প্রলুব্ধ
হইব ? পৃথিবীর অসার মেহ মমতা প্রীতি সৌজন্য সেবা ভক্তি তাই বা
কত ফলের জন্য ? এ জগতে যদি এক গুণ সত্য প্রেম দেখি, তাহার সঙ্গে
সহস্র গুণ হিংসা ছেদ নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা কি দেখিতে পাই না ? অতঃপর
রূপও মিথ্যা গুণও মিথ্যা, সত্য কেবল প্রেম। তাই বা কিরূপে বলিব ? এ
পৃথিবীতে কার সঙ্গে কত দিন প্রেম থাকে ? সভ্যসমাজে একদিকে যেমন
কোটশিপিও হনিমুন সন্তোষের আড়ম্বর, অপর দিকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে
ডাউভোর্সেরও ডেমনি সমারোহ। রূপ যৌবনসমৃদ্ধ প্রেম, নীচ স্বার্থশ্রুত
ভালবাসার পরিণাম ফল দেখিয়া প্রেমকে আর প্রেম বলিতে আমার ইচ্ছা
হয় না, উহাকে ইন্দ্রিয়বিকারজনিত মোহপ্রলাপ বলিলেই ঠিক হয়।
অবশ্য অকৃত্রিম নিম্নার্থ প্রেম নিত্য বস্তু, তাহা আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু
সে বস্তু কোথায় ? প্রেমও অনেক স্থলে সাময়িক বিকারমাত্র। যে প্রেমে
চুইকে এক করে, বাহ্য মন্থমে মরমে পলিয়া মিশিয়া চুই এক হইয়া যায়,
বাহ্য পরস্পরবিরোধী পদার্থকেও মিলাটের দেয়, সেই মিষ্ট প্রেম, অপার্থিব
আধ্যাত্মিক প্রেম আমি চাই।”

বাই তিনি এই কথা বলিলেন, অমনি তাহার দেহপূরনিকাসী রিপূ-
পরিবার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল, “কি এমন কথা ! তবে
আমরা কি কেহই নই ? আমরা কি কেবল মৃত ভড়পিও মাত্র ?” ইন্দ্রিয়-
গণ মহা ক্রোধে অভিমানে আফালন করিয়া তরলক তর্জুন গর্জন আরম্ভ
করিল। প্রবৃত্তির অশ্রমমহলে মাকান্না উঠিল ; বহুপন্থিক কুলীন ভ্রাস্করণ
মরিলে তদীয় বিধবাগণ যেমন এক সঙ্গে ক্রন্দন করে নিরুত্তির কথা স্রবণে
প্রবৃত্তিগণ এক সঙ্গে ডেমনি চীৎকার রবে এই বলিয়া কাঁপিতে লাগিল ;—
“হার, আমাদের সাধ পূর্ণ হইল না ! পিপাসা মিটিল না ! যৌবনে, পদা-
র্পণ করিতে না করিতে আমরা বৃদ্ধ হইলাম ! পৃথিবীযাজন, অপভ্রাতার

মুখাবলোকনম্পূৰ্ণ। চরিতার্থের পূর্বেই আমাদিগকে বৈরাগী বনচাঁরী হইতে হইল। যে জন্য পৃথিবীতে মানবদেহে জন্ম লইয়াছিলাম, তাহার কি করিয়া গেলাম? এ ভ্রমত মরিলেও বাবে না। হায়! হায়! কি নিষ্ঠুরতা। পিপাসা উদ্দীপন করিয়া শেষ কি না! মুখের মধ্যে অন্নরস ঢালিয়া দেওয়া!” মাধকজ্ঞাপাস্ত্রত ঘোর মধ্যপানী অহিহেনসেবীর ন্যায় রিপু ছয়জন উদ্ভাষ প্রায় হইয়া মাথা খুঁড়িতে এবং চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেহ বলে আমি গলায় ছুরি দিব, কেহ বলে জলে ডুবিয়া মরিব; কেহ অঙ্গে ভষ্ম মাখিয়া কলপ পরিয়া মাথা মুড়াইয়া ফকীর হইতে চার, কেহ বকে করাঘাত হানে; এইরূপে তাহারা ক্রন্দন কোলাহলে গগন মেদিনী আকুল করিয়া তুলিল। যৌধন বয়সে একরূপ বৈরাগ্য অনাসক্তি আন্তরিক, সুতরাং অর্থ্য তাহাও বলিতে বাকী রাখিল না। শরীরের আত্মীয় বন্ধ কুটুম্ব কুটুম্বিনী অনেক, তাহারা সকলে মিলিয়া বধন হা হতোহ্মি আর্তনাথ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন বাহ্যারাম বড় বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু সেই বিষম কোলাহল গুণগোলের ভিতরেও মূহুরে কাণে কাণে বিবেক বলিতেছে, “তুমি উদ্ভাষের আর্তনাথে তুলিও না, এবং তর্জনে গর্জনে ভীত হইও না। উহারা এইরূপে চিরকাল লোককে তুলায়। ধানিক পরে আপনিই এখন চূপ করিবে। এ সকল দুষ্ট বালকের হুটু স্তম্ভার ক্রন্দন।”

বাহ্যারাম আবার ভাবিতে লাগিলেন, “শান্তিও মিষ্ট, প্রেমও সুখময়। যে প্রেমবিলু আমার নীরস প্রাণে রস সঞ্চার করিয়াছে আমি তাহার সিদ্ধিতে কবে বাইব। তাঁহার কাছে পৌঁছিলে আমি নিত্য প্রেমানন্দ সন্তোষ করিতে পাইব। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী থাকিতে হায়, লোকে কেন এত কষ্ট পায়! কেনই বা হিংসা ঘেঁষ কলহ বিবাহ? প্রতি লক্ষ্যে লক্ষ্যেইত এই জুহুর প্রেম আছে। কেন তবে সমস্ত লক্ষ্য এক হইবে না? আহা! আমার ঘাটা ছিল না তাহা হইয়াছে। সন্তোষিনী আমার প্রেমের গুরু, তাহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া একা থাকিব। বিবাতা গোপনে বসিয়া কি শ্রবণ সুরভিময় পদ্মফুলটি আমার অন্য রচনা করিয়াছিলেন! এ স্বপ্নীয় মুখা কি আমি পান করিবার উপযুক্ত? তবু কেন তিনি আমায় দিলেন?

“নারীর সুকোমল প্রকৃতির নীতল ছায়ার বসিয়া আমার ভাগিত হৃদয়
আরাম সন্তোষ করিয়াছে, ইহা না হইলে আমার জীবনের একটা দিক শুকা-
ইয়া বাইত । পুরুষ প্রকৃতির মিলন ভিন্ন বধন দৃষ্টি রক্ষা পায় না, তখন
অর্ধ অঙ্গ ভাড়িয় আমি থাকিই বা কিরূপে ? স্ত্রীজাতির মধুর মূর্তি, সুকো-
মল স্মৃতি বচন, সহাস্য আনন, সরস ব্যবহার, উদ্বাসকর সহবাস ; তাহার
সঙ্গে একত্র উপবেশন, পান ভোজন, কৌতুক বিহার, নৃত্য গীত, আশোদ
প্রমোদ এটা উন্নত হৃদয়িত সত্যসমাজেরও বধন প্রচলিত প্রথা হেবিতে
পাই, তখন অবশ্যই ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় বিজ্ঞান আছে । বাস্তবিক
স্ত্রীজাতির সহায়তাপ্তে ইয়োয়োপীয় সভ্য জাতিরা এত উন্নত কার্যক্ষম এবং
সুখী । উঃ ! এটা কি প্রভূত শক্তি ! যে মহাবীর নেপোলিয়ানের স্তম্ভকে
সমরক্ষেত্রশায়িত শোণিতধারাবিগলিত লক্ষ লক্ষ মৃত এবং অর্ধমৃত সৈন্য
অর্জ করিতে পারে নাট, ভীষণ মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়িতেও বাঁহার মনে
শঙ্কা হইত না, তিনি জোসেফাইনের বিরহ স্মরণ করিয়া অধীর হইতেন ।
প্রেমশক্তি বাস্তবিকই বজ্র বিদ্যুৎ জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভৌতিক শক্তি
অপেক্ষা মহাতেজস্বিনী । জনসমাজের পরিচালক শক্তির মধ্যে এইটাই
সর্বপ্রধান । ইহার উপলক্ষে কতই রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লব হইয়াছে ! প্রেম
সুবহু কার্যের প্রবর্তক ।

“নারীসমূহ যে চিত্তবৃত্তি বিকাশের পক্ষে স্নান্যকর উপায় তাহাতে আর
সন্দেহ নাই । মিছে তত্ত্ব করিলে চলিবে কেন ? ইহার কলোপ-
ধারিতা বুঝিয়াই ইয়োয়োপীয়েরা যুক্তভাবে নারীসমাজে বিচরণ করে,
তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুতবে মিলিত হয় । এই জন্যই তাহাদের
দাম্পত্য প্রেমও অকপট এবং পরোক্ষিত,—প্রাচীরে দেয়া নহে । সামাজিক
নীতি, পারিবারিক শান্তি কুশল পবিত্রতাকে বাঁচাইয়া উচ্চ শ্রেণীর তত্ত্ব
সমাজ একরূপ স্বাধীন ব্যবহার যখন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তখন এটা এক-
বারে হাসিয়া উড়াইবার কথা নয় । সুসভ্য হৃদয়িত নরনারীদিগের
সামাজিক প্রযুক্ত ব্যবহারের ভিতরে নীতির শাসন জিতেদ্রিষ্টতা যথেষ্ট
হেবিতে পাই । বাস্তবিক চিত্তসংঘম ইয়োয়োপীয়দিগের জাতীয় মহ-
ত্বের একটা মহৎ কারণ । আমরা বাঙ্গালী হিন্দু, একরূপ শিক্ষা লাভের

আমাদের কোন উপায়ই নাই। এই জন্য আমাদের সামাজিক নীতি কঠোর অস্বাভাবিক হইয়া রহিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর প্রকৃতিবিরুদ্ধ শাসনে হিন্দুজাতি এক দিকে যেমন বদ্ধভাবাপন্ন, অপর দিকে তেমনি শিথিল। কোন বিষয়ে আঁটা আঁটি নাই। হায় ! কবে আমরা স্ত্রীজাতির মর্যাদা বুঝিতে পারিব। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সরস সামাজিক ব্যবহার না মিশিলে এ জাতির উন্নতি হইবে না।

“অপত্যস্নেহ, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুত্বের প্রণয় যদি দোষের না হয়, তবে নরনারীর সখ্যপ্রণয় কেন দোষের হইবে ? বিজ্ঞানের চক্ষে ত কৈ ইহা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। প্রেমও ত একটা বিজ্ঞানের তত্ত্ব বটে। আমাদের কি সাংঘাতিক নীতিসংস্কার ! এ নীতির মূলে কি কোন অপরিবর্তনীয় সত্য আছে ? ইহা ত বিশ্বজনীন নহে, আপেক্ষিক ; দেশভেদে, কালভেদে ইহা রূপান্তরিত হয়। অমূলক ভয় ইহার প্রসূতী, বদ্ধমূল প্রাচীন কুসংস্কার ইহার রক্ষক প্রতিপালক। সভ্যজাতির অবলম্বিত স্ত্রীস্বাধীনতা যদি দোষবিমিশ্র হয়, তবে কি হিন্দুর অবরোধ প্রথা দোষযুক্ত নহে ? এমন কোন নৈতিক নিয়ম আছে, পাত্রবিশেষে যাহার অপব্যবহার না হয় ? তথাপি স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্মিলন, পরস্পরের মধ্যে পবিত্র প্রেমালাপ, নির্দোষ আয়োজ ও বদ্ধতা যে একটা কল্যাণকর এবং স্বাস্থ্যকর সুখকর উপায় এবং জাতীয় উন্নতির পরম সহায় তাহা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব। এ বিষয়ে আমার কোন ভুল ভ্রান্তি নাই। অতএব এ কথা আমি সাহসে সহিত নির্ভয়ে বলিতে পারি।”

বাহ্যারাম শেষের কয়েকটা কথা খুব জোরে জোরে বলিলেন। গলার শব্দ এত বেশী হইয়াছিল, যে পাশের ঘর হইতে নিশানাথ তাহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “ভোকরা পাগল হইল না কি ?” বস্তুতঃ তিনি যেন বঙ্গদেশকে সম্মুখে রাখিয়া খুব উৎসাহের সহিত একা একা বক্তৃতা করিলেন। এইরূপ নির্জনে বক্তৃতা করিয়া করিয়া কত কত হিন্দুবা শেষ ব্রাহ্মপাদরী হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতা রোগ বড় বিষম রোগ।

পণ্ডিত বাহ্যারাম অনেক রকমের শাস্ত্র তত্ত্ব আনিভেন। উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার কোন দার্শনিক বা পক্ষপাত আছে কি না তাহাও বিচার

করিলেন, কিন্তু সে সব কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল হিন্দু জাতির বর্তমান রীতিনীতির উপর একটু বিরক্ত হইলেন। কি করিবেন, মানুষ সামাজিক অবস্থার দাস, এই ভাবিয়া শেষ চুপ করিয়া রহিলেন।

বাহ্যারাম বহুদর্শী সুবিদ্বান, এ স্থলে আমাদের কোন কথা বলা খোঁড়া পায় না। কিন্তু একটা কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। পণ্ডিতের জ্ঞান অপেক্ষা চরিত্র ভাল, মত বিশ্বাস অপেক্ষা প্রকৃতিতে বরাবর নিৰ্দোষ এবং বিশ্বাসী।

অনন্তর তিনি শেষ এই স্থির করিলেন, "হিন্দুসমাজ যখন ইহোরোপীয় সভ্যসমাজ নয়, তখন আমার প্রস্থানই একমাত্র প্রেরণ। অতএব রূপের ছায়া আমার কল্পনানৈত্র হইতে দূর হইয়া যাউক! কেবল প্রেমের চিহ্ন মূর্তি, মধুর সৌন্দর্য আমার আশ্রয় পান আহা হউক। আমি এমনি করিয়া যোগে ডুবিব যে তাহার মত্ততার একবারে বিহীন হইয়া থাকিব। আমি সেই প্রেমধামে প্রেমময়ের প্রেমবন্ধে প্রেমমগ্নী সন্তোষিনীর প্রেমমূর্তি দেখিয়া তাহার সঙ্গে নিত্য প্রেমবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া যোগানন্দে চিরকাল বিহার করিব।"

বহু তর্ক সূত্রি বিচার আলোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে বাহ্যারাম উপনীত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

বিদায় গ্রহণ ।

বাহ্যারাম একাকী বলিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, সন্তোষিনী নিকটে থাকিলে তাহা পারিতেন কি না সন্দেহ। এখানে কিরূপে প্রস্থান করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "যদি দেখা করিয়া বিদায় লইয়া যাই তাহা হইলে হয়তো আমার প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইবে, এবং আমি মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িব।" আবার ভাবিলেন, "না, তাহাও ঠিক নহে।

এতই কি আমি ভীৰু কাপুরুষ যে বাহা শ্রেয় বুদ্ধিযাছি তাহা কার্যো পরিণত করিতে পারিব না ? দোপনে পলায়ন অপেক্ষা সম্মুখ সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হওয়া প্রার্থনীয়।”

শারদীয় সান্ধ্যাগগনে অল্প অল্প শীতল বায়ু বহিতেছে, তৎসঙ্গে সদ্য-প্রক্ষুটিত সিকালিকার মৃদু সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। আকাশ অতি পরিষ্কার, যে কিঞ্চিৎ তরল মেঘ তাহাতে সঞ্চিত হইয়াছিল, ইতঃপূর্বে তাহা বারিধিরূপে বর্ষিত হইয়া ধরাকে সিক্ত করিয়াছে। তারাগুলি কৃষ্ণ-পঙ্কায় রজনীর ঘন অন্ধকার রাশির উপরে মূনীল আকাশপটে চিক মিক করিতেছে, ছায়াপথে খেতান নক্ষত্রপুঞ্জ সুদূরবর্তিনী শতজ্ঞ নদীর ন্যায় খোঁতা পাইতেছে। গৃহপরিবেষ্টিত উদ্যানের বৃক্ষ লতা সকল বৃষ্টির জলে গাত্র ধৌত করিয়া কৃষ্ণ বসন পরিধানপূর্বক দাঁড়াইয়া আছে; আর তদুপরি অগণ্য ধ্বংসাত্মিকা উড়িতেছে বসিতেছে নিবিতেছে জলিতেছে। তরুশাখা প্রশাখা পুষ্প পত্র হইতে মধ্যে মধ্যে জলবিন্দু করিয়া পড়িতেছে। সন্তো-বিগীর অবস্থাপ্রত্যঙ্গ। তিনি গৃহছাড়ের উপর একাকিনী গভীর শোকা-ভারাক্রান্ত চিন্তে নীরবে বসিয়া কাঁদিতেছেন, আর এক একবার তারকা-ধচিত অনন্ত গগনভিমুখে উজ্জ্বলিত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার মনের শান্তি বেন সেই উচ্চ আকাশের কোন অজ্ঞাত প্রবেশে গিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। এক দিন নির্বাপন তত্ত্বের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে যে অপূর্ব শান্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া এখন তিনি সংসারসমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গরাশির মধ্যে আশ্বলিত হইতেছিলেন।

এমন সময় মৃদু পান্ন বিক্ষেপে বিচ্ছিন্নকুলিত মনে বাস্তারাম তথায় উপনীত হইলেন। আজ আর সে প্রেম বিনিময়ের সুখের দিন নহে, আজ বিবাহের দিন, মহা শোকের দিন। প্রথমে বাস্তারামের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। আশ্রয় পর্বতের অগ্নি উলগ্নের ন্যায় তাঁহার ভাবরাশি তখন চক্ষু নাসিকা এবং মুখ দ্বারা দিয়া বেন উথলিয়া পড়িতেছিল। শরীর কণ্টকিত, মস্তকের কেশ সকল উন্নতমুখী, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত। সন্তো-বিগী সেই অশ্রুবিগলিত মুখাবিবন্ধ অব-

লোকন করিয়া আপনিও আঁধারীতে ভাসিতে লাগিলেন। মহা শোকে আচ্ছন্ন এবং ব্যাকুল হইয়া উত্তর উত্তরের স্বরে মন্তক স্থাপনপূর্বক অশ্রুপূর্ণ নিঃশব্দে কাঁদিলেন, উত্তরের নয়নজলে উত্তরের গণ্ডস্থল গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ অভিষিক্ত হইল। অনন্তর শোকাবেগ কথকিৎ প্রশমিত হইলে বাস্তারাম গদগদ স্বরে বাম্পাকুলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “দেখ সন্তোষিনী, পৃথিবীতে আর সকল সামগ্রীই পাওয়া যায়, কিন্তু অকৃত্রিম সরল মধুর ভালবাসা বড়ই দুস্প্রাপ্য। সুখাতুরকে অন্ন, তৃষিতকে পানীয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন এবং নিরাশ্রয় বিপন্ন জনকে আশ্রয় দিবার লোক এ পৃথিবীতে অনেক আছে; কিন্তু জন্মের প্রেমপিপাসা কেহ চরিতার্থ করিতে পারে না। নিজের জন্যও আর তত দুঃখ করিত ইচ্ছা হয় না, তুমি অনাধীনো অবলা সুইশ্বেগ্ৰহা-সিনী, তোমার অবস্থা ভাবিয়া আমার জ্বর কাটিয়া যাইতেছে। তোমার সুখ শান্তিতে এখন আমার সুখ শান্তি। তোমার হাসিমুখ দেখিলে আমার মুখে হাসি বাহির হয়। হায় আমি তোমাকে প্রাণ তরিয়া আদর বৃত্ত করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা ছিল, সেবা করিয়া ভাল বাসিয়া তোমার বহুদিনের সঞ্চিত ভালবাসার ঞ্ণ কিছু পরিশোধ করিব, তাহা কৈ হইল। কেনই বা তুমি আমার ভালবাসিলে? যদি ভালবাসিলে তবে যেমন তাহা বহু বৎসর গোপনে ছিল সেই ভাবেই কেন রাখিলে না? যদি বা প্রকাশ করিলে তবে বিধাতা কেন আবার তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন? সেই প্রেমিক চতুরচূড়ামণির বৃদ্ধ এইরূপই খেলা? তিনি চোরকে বলেন চুরি করিতে, আবার গৃহস্থকে বলেন সাবধান হইতে। অববা আমাদিগকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইবার জন্য ইহা শিক্ষা এবং পরীক্ষা। বেশ! বেশ! তাই হউক! তোমার ঐকান্তিক ভাল-বাসা যে দিন হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সেই হইতে আমার চিত্ত উদ্ভাবন হইয়াছে, প্রেমের জলন্ত অগ্নিশিখা আমার জ্বরে দূ-দু করিয়া জলিতেছে, তাহা আর নিবিলে না। সেই আশ্রমে আমি জলিয়া পুড়িয়া থাক হউব, মরিয়া যাইব, তাহার পর বধন তোমার ঐ প্রেমবিন্দুর সাহায্যে অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে গিয়া মিশিব তখন সকল

জ্বালা জুড়াইব; তখন নবজীবন পাইয়া নিত্যপ্রেমে তোমার সঙ্গে চিরবাস হইবে। তোমার মধুর ভালবাসা দেখিয়াইত আমি সেই প্রেমের সাগর অনন্ত গুণাকর রসিকচূড়ামণি ভগবানকে চিনিতে পরিলাম। তিনি যে কি সুন্দর রসময় তাহা তোমার উপলক্ষে শিখিয়াছি। এবং তিনি আবার কেমন হিতৈষী মঙ্গলাকাজী শাসনকর্তা তাহাও এখন বিলম্ব বুঝিতে পারিতেছি। মানুষতলকে লইয়া কেবল যেন খেলা করা! দৃষ্টি স্থিতি পালন কেবল কথা মাত্র, খেলাই উদ্দেশ্য। তা বেশ হয়েছে, তিনি যা করেন তাই ভাল। আমি কিছু বুঝি স্থাব না, তিনি জানী, তিনি প্রেমিক, লীলারসময়, তিনি সব।

“কিন্তু এই যে তোমার প্রেম, যে প্রেমের স্বচ্ছ দর্পণে আমি সেই অনন্ত প্রেমময় পুরুষের অতুল ঐশ্বর্য এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আভাস পাইলাম ইহা কি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয় নয়? অবশ্য ইহা নিরাকার আধ্যাত্মিক শক্তি। প্রকৃত পদার্থটী যদি হইল আধ্যাত্মিক, তবেত দেহ-বিচ্ছেদের ইহ পরকালে আমরা ইহা সন্তোষ করিতে পারিব!”

সন্তোষিণীর মুখে একটি কথাও বাহির হইল না। তাহার উন্ন প্রভবণের ন্যায় চক্ষু দুইটী হইতে নিরন্তর উত্তপ্ত বারিবিন্দু তখনও বাহ্যারামের পৃষ্ঠ বহিয়া পড়িতেছিল। অতঃপর সেই রোক্তদ্যমানা বিরহকাতর্য কামিনী স্তব্ধ হইতে মস্তক উঠাইয়া স্থির সজলনেত্র এক দৃষ্টে বাহ্যারামের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এত ক্ষণ যে সকল মহা বৈরাগ্যের কথা শুনিলেন তাহাতে তাহার প্রেমসিদ্ধি উছলিয়া উঠিতেছিল, এবং তাহার গূঢ় অর্থ তোন্ধ লৌহ শলাকার ন্যায় মর্শ্বস্থানকে বিদ্ধ করিতেছিল। শেষ বধন শুনিলেন প্রেম আধ্যাত্মিক, দেহের অদর্শনেও তাহা ভোগ করা যায়, তখন বিচ্ছেদের ভীষণ মূর্তি দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

বাহ্যারাম পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, “যদি আমরা পতি পত্নীর সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া দুই জনে গৃহপ্রমে থাকিতাম, তাহা হইলেও নির্ঝিন্দে এই প্রেমব্রত সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ, তাহাতেও অনেক বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। অত্যন্ত বসিষ্ঠতায় নিভাত প্রার্থনীয় বস্তুর পুরাতন নীরস হইয়া যায়। প্রেম প্রেমকে বিবাহ করিয়া

নিতায়োগে সুখী হয়, যে পথের প্রতিবন্ধক কেহই হইতে পারে না ।
দেহবিমুক্ত যুগল আত্মা নিকাম ভাবে পরস্পরের প্রীতি সম্ভোগ করিবে,
দেশ কালের বাবধানে ইহার কোন ক্ষতি নাই । সকাম প্রীতি অপেক্ষা
এই নিকাম প্রীতিই বাহুণীয়া ।”

এই সকল সারগর্ভ বচন শ্রবণ করত বহু ক্ষণ মৌনবে থাকিয়া সন্তো-
ষিনী বলিলেন, “বিবাহিত জীবনে প্রেম সাধনে যে বহু বন্ধ আছে বলিলে
তাহার অর্থ কি ? এরূপ কথা কখন ভাবি নাট ।”

বান্ধারাম হাসিয়া বলিলেন, “বিবাহ অনিবার্যের কথা নয় ; বিবাহও
জানিবে অধিকাংশ স্থলে স্বেচ্ছাচারের অন্য একটি নাম । সমাজের সাহায্যে
বৈধভাবে বঞ্চেচ্ছাচার সচরাচর বিবাহের উদ্দেশ্য । আধ্যাত্মিক প্রেম সাধন-
জন্য পার্থিব সংশ্রব ত্যাগ করিয়া এ পথে যিনি চলিতে পারেন তিনিই
মহাপুরুষ । কিন্তু সে পথে কে যাউতে চায় ? বৃদ্ধ বয়সে কি নিবান
কালে কারো কারো সে ভাব হয় এই মাত্র । কোন প্রকার পার্থিব সুখ
বাসনা থাকিলে আধ্যাত্মিকতার বাধাত অগ্রে এবং ততাত্ত কালে
মোহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । অগতঃ বাস্তবলক্ষণ ভিন্ন কিছু অসামান্য
বিষয়ের ধারণা হয় না, ভাববস অগ্রে না, নিষ্ঠুরে প্রেম শুকাইয়া যায় ;
সুতরাং সুলের সাহায্য ব্যতীত সূত্র পরীক্ষণ অগতঃ প্রবেশ করা সম্ভবের
পক্ষে অসম্ভব । কেবল জ্ঞান ও ভাব উপাধি, আধ্যাত্মিক প্রেমচ্ছবির
প্রকাশ জন্য প্রথমে মূল স্পর্শনীয় বাহ্য পরার্থের আশ্রয়, পরে যথা সময়ে
তাহা হইতে উপকারিতা লইয়া অন্তর্মুখে যে সমন করিতে পারিল সেই
বাঁচিয়া গেল । চিরন্তন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে লোকে বাহ্য উপকরণ, বিধি
নিয়ম গুরু আচার্য্য সাকার মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি
সেই দৃশ্যমান মূল জড়ে অড়িভূত হইয়া পরে চৈতন্যের রাজ্যে আর
অগ্রসর হইতে পারে না । ক্ষেমসাধনেও ঠিক তাহাই ঘটে । প্রকৃতির
সঙ্গে পুরুষ মিলিত হয় প্রেম মহাভাব উপার্জনের জন্য, কিন্তু শেষ ইন্দ্রিয়-
বাহ্য অস্থি মাংসের রাজ্যে আশ্রয়রা হইয়া তাহার মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া
যায় । এই জন্য বলিতেছিলাম, এ পথে অনেক বিঘ্ন আছে । আচ্ছা
বল দেখি, প্রেম বড় কি রূপ বড় ?”

সন্তোষিনী । প্রেমই বড় । প্রেমতেই রূপের প্রতি এত আকর্ষণ উপস্থিত করে । প্রেমের গুণে কুরূপও সূন্দর দেখায় । তবে একটা কথা এতে, রূপতৃষ্ণা নিবারণিত না হইলে সাধারণতঃ প্রেমে রুচি জন্মে না ।

বাগ্ধা । আমি কিন্তু তোমার সেই প্রেমকেই সর্বাপেক্ষা লোভের সামগ্রী মনে করি । দেহের উপলক্ষে সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় এই জন্য তোমার দেহও আমার বড় ভ্রাতা এবং আদরের সামগ্রী । ইহা যদি শ্রীহীন রূপ ভগ্ন ব্যাধিযুক্ত হয়, তাহা হইলে আরো স্নেহ যত্নের সামগ্রী হইবে ।

এ কথা বাগ্ধারামের কত দূর সত্য তাহার প্রমাণ প্রয়োজন । প্রেমমোহে মোহিত এবং আত্মপ্রবলিত হইয়াও মানুষ একরূপ উচ্চ নিস্বার্থ ভাব অনেক সময় ব্যক্ত করিয়া থাকে ।

সন্তো । আমি প্রেম এবং রূপ উভয়ই ভালবাসি । আত্মাও চাই, শরীরও চাই । সাকার নিরাকার দুইয়েরই প্রয়োজন । শুধু নিরাকার মনে হইলে প্রাণ যেন হাঁপ হাঁপ করে । আমরা মেয়ে মানুষ, অত সূক্ষ্ম জ্ঞান ধরিতে পারি না ।

বাগ্ধা । আমিও কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি ? ঠিক কথাইত তুমি বলিতেছ । "আগে স্থূল তার পর সূক্ষ্ম ; অঙ্গের শরীর পরে আত্মা । দেহ ব্যতীত প্রেম নিগুণ হইয়া পড়ে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না । মাতৃস্তন, জাহার স্নমিষ্ট স্নেহকোল, সূক্ষ্মস্পর্শ বাহুবল্লভ, মধুমাধা সাক্ষর বচন, প্রেমালিঙ্গন চুম্বন যদি না থাকিত, তাহা হইলে মাতৃত্ব কি কেহ বুঝিতে পারিত ? না মাতৃত্বভক্ত জগিতে ? মানবদেহ জড় অসার, কিন্তু সামান্য সামগ্রী নহে, দেবতার মন্দির, হরির লীলাধাম ।

সন্তোষিনীর এ কথার মুখে হাসি বাহির হইল । কিন্তু সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মলিনভামিশ্র অল্পজ্বল ।

বাগ্ধারাম বলিলেন, "আমরা বাহা চাই তাহা পাইয়াছি ; কারণ, আমি তোমার হইয়া গিয়াছি, তুমিও আমার হইয়া গিয়াছ, তবে আর বাকী কি আছে ? আমি তৃপ্তকাম হইয়াছি, যেহেতু তুমি আমার আত্মহ । তুমিও এইরূপে তৃপ্তকাম হও, যে বেশে বিচ্ছেদ নাই সেই যোগের রাজ্যে বসিয়া চিরপ্রেম সন্তোষ কর । এ প্রাণের গূঢ় যোগ মরিলেও বাবে না,

বিচ্ছেদেও ভাঙিবে না। যেখানে থাকি উভয়ে একাত্মা এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া সুখে বিচরণ করিব। দেশ কাল আমাদ্বিককে ব্যবধান করিয়া রাখিতে পারিবে না। যেখানে ভয় বিকার শোক দুঃখ জরা মরণ হাসি কান্না সেখানে আর থাকিব না, চির আনন্দের অমর গামে অনন্ত প্রেমময়ের বন্ধে বাস করিব। কেমন, ইহা কি আত্মাদের সমাচার নয় ?”

সন্তোষিনীর মুখ প্রফুল্ল হইল, একটু সাহস ভরসা আশা উৎসাহের জ্যোতি জলসিক্ত নবনমুগলে দীপ্তি পাইল। তাহা দেখিয়া বাহ্যারাম আবার বলিলেন, “সেই পরম পিতা পরম মাতা পরম বন্ধু প্রাণসম্বাই আমাদের চিরপ্রেমমগ্ননের ভূমি। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা ঐহিক সম্বন্ধ হইতে একবারে চিরবিদায় লটব।”

“বিদায়” শব্দ শুনিবামাত্র সহসা সন্তোষিনীর সেই সহাস্য চন্দ্রানন বিবাদের ঘন মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। মুখ যেন কালী বর্ণ হইয়া গেল। হস্ত পদের বল শিথিল হইল। অবশেষে ঘাড় ভাঙিয়া পড়িল। যেন মৃতের ন্যায় মুচ্ছিত হইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

যখন এইরূপ দশা ঘটিল তখন বাহ্যারাম কি করিলেন ? তিনি খীর ইচ্ছা-শক্তিকে সংযত, দনীভূত করিলেন এবং সেই ইচ্ছাময় পরমপুরুষের জলন্ত প্রভাব ধারণ করত একাগ্র চিত্তে সন্তোষিনীর ঈষদোদ্যোলিত চক্কের দিকে চাহিয়া তাঁহার মস্তক এবং পৃষ্ঠে হস্তামর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাশক্তির আশ্রিত তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক তেজে সন্তোষিনীর দ্বিবা জ্ঞানের উদয় হইল, এবং তিনি তাঁহার চক্কের উপর চক্ষু স্থাপন করিয়া শেষ উদ্গাদন হাস্য করিলেন। মেঘাচ্ছন্ন গগনের নিবিড় অন্ধকার প্রদেশে যেমন বিদ্যাতালোকের ছটা প্রকাশ পায় তদ্রূপ সেই হাসির উজ্জ্বল ছটা। সন্তোষিনী বাহ্যারামের পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক প্রেমভক্তের মর্মে তখন বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিদ্রাবস্থায় কোন দেবদূত আসিয়া যেন কাণে কাণে সে সকল মহাবাক্যের গভীর অর্থ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গেল। বলিলেন, “তবে কি আমার সকল আশায় ভাঙ পড়িল ! চকল চপলার জ্যোতি অনন্ত আঁধারে ডুবিয়া গেল ! ভবিষ্যৎ প্রাণ খীভল জলাশয়ে জল পান করিতে

গিয়া শেষ হৃদয়বাণী ঘোর দাবানলে পরিবেষ্টিত এবং দগ্ধ বিদগ্ধ হইল ! মহাবেগে ছুটিতেছিল যে হৃদয়ের নদী তাহাকে কে যেন ভৌমবলে ঠেলিয়া উৎসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিল। সুকোমল প্রেমকুসুমকালিকা বসন্তের সুবিমল সমীরণ হিল্লোলে, তরুণ তপনের দ্বিগুণ উত্তাপে ফুটিয়া উঠিতেছিল এমন সময় অদৃষ্টচক্রে নিদারুণ প্রহারে তাহাকে চির বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল ! এটা সুখ, না দুঃখ ? অথবা দুঃখেতেই সুখ ? ঠাকুর কত লীলাই দেখাইলেন ! দুঃখ অন্ধকারের ভিতর তাঁর লীলা দেখিতে বড় মন্দ নয়। আমি এবার দুঃখে সুখী হইব, আঁধারে আলোক দেখিব, ঘোর বিপদের মধ্যে শান্তি সন্তোষ করিব, অবস্থান্তরের ভাবণ আন্দোলনে পড়িয়া, ভয় নিরাশ বিরহ সন্তোষে জর্জরিত হইয়া অনন্ত নির্ঝঞ্ঝে মিশিয়া যাইব। মন, আর তুমি অধীর হইও না। দুঃখাত্তর নির্মূল দর্পণে লীলাময়ের নবলীলা দর্শন কর। এমন হৃদয় রূপ আর অন্য সময় দেখিতে পাইবে না। পরীক্ষার তুর্জয় আঘাতে হৃদয় ভগ্ন চূর্ণ করিয়া ঠাকুর কেমন হাসিতেছেন ! আহা ! তবে আমিও হাসি ; হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। ঠাকুর, মানবজীবনে যন্ত্রণাও অনেক। কিন্তু যন্ত্রণার ভিতরে আবার তোমার অপরূপ লীলাও অনেক দেখিতে পাই।

“সন্তোষিণি, তুমি বড় অভাগিনী। এখনো কি তোমার এ সংসারে সুখ-ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে ? এখন অন্ধকারে বসিয়া নিরাকার ভোজন কর, শূন্যে উড়িয়া বেড়াও। এই জন্যই বুঝি প্রভু আমাকে এত কাল মায়াচক্রে আঁধারের মধ্যে ঘুরাইয়াছিলেন ? ভালবাসি কেন তাও তিনি বুঝিতে দেন নাই। তিনিই সত্য, আর তাঁর প্রেমই সত্য, আর বাহ্য কিছু সব ফাঁকি, যাত্ৰকের ভোজবাজী। যা হউক, বেশ হইল, বাঁচা গেল। যাঁর ধন তাঁর কাছে ফিরে গেল। আমরাও চল এখন সেইখানে গিয়া ঠাণ্ডা হই, প্রাণ শীতল করি। এই লও ঠাকুর, তোমার ধন তুমি লও, লইয়া বাহা ইচ্ছা হয় কর।”

এই কথা বলিয়া দুই জনে মন খুলিয়া খুব একবার হাসিলেন। দুঃখ বিপদে পড়িয়া এক প্রকার নূতন বিধ আনন্দ অমুভব করিলেন।

ভালবাসার লোকের সহিত হৃৎ ভোগেও অনেক সুখ আছে। তখন মহা-
বৈরাগ্যের আনন্দে চিত্ত সবল হইল, জ্বর শান্তি লাভ করিল, আমার
অনিত্যা সুখলালসা মন হইতে চলিয়া গেল। এখন আর মনে লোভ নাই,
সুতরাং কোভেও নাই; আশা পিপাসা নাই, ভয়ও নাই। অন্তরবিকার বধন
চলিয়া যায়, মন যখন নিস্পৃহ নিরাকাজ্ঞ হয়, তখন মনুষ্য সুখ হৃৎকের
অতীত পরম শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকে। এই শান্তিই প্রাচীন আৰ্য্য-
বৌদ্ধধর্মের স্পৃহনীয় ছিল। সম্ভোষিনী এত দিনে গরলের তিত্তর অমৃ-
তের আশ্বাদন পাইলেন এবং মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতের গর্ভে
পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহার প্রেমবিকসিত বচনে মধুর হাস্যশ্রবণ করিতে
লাগিল এবং বিবাক্তান প্রভাবে যখন তিনি বীরনারীর মায় ঐ সকল উচ্চ
বৈরাগ্যের সুমিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, তখন আমার বাস্তবায়নের জ্বরে
শোকসিন্দু মহাবেগে উথলিয়া উঠিল। এমন জীবনসঙ্গিনীকে ছাড়িয়া বাইতে
হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অতিশয় কান্দতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়সখীর
হাত দুই ধানি নিজবক্ষে স্থাপনপূর্বক ব্যাকুল চিত্তে বলেবলে আমার
কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “দেখ, আমি আমার জ্বররহিত উদ্দামন করিয়া
সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি। এখন আমার এই অনুরোধ, যে তুমি
আমার সগায় হইয়া মা আনন্দময়ী বিশ্বপ্রসবিনীর লবতলে আমাকে
পৌছিয়া দিবে। তুমি সেই অধিলমাতার প্রতিবিশ্বরূপা, তাঁহার প্রকৃ-
তির মাধুর্য্য রসের কণিকা তোমার জ্বরে আছে। তুমি মেহের প্রতিমা,
প্রেমের পঞ্চবর্ষক। তুমি আমার উপরে সেষ্ট স্বর্গীয় শক্তি সংক্রামিত করি-
য়াছ। আমি বাস্তবিক অকর্তৃব্য হইয়া পড়িয়াছি, চলিবার আর শক্তি নাই।
তোমার সঙ্গে মিশিয়া অন্তে যেন আমি সেই প্রেমসরসে গিয়া পড়িতে
পারি। আমিও এ জীবন তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।”

সম্ভোষিনী তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন, বাস্তবায়নকে সুমিষ্ট বচনে আশা-

- * বাক্য প্রদান করিলেন, উচ্চ বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের কথা বলিলেন, সাহস
- * ভরসা দিলেন, স্বার্থ বর্জবজুর ন্যায় কাব্য করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

বনপ্রস্থান ।

বধন এক স্থানে থাকিয়াও তাঁহারা দুই জন যোগরাজ্যে অতীশ্রিয় অগতে বাস করিতে লাগিলেন তখন উভয়ের প্রাণ পূর্ণ হইল । ভালবাসার সামগ্রী বস্তু অণু বাহিরে অবস্থিতি করে তত অণু তাহার আংশিক সন্তোষ হয়, তদনন্তর আত্মস্থ এবং প্রাণস্থ হইলে আর বিচ্ছেদের ভয় থাকে না, তখন উভয়ে তদন্তর লাভ করে । এই যোগের অবস্থায় দুই জনে বধন অবতরণ করিলেন, তখন আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, একাধারে প্রকৃতি পুরুষের মিলন হইল ।

মৃত্যুকালে যেমন লোকে সংসার ছাড়িয়া যায়, সেই ভাবে আত্মীয় বাক্য পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বন্ধন কাটিয়া একাকী উদাসীন বেশে বাহ্যরাম বহুরিকান্দের অভিশ্বে চলিলেন । মনে কোন বিষয়ের জন্য আর এখন আশা নাই, অপেক্ষা নাই ; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিরাকাক্ষ হইয়া চলিলেন । জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সুমিষ্ট সুধকর বোধ হইতে লাগিল । গ্রাম নগর, পুর জনপদ, পথ প্রান্তর, নদী সরোবর, কানন ভূধর, জড় উদ্ভিদ, পশু পক্ষী আকাশ অন্তরীক মানব মানবী যেখানে বাহা কিছু দেখিলেন তাহাতেই হৃদয়ের ভাব উথলিয়া উঠিল । একমাত্র এখন সঙ্কল্প যে, একটী নিরাপদ নির্জন স্থানে বসিয়া কিছু কাল যোগসাধন করিবেন । যে নিগূঢ় প্রেম-তন্ময়ের মধুর রসে হৃদয় উদ্বেলিত হইল তাহাতে সিদ্ধকাম হইবেন এই বাসনা ।

পথে টেনে যে গাড়ীতে বাইতেছিলেন সেই গাড়ীতে একটা দেশহিতৈষী ভিখারী বাবু ছিলেন । তাঁহার গায়ে আলপাখার চোখা, নাকে আইগ্লাস, মাথায় পিরানীপাগড়ী, বুকে ঘড়ির চেন, যুখে চুরট এবং চাপড়াড়ি ; চেহারা খানি বেশ রকমসই । হাতে এক খানি কেতাব । মার্ক্জার যেমন যুধকের প্রতি লক্ষ্য করে, আড় চখে আড় চখে চাহিয়া তেমনি তিনি

দেখিলেন, একটা গভীর মূর্তি ভক্ত মুখা দ্বির ভাবে জমনা মনে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া আছে। তাঁর নিকট উঠিয়া আসিয়া “হ্যালো ! মিষ্টার বনার্জী, হাউ ডু ইউ ডু ?” এই বলিয়া হাত ধরিয়া সঙ্গেসঙ্গে এক সেকহ্যাণ্ড। বাহ্যারাম ফেল ফেল করিয়া মুখ পানে চাফিয়া অতি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “মহাশয়ের নামটী কি ?” “ও মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমাকে চিন্তে পার্বে না ? সেই যে !” হুঁর নামাইয়া আস্তে আস্তে “চোরবাগানে আমার বাড়ী, আমার নাম অলীকচন্দ্র দাস বোম্ব, হাইকোর্টের এক অনারেরল দ্বারকানাথ মিত্র আমার ভগ্নীপতি হইতেন। আমি আকুলের রাজবাড়ীর বৌহিত্ত সন্তান। আপ-নার বাড়ী, আপনার মাতুলালয় এ সমস্তই আমার জানা আছে। বসন্তপুত্রের খেলাত মল্লিক, বিনি ম্যাকেনাল মেকেঞ্জির বাড়ীর মুখুন্দি, তিনি আমার মায়ামুন্দির। অনেক বার আপনাদের গ্রামে গিয়াছি। সেখানকার জমিদার বরদাপ্রসন্ন বাবু আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি আমার টেডেন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু চাঁদাও দেন। (হাস্যমুখে) আপনার সঙ্গে এক পাটিতে কত বার যে আমি আমোদ করিছি ! হার হার ! সব ভুলে গেছ ভাই।”

বাহ্যারাম অবাক। একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের বিষয়কণ্ড কি করা হয় ?”

অলীক বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “হঁঃ বিষয়কণ্ড ! বিষয়কণ্ড আর কি, জনসেবা ! বরের খাইয়া বনের মহিষ শাড়াই। পৃথিবীর চিত্তে সমস্ত জীবন অর্পণ করা হইয়াছে। আপনার স্ত্রী পুত্রের সেবাত সেবাল কুকুরেও করিয়া থাকে গা ! স্ত্রী ব্যাটি কানের কাছে দান দান করে কেঁধে মরে, কত কি বকে, কিন্তু আমি বাড়ী গেলে ত ! পথে পথে বিবেশেই কাটাইয়া দিই। পরহিতে বদি প্রাণ না দিলাম তবে আর বাঁচায় হুঁ কি ? হার স্বার্থপর বাঙ্গালী জাতি, কত দিনে এরা বহেবহিষ্টমৌ হইবে ! মহাশয় অনেক সংকর্ষা করিয়া থাকেন আমি শুনিয়াছি। কাগজেও আপ-নার নাম আমি দেখিয়াছি। আপনার মত বিদ্বান হুণ্ডিত পরোপকারী ব্যক্তিকে দেখিলেও পূবা আছে। আপনি কি আমার কটন শিল্প বিদ্যা-লয়ের কথা শুনেম নাই ? সম্প্রতি এই নামে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল স্কুল

মোলা হইয়াছে। শুনেছেন বৈকি, আমি যে আপনার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আনিয়াছি। (সর্বৈব মিথ্যা) আপনার মাতুল বিধবা-বিবাহের এক জন উৎসাহদাতা বন্ধু আমি সকলই অবগত আছি।”

অলোক বাবুর অধিকাংশ কথাই অলোক, কিন্তু তাহা এমনি লোকরঞ্জক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্মগরিমা-প্রতিপোষক যে, সহজেই তাহাতে রাজ্য জমিদার ধনী ভোবামোদপ্রিয় ব্যক্তির টাকা বাহির করিয়া দেয়। বাবুর হস্তস্থিত পুস্তক খানি আর কিছুই নয়, তাহাতে চাঁদাদাতৃগণের নাম লিপিবদ্ধ আছে, এবং তাঁহার কৃত কীর্তিকলাণের উদ্দেশ্য বিষয়ক মুদ্রিত অমুঠান পত্র আছে। আর ঐ সম্বন্ধে ধন ধাঁহার নামে হৈরাজি সংবাদপত্রে প্রণয়িত ঘোষিত হইয়াছিল তাহা সংগৃহীত আছে। উহা দেখাইয়া নামলুক নিকটো ধনীর নিকট চাঁদা আদায় করা হয়। চাঁদাদাতৃগণের নামের মধ্যে অনেকেই টাকা দেয় নাই, দিবে যে তাহার কোন কথাও হয় নাই, তথাপি নাম আছে। তাহা দেখিলে অন্য টাকা দিবে। ভিখারী বাবুর নিজগৃহজাত দুই পাঁচটা কন্যা বাহা ছিল তাহাদিগকে লইয়া এক্ষণে স্কুলে গেল। পারিতোষিক বিতরণের সময় তিনি বৎসরান্তর পাড়ার ছোট ছোট বালিকাদিগকে খেলনা পুতুল ও মেঠাই সন্দেশের লোভ দেখাইয়া একত্র বড় করেন। এ সকল ফাঁকির ব্যাপার স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু একবার ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই হইতে গবর্ণমেন্টের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। প্রতারণার জন্য শ্রীবরে বাওয়ারও আয়োজন হইয়াছিল, ইনস্পেক্টর বাবু কোন রকমে বাঁচাইয়া দেন। তাহার পর হইতে সাধারণ চাঁদার দ্বারা বাবুর স্কুল চলে, অর্থাৎ তাহার সংসার চলে। নিজের সম্বন্ধে স্কুলের শিক্ষক আর কন্যাপণ ছাত্রী।

কটন শিল্পবিদ্যালয়টীও বেশ নূতন প্রণালীর। ভিখারী বাবুর গৈতুক বাসভবনের সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট ঘর ছিল, তাহাতে ভাড়াটীয়া কল, ময়রা, তাঁতি, ছুতার, কুমার, কামার, চামার, স্বর্ণকার, ধোপা, নাপিত, দপ্তরী ইত্যাদি ব্যবসায়ী ব্যক্তির বাস করিত। ধোপার ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য অলোক বাবু বিশেষ বৃত্তশীল। ধোপার বড় ঘেমাকে, তাহা-দেব একচেটে ব্যবসায় বাহাতে উঠিয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ

উৎসাহী। ইহারই নাম “কটনশিল্পবিদ্যালয়” ইংরাজেরা টহাঁকে বেগিং বাবু বলিয়া ডাকিত, তাই আমরা ভিখারী বাবু শব্দে অনুবাদিত করিয়াছি।

বাবু টিকিট কিনিয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর, শ্রীরামপুর পর্যন্ত, কিন্তু চাপি-
য়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে; কথার কথায় ইচ্ছাপূর্বক বর্জ্যমানে আসিয়া উপ-
স্থিত। বাহুরামকে ভাল মানুষ পাঠয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমি বড় ভুল
করিয়াছি, আপনার সঙ্গে কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,
অতিরিক্ত মাসুল গুটিপাঁচেক টাকা আমার চাই। এখন আমাকে ধার দ্বিন,
পরে শোধ করিব।” টাকা পাঁচটি লইলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আর দিলেন না,
সেই টাকার আসানশোল পর্যন্ত আর একখান টিকিট লইয়া কেলনারের
হটেলে টিফিন খাইয়া বাহুরামের সঙ্গে গিয়া পুনরায় ভর করিলেন, এবং
বলিলেন, যে “শেয়ারশোলের রাজবাড়ীতে একবার বাইতে হইবে।
চলুন ভালই হইল, আজ আমার বড় শুভ দিন যে মহাশয়ের সঙ্গে পাই-
লাম, এক সঙ্গে কতক দূর যাওয়া যাক।” বাইতে বাইতে পথে রাসি
হইয়া গেল, বাহুরামের একটু তন্দ্রা আসিল, সেট অবসরে বেগিং বাবু
বাহুরামের কৃত উপকারের বিনিময়ে তাঁহার পোটম্যাটটি লইয়া একটা
ষ্টেনসেন আন্তে আন্তে নামিয়া পড়িলেন। বাহুরাম আগিয়া দেখেন সে
বাবুও নাই, তাঁহার পোটম্যাটও নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার হাসি
পাইল। ভাবিলেন, পৃথিবী কি আশ্চর্য্য লীলার স্থান। লোক গুল যেন
নানা সাজে সাজিয়া যাত্রা অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। দেশহিতৈষীও
জীবিকানির্ভরতার উপায় হইল! লোকটা কি চতুর! কি বাচাল! একপ
ভদ্রবেশধারী দেশহিতৈষী বাবু চোরত কখন ধোঁষ নাই! যাক্ বেশ হই-
য়াছে, তার কমিয়া গেল, নিশ্চিন্ত হইলাম।”

ভদ্রনস্তর পরিধেয় এবং উত্তরায় বসন রামরাজের মাটিতে বসাইয়া দাড়ি
গোঁফ নথ চুল রাখিয়া সম্মাস বেশে গম্যস্থানান্তিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন।
সহজেই তিনি নিশ্চয় সংসারভাগী তাহার উপর বেগিং বাবুর এই দৌগত্য,
ইহাতে বাহুরামের চিত্ত আরও উৎসাহ হইয়া গেল। মারাবদ্ধ জীবের
দুর্গতি দর্শনে তিনি একটু আমোদও অনুভব করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।

মানুষ যতই কেন জ্ঞানী চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী হউক না, দেহ থাকিতে দেহের ধর্ম অতিক্রম করিয়া কেবল নিরাকার লইয়া সফট থাকা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমন জলন্ত বিশ্বাস কর জনের আছে যে, তাহারা নিরাকার চিন্ময় অতীন্দ্রিয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ আত্মীয় বাস্তব ন্যায় স্পষ্ট অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? বিশেষ স্ত্রী জাতি; ইহারা যোগ ধ্যান তত্ত্বচিন্তার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। নিরাকার ভজিতে গিয়া কত কত জ্ঞানী পুরুষও শেষ অভাবাদী নরোপাসক হইয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছে।

সন্তোষিনীর সেরূপ প্রেমোন্মত্ততা উচ্চ বৈরাগ্য অধিক ক্ষণ রহিল না, তাহা থাকিবার নয়। আশার সামগ্রী নিকটে উপস্থিত থাকিলে পিপাসা বেশী থাকে না, কারণ মন তখন জানে যে সে বাহ্য চায় তাহা পাঠিয়াছে, প্রাপ্ত হইয়া আছে; সে অবস্থায় অনেকেই কলাকার জন্য না ভাবিয়া মর্কট ভৈরাগী হইতে পারে।

লজ্জাবিশী প্রিয়তমকে বিদায় দিয়া এক্ষণে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, বিষাদের ঘন অন্ধকারে তাঁহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, জ্ঞান ছাড় করিতে লাগিল, ছুড়র খালি হইয়া গেল। বাহু বামের স্বর্গীয় চিত্রিত প্রভাবে এবং তদীয় তত্ত্বোপদেশের গুণে চিন্তে যে বৈরাগ্যের উৎস হইয়াছিল, এখন তাহা রক্ষা করিবে কে? ভবিষ্যৎ জীবনের করাল মূর্তি দেখিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, “আমি যোগী বৈরাগীর ন্যায় কেবল আত্মতত্ত্ব লইয়া নিরাকার ভাবিয়া কি স্থতির থাকিতে পারি? বাহ্য সাহায্যে আন্তরিক জ্ঞানযোগ সাধনের কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তাহা মানি, কিন্তু তাহা কি দুই চারি বৎসরে সিদ্ধ হয়? পেটের ছেলেকে মা যদি স্তন্যদুগ্ধ না দেয়, কোলে পিঠে না করে, সে ছেলে মা বলে না, কাছেও আসে না; সে মাও ছেলেকে ঘেঁষ মমতা করে না।

শিতার প্রেমালিঙ্গন বাৎসল্য না পাইলে পুত্র কি পিতৃভক্তি লাভ করিতে পারে ? মাতৃ পিতৃভক্তি, ভাতৃপ্রণয় যেমন, প্রেমও আধ্যাত্মিকভাবে পরিণত হইবার পূর্বে তেমনি দেখা শুনা সেবা শুশ্রূষার উপর নির্ভর করে। এসকলের সাহায্য কি আমি বধা পরিমাণে পাইগাছি ? হায় ! আমি তাঁর কাছে বসিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া ভুলিয়া থাকিতাম, এখন আমাকে কে ভুলাইয়া রাখিবে ? চক্ষু কর্ণের লালসা যে এখনো আমার চরিতার্থ হয় নাই। ইচ্ছা হইতেছে পাখীর মত উড়িয়া তাঁহার কাছে বাই, গিয়া একবার দেখিয়া আসি, দুইটা কথা শুনিয়া এবং বলিয়া আসি। ভাবনা চিন্তা হৃৎকম্প সত্তাপে যদি মৃতপ্রায় হই, তবে এ কঠোর সাধনই বা করিবে কে ? সাধন করিতে হইলে যে একটু উৎসাহ অব্যবসায় চাই, সে আমিও সে টুকুও দেখিতে পাই না ! যদি ভুলাইয়া মরিয়া গেলাম তবেও সবই ব্যর্থ হইল। কঠোর ব্রত অবলম্বন দ্বারা উপবাসারিতে শরীরকে ক্রেশ দিতে পারি, সুখ বিলাস ত্যাগ, কদম ভোজন, ভূমিশয্যায় শয়ন, সামান্য অশন বসনে জীবন ধারণও অসাধ্য নহে ; কিন্তু তাহাতে ক্ষয়ে যদি শান্তি আরাম না পাই, তবে যে কেবল কষ্ট বহনই মার হইবে। প্রাণ যে আমার বড় খালি খালি বোকা হয়। ছব্রপিত্তর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, জীবনবিহঙ্গ আমার কোণায় কোন্ দেশে উড়িয়া গেল। হায় ! সকলই আছে, কেবল এক জন নাই।

“আহা ! কি মিষ্ট কথা গুলিই বলিয়া গেলেন। কথা গুলি ভাল, কিন্তু মুখ খানি কৈ ? সে সুন্দর মধুর অধর, সে সুখময় কঠোরনি কৈ ? সে দিব্যকান্তি শান্তিপূর্ণ আনন্দ মূর্তিটা কৈ ? কৈ সে প্রশান্ত উজ্জ্বল নয়ন দুটা কোথা গেল ? যে পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আমি পুণ্য সঞ্চয় করিতাম সে পদদ্বয়ই বা কোথা রহিল ? পড়িবার ঘর, উদ্যান, ছাদ সকলই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আহা ! সে নির্দোষ শিশুহৃদয় বদন কমলের হাসি আর এ ভূষিত চক্ষু কি দেখিতে পাইবেন না ! দেহ অনিত্য তাহাত *বুঝিলাম, কিন্তু প্রাণ তাহা মানিল কৈ ? শরীর নাই অথচ মাণুষ্য আছে, এটা কিছুতেই ধরিতে পারিতেছি না। কিন্তু যিনি আমাকে ভাল বাসিতেন তিনিও শরীর নহেন আত্মা, তবে আত্মা দ্বারা তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া

শরীর দ্বারা কেন আমি শরীর খুঁজিয়া বেড়াই? হায় আমি কান্দিবই বা কার কাছে? কে আমার চক্ষের জল মুছাইবে? ভগ্নী ভ্রাতার বিরহে, পুত্র পিতা মাতার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া কান্দিলে সকলে আহা বলে, কিন্তু আমি জীবনসর্বস্বকে হারাইয়া কান্দিতেছি, তথাপি আমার প্রতি কাহারোত দয়া হইবে না!

“বিধায় কালে তাঁহার কাছে গিয়া হায় আর একবার প্রাণ ভরিয়া কেন কান্দিলাম না! অন্ধকারে অন্ধকারে অদৃশ্যভাবে ক্রমে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, শেষ কেবল গুটি কতক বাক্য মাত্র কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া অন্তরালে বসিয়া কেবল কথা শুনাইতেন তাহা-তেও আমার প্রাণ প্রবেশ মানিত। বাহিরের ক্রিয়া সমস্ত বন্ধ হইলে আন্তরিক প্রণয় প্রমাণ অভাবে যে শুকাইয়া বাইবে। কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর। বড় কঠিন কথা।” কঠিন বটে, কিন্তু ভিত্তি যে প্রেম তাহা বণিক্রুতি। বিশ্বাসই প্রেমের জীবন। সন্তোষিণী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আহা কোথায় গেলেন, কি করিতেছেন, কিছুই জানিবার উপায় নাই। পত্রাপত্র লিখিবার যদি নিয়ম করিয়া দিতেন, তাহা হইলেও মনকে কতকটা সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। সকল পথই যে বন্ধ! যেন বন্দীর নার কারাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যখন আমি মনে মনে গোপনে তাঁহাকে ভাল বাসিতাম, সে অবস্থা যে আমার ইহা অপেক্ষা ছিল ভাল।

“আহা প্রিয়তমের কি বিনম্র অমায়িক ভাব! কি দয়া দায়ী! আমি লামান্যা অনাথা অশিক্ষিতা দুঃখিনী নারী, আমার প্রতি তাঁর কত মৰ্যাদা সন্তোষই না প্রকাশ পাইত! আমার পার্শ্বিক জীবন ভেদ করিয়া অমরত্বের শোভা দেখিতেন, তাই দেখিয়া এত সন্মান করিতেন, ভাল বাসিতেন। আমি কত সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কোন দিন অসারতা বা চাপল্যের চিহ্ন দেখি নাই। বিধায় কালের সে মূর্তি, এবং ষেদোক্তি অরণ করিতেও আমার প্রাণ ফাটিয়া বাইতেছে। কাড়িয়া লইবার জন্যই কি বিধাতা তাঁহাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন? তাঁহার কোলে সে বার সেই সাংঘাতিক রোগে কেন আমার মরণ হইল না?”

এইরূপ বেদ ও বিলাপ করিতে করিতে বিরহকাতরা সন্তোষিণী ভ্রাত

হইয়া পড়িলেন । এমন এক জনও বাধার বাধী হুঃখার্জিগিনি নী মুখববন্ধন-কারিণী নাই বাহার নিকট মনের হুঃখ বলিতে পারেন ।

অতঃপর উদ্ভাটনায় হইয়া তিনি উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায় গিয়া আরো প্রাণ জলিয়া উঠিল । সেই চাঁপা পাত, সেই পুঙ্খববন্ধন বীধা ষাট, সেই চামেলীকুঞ্জ সমস্ত তাঁহার প্রাণসম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল । সন্তোষিণী প্রথমতঃ নির্জনে বনমধ্যে মাথায়-কুঞ্জে স্কাটয়া পশ্চাৎ লোচনে প্রাণভরিয়া জলদ্বারা উদ্ভাটন করিয়া খুব খানিক কাঁদিলেন । তাঁহার আলুলায়িত কক্ষ চুলেরগোছা পৃষ্ঠে, কপালে, স্বর্কে খুলিয়া পড়িয়াছে, সমীরণ হিল্লোলে তাহা উড়িয়া উড়িয়া ফুলের গাছে লাগিতেছে, তজ্জল ছিন্ন পত্র কুসুমফল ও পরাগ কেশর সকল তাহাতে বিজড়িত হইয়াছে, নয়ন দ্বয় পণ্ড-মূল অশ্রুজলে অভিষিক্ত, মুখ ষানি শোকে মলিন, প্রেমবিরহে শাণলিনী প্রাণ আত্মবিস্মৃত হইয়া যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, “হে চম্পক তরু, হে আমার প্রেমভৌরব, আমার জলদ্বয়নাথকে কি আর তুমি দেখাইবে না ? তোমার পুষ্পপরিমল সকল বায়ু স্রোতে নানা দেশে গমন করে, তাহার কি আমার প্রাণেশ্বরকে আমার হুঃখের কথা বলিয়া বাইতে পারে না ? হে নির্মূল সরসীনীর, তোমার জলদ্বয়দর্পণে আমি যে কত বার তাঁহার হৃদয় যুগ নিরীক্ষণ করিয়াছি, আজ এক বার সেই যুগ ষানি আমার দেখাও না ! লোকসমাজে আমার হুঃখের হুঃখী কেহ নাই, তোমরা কি আমার বাধার বাধী হইবে না ? হে প্রেমিক বিহঙ্গফল, তোমরাও দেখিতেছি পূর্বের মত গীত গাইতেছ, আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছ, আজ একবার আমার সঙ্গে কি কাঁদবে না ? তোমরাও অনেক দেশ দেখা-জুরে, পর্বত, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া পাক, আমার জীবনবন্ধুর সঙ্গে কি তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে না ? যদি হয়, তবে এই অভাগিনীর দুর্দশার কথা তাঁহাকে বলিও ।”

সন্তোষিণী দেখিলেন, কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কেহ কাঁদিল না, আহা বলিল না, বরং তাহার চিরকাল যেমন হাসে নাচে গান করে অগ্নান মুখে তাহাই করিতে লাগিল । তদুদর্শনে হতাশ হইয়া তিনি ঞ্জলাপ পলিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদের ঘারে ঘারে কাঁদিয়া

বলিলেন, “ভগ্নীগণ, হে আমার বাল্যসখী সকল, তোমরাও আমার ক্রন্দন কি শুনিবে না ? তোমাদের সেই পুরাতন সহচরীর আজ কি দশা হইয়াছে একটী বার দেখ, দেখ ! আহা তোমরা যে আমাকে বড় ভাল বাসিতে !”

কৈ, কেহইত কাঁদিল না। তাহারা হাসিয়া বন আলো করিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে মধুগন্ধ ছড়াইতেছে, বায়ুভরে নাচিতেছে, রবিকিরণে দীপ্তি পাইতেছে, ভ্রমর মক্ষীকা, প্রজাপতি ও পক্ষীদিগকে লইয়া আহ্লাদ আমোদে মহা মহোৎসব করিতেছে।

ইহাদের ভাব গতি দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষিনীর কিঞ্চিৎ চেতনা হইল, মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, শোকাবেগ কমিয়া আসিল। তখন বুকিলেন, এই রূপই বুঝি বিধির বিধান। যে যায় সেই যায়, কেহ কাহারো জন্য কাঁদে না, কাঁদিয়া কিছু করিতেও পারে না। হৃন্দর গোলাপটী দিবসে ফুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া সুরভি বিতরণ করিয়া রাত্রিতে বরিয়া পড়ে, আহা ! তার জন্য কে এক কোঁটা চকের জল কেলে ? শ্রামল পত্রফলে শোভিত তরুণভাগণ শীর্ণ জীর্ণ হইয়া কালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার সমাচার গ্রহণ করে ? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কে কোথায় মরিতেছে, মেঘের পশ্চাতে মেঘ, জলস্রোতের পশ্চাতে জলস্রোত, সমীরণের পশ্চাতে সমীরণ তরঙ্গ অনন্ত কাল ছুটিতেছে, কে কাহার সংবাদ লয় ? এ সকল অনন্তের লীলা। অনন্ত কাল অনন্তে সকলেই চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই ইহারা কাঁদে না, শোক করে না। বালক বালিকা সুবক সুবতী হইতেছে, তাহারা আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইয়া মরিয়া যাইতেছে ; পুনরায় তাহাদের স্থান বালক বালিকা সুবক সুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসিয়া পূর্ব করিতেছে। এই রূপেই পৃথিবী চলে, কেহ কাহারো জন্য চিরকাল ভাবে না। তবে কেন আমি ভাবিয়া মরি ! এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষ আপনাকে আপনি তিনি বুঝাইলেন,—“আমার হৃদয়সখার প্রেমত স্থান কালে আবদ্ধ নয় ; তাহাওত অনন্তে প্রতিষ্ঠিত, অনন্তের অঙ্গীভূত, তবে তাহার ভালবাসা যে আমাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন তাহাই করিয়া দেখি পারি কি না। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব, আশ্রয় মধ্যে তাহাই দেখি। বাস্তবিকতো তিনি শরীর নহেন, তিনি প্রেমময় আত্মা। কষ্ট দুঃখের ভিতর পড়িয়া তাই ভাবি, ভাবিতে ভাবিতে

তাহার নিকটবর্তী হই। মরিয়া মরিয়া তাহাকে ডাকি, ডাকিতে ডাকিতে তাহার প্রেমরসে গলিয়া এক হইয়া বাই।”

সন্তোষিণী এইরূপে এক একবার আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, আবার ভবিষ্যজীবনের নিরাশা ও কঠোর বৈরাগ্যের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। নির্দয় বিপদের দানব যেন তাহাকে লইয়া প্রতি ক্ষণে ক্রোড়া করিতেছিল। মদমত্ত কন্নী যেন বিশাল পক্ষধ্বনে কোমলাঙ্গী নলিনীর সুকুমার বপু একবারে পক্ষভূতে বিলীন করিয়া দিতেছিল।

মহা হৃর্ভাবনা মর্ধ্যবেদনায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিবেশে অবসন্ন মনে ভগ্নহৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িগেন। পুনরায় হঠাৎ গভীর নিশীথ কালে সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিদ্রালসোভারাক্রান্ত অসংযত মন আবার প্রিয়বিরহের প্রচণ্ড অনলে জলিয়া উঠিল। এ সকল নিদারুণ মর্ধ্যপীড়া কি ঘুমাইলে ভুলা যায়? বরং ঘুমের বোরে আরও তাহা প্রবলতর হইয়া উঠে।

আপনার এই বিষম যন্ত্রণাত ভোগ করিতে লাগিলেন, তৎসঙ্গে বাহ্য-রামের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণ আরো ব্যাকুল হইল। “আহা, কে তাহাকে সাহায্য দিবে, কেইবা আদর যত্ন করিবে? হয়তো অনাহারে পথশ্রান্তিতে, বৈরাগ্যের কঠোর ব্রতচরণে কোথায় গিয়া প্রাণ হারাইবেন। তবে কি এটা আমার মুহূর্ত্তবিরহ! জীবদ্দশায় মুহূর্ত্তশোক আমাকে ভোগ করিতে হইল!” এই বলিয়া ভদ্রানক শোকে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। আহা, সে ক্রন্দনে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। পরে কোন দিকে উপায় না দেখিয়া, ছবরের ধনকে ছবয়ে ধরিয়া তিনি অবস্থা-চক্রে হুর্জ্জ্বল গতিমুখে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। এখনও শেষ হয় নাই, মানসিক দুর্কিবহ ক্রেশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেরও নির্যাতন অত্যাচার আরম্ভ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভুফানে তরণী ।

সন্তোষিণীর এত কষ্ট, এত যন্ত্রণার কারণ কি ? অকৃত্রিম বিগত প্রেমের মধ্যেও মোহগরল লুক্কায়িত থাকে সেই অন্য এত যন্ত্রণা । “সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতা ময় হে, যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে ।” এটি বড় খাঁটি কথা । বাস্তবিক এ পৃথিবীতে অমিশ্র খাঁটি জ্ঞানিক কিছুই নাই, সকলই সত্য অসত্যে পাপ পুণ্যে জড়িত । সুতরাং অমিশ্র শান্তি সুখও এখানে নাই । তাই এখানে আনন্দ উৎসবের অন্তরালে শোকের বিলাপ, প্রিয়জন সম্মিলনের ভিতর বিচ্ছেদের অগ্নি, সুখের মধ্যে দুঃখ, হাস্যের ভিতর ক্রন্দন, অমৃতের সঙ্গে গরল প্রচ্ছন্নভাবে অব্যাহতি করে । নির্দোষ সুখ সন্তোগই হটক, আর বিধিসম্মত স্বাভাবিক তৃষ্ণা চরিতার্থের কথাই বল, যাহা মায়া তাহা মায়া । এ জগতে যাহা সুখের কারণ তাহাই আবার দুঃখের জনক । বিষয় ভোগে রোগ জন্মে,—যোগে বিয়োগ ঘটে, সুতরাং তাহার জন্য কোন না কোন সময়ে যাতনা পাইতেই হয় । অভ্যাসের ফল বা কর্মফল অবশ্যসম্ভাবী । কিন্তু শিক্ষা ও উন্নতির জন্য ইহা প্রয়োজন, এবং ইহাকেই ভগবানের লীলা বলা যায় ।

বাহারামের প্রস্থানের পর নিশানাথের সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তির আর আশঙ্কা রহিল না ; তজ্জন্য তিনি এবং তদীয় পত্নী নয়নভারা দেবী একটু নিরাপদ হইলেন । সন্তোষিণীর প্রতি মায়াটা কিছু বেশী ছিল, অথচ সে অধিক লেখা পড়ার চর্চা করে, স্বাধীনভাবে চলে, এটাও ইচ্ছা করেন না । সমাজের ভয়ে শাসনে উৎপীড়নে তৎপ্রাণও ক্রমে তাহাদিগকে কিছু নিষ্ঠুর হইতে হইল । প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোকের নিন্দা, স্কাতি কুটুম্ব-গণের শ্রেষ বচন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল । সন্তোষিণীর প্রাণ একে শোকে অর্জুজ্বলিত, তাহার উপর এই সকল গ্রানি গঞ্জনা নির্দয় ব্যবহার ; অগত্যা তিনি যুক্তির পথ দেখিতে লাগিলেন ।

খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীতে মিসেস্ হালদার নামী একটা প্রচারিকা ছিলেন, তিনি হিন্দুপূর্ব্ব শৈলাই কুনন প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নিশানাবের ভবনে আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় এবং সাহায্যে সন্তোষিনী একটা নিশাবসানে গৃহের বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান পল্লীমধ্যে তিনি ভিত্তিতে পারিলেন না। একে অনাচার, মদ, মাংস, পেরাজ, রহুনের দুর্গন্ধ, তাহাতে আবার পুরুষদের দৌরাঙ্গা, বড় বিপদেই পড়িলেন। পাদরী ভগান একবার বাইবেল পড়াইতে আসেন, ক্যাটিকিষ্ট টিমথি বিশ্বাস আনিয়া উপদেশ দেন, যুবকদল চারিদিকে উকি খুঁকি মাঝে, কেহবা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলে, “কি গো, কি কোচ্চ?” কেহ হাসে, কেহ গান গায়; স্বাধীনভাবে তাঁহার সঙ্গ আলাপ করিবার জন্য অনেকেই আনা গোনা টানা করিতে লাগিল। শীঘ্রই ব্যাপ্তিস্থ হইবে; সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, মণ্ডলীমধ্যে মহা আনন্দধ্বনি উঠিয়াছে, এমন সময় কালান্তক বমকিঙ্কর স্বরূপ মালকৌঁচামারা বড় বড় বাঁশহাতে টিকিমাথায় আঁর্যসভা গুরুকে হরিসভার হিন্দু যুবার দল এবং টোলের ছাত্রগণ হঠাৎ তাহার মধ্যে পড়িয়া দাঙ্গা করিয়া সন্তোষিনীকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তখন পাদরী ভগান হতভম্ব হইয়া পস্তুরভাবে পদচালনা করিলেন, দাড়ি চোমরাইলেন, আঙ্গুল কামড়াইলেন, আপন মনে ডাম রাশেল নেটিভ নিগার বলিয়া গালি পাড়িলেন, পরিশেষে স্থানীয় বিচারালয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু হিন্দু ত্রিশ বৎসর বয়স্ক সন্তোষিনীকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা বলিয়া দ্বিবা প্রমাণ করিয়া দিল, দুতরাং ভগানের মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল। কেবল ইহাতেই তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না, বাহাদুরকে তিনি সচরাচর “হে হিন্দু যুবতী বালকগণ!” বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক পৰিমধ্যে উপদেশ দিতেন, তাহাঙ্কের হাতে এক দিন দুই পাঁচটা চপেটাঘাতও বাইলেন।

মোকদ্দমা মামলাত মিটিল, কিন্তু এখন সন্তোষিনী থাকেন কোথায়? জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, আরতো হিন্দু সমাজে স্থান পাইতে পারেন না। তথা; দলপতি সমাজপতি গোষ্ঠীপতি ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ সকলে মিলিয়া এই সিদ্ধা

করিলেন, “বরং ব্রাহ্মজ্ঞানীর হাতে ছাড়িয়া দিব, তথাপি খ্রিষ্টান ব্যাটাদের দলভুক্ত হইতে দিব না ; অতএব সঙ্কটচরণের হস্তে উহাকে সমর্পণ করা হউক ।” খ্রিষ্টিয়ানদিগের উপর ক্রোধ বিদ্বেষ হইলে ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের এক প্রকার চুষ্ট সহানুভূতি হয় । যাহা হউক, শেষ এইরূপ ব্যবস্থা হইল ।

এখানে সঙ্কটের গৃহে আবার সেই বিকটবদন মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছেন । তিনি এক্ষণে বিড়াল তপস্বী, বহু দিনের অনাহারী জীব ; বিবাহের উমেদারি করিতে করিতে চুল পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, পায়ে কোমরে বাতে ধরিয়াছে, এখন গঙ্গাযাত্রা করিলেই হয় । তথাপি তিনি আশা ছাড়েন নাই । বিবাহের জন্য অনেক দিন হইতে খুঁটি ও ব্রাহ্মসমাজে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কোন স্থানে পাত্রী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । বহু চেষ্টায় একটী বারবধূর সহিত একবার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ছিলেন, সেও তাঁহার দৈন্যদশা দেখিয়া শেষ পিছাইয়া যায় । বিবাহ বিবাহ করিয়া বিকট কিছু দিন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল । যাকে তাকে বিবাহ করিতে চাহিত, সখবা বিধবা কুমারী স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ বুঝিতে পারিত না । এ অন্য একবার বড় বিপদেও পড়িয়াছিল । কতকগুল চ্যাপড়া দল গ্রামের একটা হাবা গোবা আধপাগলা ছোড়াকে মেয়ে সাজাইয়া তাহার সঙ্গে বিকটের বিবাহ দেয়, এবং তাহার সজ্জিত সম্বল দ্বারা লুণ্ঠন চালাইয়া যায় । বিকট পরে যথা সময়ে সমস্ত কঁাকি টের পাইয়া মনে বড় কষ্ট পাইল । অবস্থিধ পাঁচ কারণে এক্ষণে বিকট বাবুর মনে অতিশয় বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে । তাই শেষ জীবনে ফকিরী লইবেন মনে করিয়া এইরূপে তিনি খেদ করিতেছেন ;—

(১)

“ভাই হে, বুখাই জনম গোয়াইমু ।

না পরিনু কোট ছাট

না করিনু চিট্ চ্যাট্

মশে বিবি যুবতীর দলে ;

না খাইমু কাটলেট্

সেম্পিয়ান কেলারেট্

না বাধিমু নেকটাই গলে ।

(২)

হায় হায় জনমিয়া কেন না মরিমু।

পাইমু পানের দণ্ড, না ঘেবিমু ইংলণ্ড,
দিব্যধাম লণ্ডন নগরী;
পড়িয়া চরণপ্রান্তে, না ভবিমু বেতকাতে,
অন্তে কি হইবে তেবে মরি।

(৩)

কবে মোর হবে শুভ দিন!

সাজিয়া ইংরাজ সাজে, লণ্ডন নগরী মাঝে,
লেডীর সমাজে বিহরিব;
টেম্‌স নদীর তীরে, বেড়াইব ধীরে ধীরে,
প্রেমানন্দে চুরট টানিব।

(৪)

অধমের ভাগ্যে তা কি হবে?

বাহিরে সাজিব সং, কিন্তু শাধা কাল রং,
দোহে কি কখন মিশ ধাবে?

(৫)

হায় তবে বিফল সে আশা!

স্নান করি গঙ্গাজলে, ছেঁড়া কাঁধা বাঁধে পলে,
পরিয়া কৌপীন বহির্বাস;—
বাই আমি বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণ দরশনে,
বৈকুণ্ঠের সঙ্গে করি বাস।*

মহাত্মা হতাশ মনে এইরূপে যখন তিনি দ্বন্দ্বের বৈরাগ্যের পাখা গাইতেছিলেন, সেই কালে হঠাৎ সন্তোষিনী তাঁহাদের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। বুদ্ধক ব্যক্তির মুখের সম্মুখে যেন একটা স্ট্রুট পুট অজ্ঞা শিত আসিয়া উপস্থিত হইল। বিকট বিবাহের আশাত ছাড়েন নাই, জুটিয়া উঠিল না, বয়ঃক্রম বেশী হইয়া পড়িয়াছিল, কি করেন, কাজেই বৈরাগ্য নশ্বীত গাইতেছিলেন। সন্তোষিনীর আগমনে সেই সমালম্বিত ইচ্ছা

আবার আগিয়া উঠিল। মনে ভাবিলেন, “এত দিনে বিধাতা বিবাহের ফুল ফুটাইলেন। আমি জানি, সন্তোষিনী আমাকে অনেক দিন হইতে ভাল-বাসে, কেবল বাহ্যারামের অন্য কিছু করিতে পারিত না।” তখন আর এক বার বেতো পায়ে ভর করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, এবং ঠতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনাথা আশ্রয়হীনা সন্তোষিনীকে দেখিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইল। সন্টেরও ইচ্ছা, যদি ষটেত ষটিয়া বাড়ক, একটা পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ব্রাহ্মসমাজ জাঁকিবে। সন্তোষিনী সিংহের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাত্তের হস্তে পড়িলেন। বিকট তখন তাহার ছাতাধরা পচা পোর্টম্যান্ট খুলিয়া, পুরাতন পোষাক দুই একটা বাহা ছিল রৌদ্রে শুকাইয়া, ছারপোকা বাড়িয়া অঙ্গে চড়াইল, চুংট দ্বারা মুখাঘি করিল, পাকা চুল কিরাইল, ভাঙ্গা হারমনিয়মের বেলয় সুরে গান গাইল, একটু ইংরাজি মখন পড়িল, দুই পকেটে দুই হাত দিয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গে উঠানে বেড়াইতে লাগিল এবং ছিন্ন কর্ণটা সোলাটুপির দ্বারা ঢাকা দিল। কোর্টশিপের জন্যও অনেক চেষ্টা চরিত্র করিল, কিন্তু বড় সুবিধা হইয়া উঠিল না।

বিকট পূর্বে কাঞ্চনরী শকুন্তলা কিছু পড়িয়াছিল, সাধু ভাষার দুই চারিটা বাণি গীৎ জানিত। সেই অব্যর্থ বাণ সন্তোষিনীর প্রতি এক্ষণে নিক্ষেপ করিল। বলিল, “অরি, কুরঙ্গনয়না, মধুরভাষিনি, তোমার ঐ প্রফুল্ল বাক্যব সদৃশ মুখমণ্ডল রাহগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কেন বধাধে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! সুন্দরী, তোমার এই অনির্বচনীয় রূপরাশি কি বাহ্যারামের ন্যায় রসহীন মানবের উপযুক্ত? কখনই নহে। তুমি আন্তরিক আমার ভালবাস তা জানি; এত দিন কেবল সেই ততভাগ্যের কুমন্ত্রণায় তোমাকে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে শুভ দিন নিকটবর্তী, প্রজাপতির নির্বন্ধ কে ধ্বংস করিতে পারে? হে অনিন্দিত, ভদ্রে, আর কেন যৌনাবলম্বন কর, কথা কও। এক বার সহাস্য আননে মধুর স্বরে কথা কও।”

বিকটের কবিত্ব শক্তি খুলিয়া গেল। সে মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, “আমার স্থূললিঙ্গ বচনে সন্তোষিনীর হৃদয় নিশ্চয় গলিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।” তাহাকে পাগল মনে করিয়া সন্তোষিনী দূরে দূরে কিরিতে লাগিলেন। অতঃপর বিকটের সর্ববিধ ভদ্র উপায় বধন ব্যর্থ হইল,

তখন সে নানারকমে উৎপাত আরম্ভ করিল। কাছ ঘেঁষিয়া টাঁড়ায়, পথ আটকাই, ঘুংগু মিস্‌দের, কাশে, গায়ে বন ছিটাইয়া দেয়, হিহি করিয়া হাসে, সেকহাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়ায়। সত্বেষিণী মহাবিশ্ব দেবিয়া এক দিন গোপনে গোপনে সে স্থানও পরিভ্রমণ করিলেন, এবং বারোবিশের সঙ্গে মিশিয়া কান্দোঘাটে চলিয়া গেলেন। ওঘায় তাঁহার এক প্রাচীনা বিধিমা ছিল, খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষ তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার অভ্যাসে বিকট বাহুও শোকে হুঃখে জিভুবন আঁবার দেবিয়া বেধ করিয়া বলিলেন, “হায়, আমার তিন কাল গিয়াছে এক কালে ঠেকিয়াছে, এই আমার অনিত্য দেহ ব্যয় রুধাই হইল। মনের আশা মনেতেই মিলাইয়া গেল। তবে আর এ জীবনে মুখ কি ? আমার মরণই সকল।” এইরূপে অনুভূতি করিয়া বাসনাগরল পান করিতে করিতে হঠাৎ এক দিন হাঁত ঘুংগু সিটকাইয়া, চক্ষু উলটাইয়া পড়ত পাইলেন। গরল হইতে আর অনুভূতি উদ্ধার করা হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থে ধর্মনাশ ।

আমাদের এ গল্প শুনিতে শুনিতে কেহ বেন বুঝাইয়া না পড়েন।

এখনো অনেক ভাল ভাল কথা আছে।

সত্বেষিণী কান্দোঘাটে পৌঁছিয়াই দেবিলেন, বাটে বাটে স্ত্রী পুরুষ হল বাঁধিয়া গজাঙ্গান শিবপূজা করিতেছে, মন্দিরের মাঝার মাঝার ক্ষত্রী উড়িতেছে, অলি গলিতে যেখানে সেখানে শিবের মঠ, দেবীর মণ্ডপ। সেখানে বস্তু বা শিব, ভক্ত বা ধাঁড় এবং ভক্ত সন্ন্যাসী। পথে পথে মহারাষ্ট্রীয় আবিড়ী সারস্বত তৈলস্রী মৈথিলী কঙ্কানী হিন্দুস্থানী “জাবো উড়িয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জনতা, সকলেই বেন ধর্মের জন্য ব্যাকুল এবং উন্মত্ত। এই রমণীয় দৃশ্য সহসা অবলোকন করিয়া সত্বেষিণীর বর্ণনাত্মক প্রকল্পিত

হইয়া উঠিল। কাশীবাসী লোকদিগকে তিনি কত সুখী সৌভাগ্যশালীই তখন মনে করিলেন! দেবমন্দির সকলে নিরন্তর ঠনাঠন ঢনাঢন ঘট। বাজিতেছে, যেখানে সেখানে পাঠ কথকতা চণ্ডীর গান হইতেছে, পুরো-হিতেরা মন্ত্র পড়িতেছে, তীর্থযাত্রিগণ কুতাজ্জলি পুটে গললগ্নিকৃতবাসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কেহ মালা জপিতেছে, কেহ ধুলার লুটিতেছে। সুবর্ণ-মণ্ডিত বিবেকবরের মন্দিরে সঙ্ক্যাকালীন আরতির শোভা দেখিয়া, তথায় শত সহস্র যাত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত হর হর বোম বোম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তোষিণীর শোকভগ্ন হৃদয়ে এক অপূর্ব ভক্তিভাবের উদয় হইল। অনেক কষ্ট নির্যাতনের পর তিনি একটু বেন আরাম পাইলেন। ভাবিলেন, “কত চুঃখিনী বিধবা এখানে দিবা নিশি ধর্ম্মকর্মে, দেবদর্শনে, পুণ্য উপার্জনে মনোনিবেশ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতেছে। ইহাদের সংসার-চিন্তাও নাই। বিচ্ছেদবিকারেও কেহ দগ্ধ হইতেছে না, সদানন্দ আন্ততোষ মহাদেবের লীলাধামে সকলেই সদানন্দ চিন্ত। আহা ইহাদের কি নিষ্ঠা! স্বর্গের জন্য কি প্রগাঢ় অনুরাগ! পাণ্ডা বাবাজীরা কেমন আদর বড়ের সহিত যাত্রীদিগের সেবা করিতেছেন! স্বর্গতুল্য স্থান, আমি কি এই পুণ্যধামে স্থান পাইব!”

নগরমধ্যে, গঙ্গাতীরে, দেবমন্দিরে, রাজমার্গে এই সকল দেখিয় পরে নগরপ্রান্তে সন্ন্যাসী দণ্ডীদিগের আশ্রম, নির্জন বন, উদ্যান সরসী পাটান কীর্ত্তি গুহা গহ্বর দর্শন করিলেন। সেখানে দলে দলে দণ্ডী পরমহংস পরিত্রাজক সন্ন্যাসী ত্রিশূলধারী ভৈরব ভৈরবী অঘোরপত্নী বানপ্রস্থ উদাসী যোগী জটাধারী সকল বাস করিতেছে। কেহ কটিতটে গৈরিক বসন আঁটিয়া, মাথায় খুঁটি বাঁধিয়া নন্দরাণী বশোদার ষোলমহনের ন্যায় মহা-বিক্রমেয় সহিত সিক্তি ঘুঁটিতেছে। কেহ মৌনব্রত লইয়াছেন, তাঁহাকে কথ্য কহিতে নাই; কিন্তু তিনি হস্ত পদ সঞ্চালন, চক্ষু ও শ্রবণভঙ্গী দ্বারা মনের সকল প্রকার ভাব রসই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বড় বড় কাঠের কুঁড়ে ঘড় করিয়া ধুনি জ্বালাইয়া, গারে ছাই মাখিয়া, জটা এলাইয়া মুদ্রিত নয়নে গাঁজা ফুঁকিতেছেন, এবং পাছে একটু মাল লোকসান হয়, তজ্জন্য সমস্ত খোঁয়া গিলিয়া গিলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ

যা সেই আওনে যোটা যোটা কটী, গোল গোল লিটি বানাইয়া মনো-
যোগপূর্ব্বক তাহাতে যি মাথাটেতেন। যিনি উদ্ধবাহ তিনি নথ চুল বড়া-
ইয়া বসিয়া আছেন। কেহ দ্বিগুণের মূর্ত্তি ধরিয়া চিমটাহাতে পথে পথে কি র-
তেছে, কেহ হুই চকু হুঁহুয়ের দিকে চাহিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করি-
তেছে, কেহ পঞ্চাঙ্গির তাপে বদ্ধ বিদ্ধ হইতেছে, কেহ বা বৃক্কের ডালে
খুলিতেছে;—তাহার পদধর ক্ষীত হইয়া তাহা হইতে রস রক্ত ধরিয়া
পড়িতেছে এবং শিবোরা গরম অল দিয়া তাহা খুইয়া দিতেছে। আর
এক স্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি উদ্ভবস্থ নাড়ী সকল বাহির করিয়া তাহা
খুইয়া আবার উদরে পূরিতেছে। কেহ মুখ দিয়া নিবাস ফেলিতেছে।
কেহ কুস্তক যোগে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। কপালে দীর্ঘ
ফোঁটা, ন্যাংটিপরা সন্ন্যাসীর ছোট ছোট ছানা গুল পালে পালে বেড়াই-
তেছে, ভূধা সাধু বলিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে। আবার কোন এক
স্থানে দেখিলেন, চতুর্দিকে জল তাহার মধ্যে মাচা বাঁধিয়া এক যোগী
জপ করিতেছেন, আর সোটা ধরিয়া দর্শক যাত্রী হাঁকাইতেছেন। কেহ
গুহাভ্যন্তরে দিন রাত্রি ধ্যানে মগ্ন, কেহ বা শিবাবিগকে বেদ বেদান্ত অধ্য-
য়নে নিযুক্ত। আবার কেহ বা হেণ্ডমুণ্ডে উদ্ধপবে ভগন্যা করিতেছেন।
কেহ ঢেলা দ্বারা গা হাত পা সর্ব্বাস্ত্র টিপাইতেছেন।

সতস্রাবিধী কাশীধামে আসিয়া বাহা কিছু নয়নগোচর করিলেন, সমস্ত
ধর্ম্মের পরিচ্ছন্ন, ধর্ম্মের কার্য্য, ধর্ম্মের আচার ব্যবহার। কাশীতীর্থে যেন
ধর্ম্মময়। এই সকল দেখিয়া তিনি বিমোহিত হইলেন, এবং মনে
মনে নিরু করিলেন, “অবশিষ্ট জীবন আমি এই পবিত্র স্থানে সাধুসঙ্গে
জপ তপ ধ্যান চিন্তায় অতিবাহিত করিব।” এই সকল করিয়া দ্বিবিমোহের
নিকট থাকেন। কিন্তু ষত দিন বাসিতে লাগিল, ক্রমে তত লোকদিগের গুণ
ব্যবহারের পরিচয় পাইলেন। শেষ বুঝিলেন, পাণ্ডুরা ডাকাত, সন্ন্যাসীর
চোর, পুরোহিতেরা শঠ ধূর্ত্ত। অনেক স্ত্রী পুরুষ বাহিরে যেমন ভিতরে
ঠিক দ্বিগুণীত। ধর্ম্ম কলুষ বাহাদুরের অধিকাংশই বাণিজ্য ব্যবসার তুলা।
সরল বিশ্বাসী সাধুচরিত্র যুগ্ম লোকও আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা
অতি কম।

লোকের কণ্ঠাচরণ কুব্যবহার দেখিয়া সন্তোষিণীর উৎসাহ আশা ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন তথায় তাঁহার দিক্‌দিক্‌র আশ্রিতা ভাড়াটিয়া কোন এক স্ত্রী নারী বাস করিত। লক্ষ্যীর মত তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য। বেশ বিন্যাস করিয়া যখন সে বারাণসী ফাঁড়াইত, তখন বোধ হইত যেন আকাশের বিজলী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিবিড় জলদ-স্বরূপ কুন্তল রাশির সম্মুখে বিহার করিতেছে। কিন্তু তাহার মনটা অতি-শয় বন্ধিম। কি পুরুষ কি নারী সকলকে কাষ্ঠ পুস্তলিকার ন্যায় সে নাচাইতে পারিত। তাহার চক্রে পড়িয়া হুই একটি খুন অধমও হইয়া গিয়াছে। রূপমুগ্ধ যুবকদিগকে ঠকাইয়া তিনি বেশ দশ টাকা উপার্জন করিয়াছেন। গায়ে একটি গা গহনা। ঘরটা ঝাড় লঠন পাখা খাট পালঙ্ক আয়না ছবি দ্বারা বিলক্ষণ সুসজ্জিত। বিছানা কাপড় চোপড়ে আতর গোলাপ ওডিকলম ল্যাবেণ্ডারের গন্ধ। এক সেট কাঁটা চামচ ছুরি ডিস্‌প্লেটও আছে। খুঁজিলে হুই পাঁচটা ব্রাণ্ডি বোতলও না পাওয়া যায় এমন নয়।

যে কার্যালয়ের বড় হইতে ছোট প্রত্যেক কর্মচারী উৎকোচগ্রাহী সেখানে এক জন সত্যবাদী ন্যায়বান্ কর্তব্যপরায়ণ ধার্মিক লোক প্রবেশ করিলে সে যেমন বিপদে পড়ে, নির্মূল চরিত্র। সন্তোষিণীর পক্ষে কাশীধাম ভ্রমণ হইয়াছিল। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এই দেখিলেন, অধর্ম্ম দুষ্কর্ম্মকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার এবং আচরণ করে। উপরিউক্ত স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সেই রূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইল। লোকদিগের মধ্যে বিবাদের বাঁধাইয়া অন্তরালে বসিয়া সে হাসিত। গালাগালি, ভাড়াভাদ্দি, ইহার কথাটা উহার কাণে, উহার কথাটা ইহার কাণে, এই তাহার প্রধান কাজ। মনটা কুঁজড়ামিতে যেন পরিপূর্ণ। কিন্তু নিজে সে মন্দচরিত্র ছিল না, কেবল অপরকে লোভ দেখাইয়া পাশে মজাইয়া পরীক্ষা প্রলোভনে ফেলিয়া আমোদ অনুভব করিত। তাহার হাতে পড়িয়া কত কত চঞ্চলমতি যুবক একবারে পারল হইয়া অবঃপণে গিয়াছিল। স্ত্রীদ্বার নামটী কনকলতা। সন্তোষিণী এক দিন তাহাকে বলিলেন “দ্বিদি, আমাকে কথকতা শুনাইতে লইয়া চল না।”

কনক । কথকতা শুনিবে ! কত দ্বন্দ্বিণী দিবে বল, আমি ঘরে বসিয়াই তোমার কত কথা শুনাইতে পারি ।

সন্তো । কেন দ্বিদি ঠাট্টা কর, আজ আমি শিবচতুর্দশীর উপবাস করিয়া আছি, কিছু ভাল কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে ।

কনক । উপবাস করে আছ ! ও মা ! কেন না ! কাশীতে কি উপবাস করে ! তাতে যে বাবা বিবেশ্বরের অকল্যাণ হবে !

সন্তো । তবে এখানে কি করিতে হয় ?

কনক । একটু হাসিয়া, এখানে বাবা বিবেশ্বরের উপর সব পাপের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আচ্ছাদ আমোদে থাকিতে হয় ।

সন্তোষিণী ধর্ম্মের জন্ত পিপাসু হইয়া যত ব্যাকুলতা এবং গাঙ্গীর্যের সহিত কথা কয়, কনক ততই হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলে, “বোন, তোমার এ বয়সে কি এত ধর্ম্ম কর্ত্ত্ব ভাল দেখায় ! বিবেশ্বরের উপর সব ভার ঝাও ।” সে নারী ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চার্ম্মাকের শিষ্য, ভিতরে ভিতরে ধর্ম্মকে কেবল বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইত । কিন্তু সে সন্তোষিণীকে কিছুতেই টলাইতে পারিল না । শেষ রাগিয়া চটিয়া হিংসায় জলিয়া তাঁহার নামে এমনি এক মিথ্যা কলঙ্ক রটাইল যে একবারে তাঁহাকে দেশছাড়া করিল । এমনি মিষ্ট মিষ্ট করিয়া ব্যাকুল ভাব ভঙ্গীতে মিথ্যা কথা গুলি সাজাইয়া বলিত, যে তাহা কেহ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না । সন্তোষিণী তজ্জন্য লজ্জিতা অপমানিতা হইলেন, দ্বিদিম্বয়ের কাছে কত লাঞ্ছনা গন্ধনা খাইলেন, পাড়ার নষ্ট ছুট স্ত্রী পুরুষেরা নিন্দা উপহাস করিল, হাসিল, টিটকারি দিল, মর্ম্মভেদী কথা বলিল, অগত্যা তিনি শেষ কাশীবাসে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

ধর্মের আশ্রয় ।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, নোর নিশীথ সময়, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইতেছে, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, দিগ্বাণল আলোকিত করিয়া এক একবার বিদ্যুতের ছটা চমকিতেছে, মধ্যে মধ্যে রাত্রিচর অস্তগণের রব শুনা যাইতেছে, নিকটে কল্লোলিনী ভাগীরথী কল কল তর তর নাদে তীর বেগে ছুটিয়া যাইতেছে এবং তাহার উন্নত তরঙ্গ সকল উপকূল আকুল করিয়া গম্ভীর শব্দ উথিত করিতেছে । একটী তারকা কিংবা একটী খদ্যোতিকা আলোকও সেখানে নাই, কেবল পরপারে শাশান ঘাটে চিতাগ্নির শিখা দূর হইতে দেখা যাইতেছিল, এবং জলস্রোতের উপর তাহার উজ্জ্বল কিরণ জলিতেছিল । চারিধারে তিমিরময় মহাসমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তাহার মাঝখানে রাজপথের সেতুর উপর বসিয়া সন্তোষিণী একাকিনী রোদন করিতেছেন । জীবন যায় সেও ভাল, তথাপি পাপসংসর্গে অসং জনসমাজে তিনি বাস করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছেন । চক্ষের জলে গুহ্মল ভাসিতেছে, বৃষ্টি জলে পরিধেয় বসন, মাথার চুল ভিজিয়াছে । বিষণ্ণ বদনে, সান্ত্র নয়নে, হতাশ মনে কাঙ্গালিনীর ন্যায় রাজপথে বসিয়া কাঁদিতেছেন । দুঃখের যেন অপতারণ । সেই ভয়ঙ্কর কাল রজনীর অন্ধকার মধ্যে বরং বিদ্যুতের আলোক আছে, কিন্তু তাহার ভবিষ্যজীবনের অন্ধকার একবারেই অবিমিশ্র অন্ধকার, তাহাতে ক্ষীণজ্যোতি আশাখদ্যোতিকাও একটী জলে না । অনাথা অভিভাবকহীনা যুবতী স্ত্রীলোকের পদে পদে শত্রু, নির্জন প্রান্তরও যেমন বিপজ্জনক, সজন নগরও তেমনি ; যে ভালবাসা দেখায়, দয়া করে সেও শত্রু । কোথায় যাইবেন, কে স্থান দিবে, এই ভাবিয়া আকুল চিতে তিনি কাঁদিতেছেন । যাহার দয়া করিবার কেহ নাই, তাহার ক্রন্দনের অশ্রুজলবিন্দু যেন অধিকণা সৃষ্ণ । বাহিরের অন্ধকার

অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া অতি ভীষণ বৃত্তি ধারণ করিয়াছে। সে হুঃসময়ে তথায় জনমানবের গতি বিধি নাই, গ্রাম নগর পথ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু ভগবান্ নিরুণায়ের উপায়। যখন মানুষের বুদ্ধি ক্ষমতা পরাস্ত হয়, পৃথিবীতে কোন দিকে আর আশা ভরসা থাকে না, বাহিরের আলোক সমস্ত নিবিয়া যায়, তখন সেই সর্বব্যাপী বিপদভঞ্জন দেবতা বিপদাক্তকার ভেদ করিয়া নিরাশ্রয় জীবকে রক্ষা করেন, এমন উপায় দেখাইয়া দেন, যে তাহা গণনার অতীত।

যে সময় সন্তোষিণী এইরূপে পথে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন তৎকালে একটী পাখি দৈবঘটনা ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি দূর হইতে বামাকর্ষবিনিঃসৃত কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গমনে আস্ত হইলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া রোদন শব্দ শুনিতে লাগিলেন। এক এক-বার চকলা চপলার আলোকে তিনি সেই রোক্তদ্যমানা হুঃখিনী নাড়ীকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সন্তোষিণী অধোবদনে বসিয়া কাদিতেছেন, মহা হুঃখের অনন্ত পারাবার যেন তাঁহার চারিদিকে ভৈরব গর্জনে আচ্ছাদন করিতেছে, আর তরঙ্গনিক্ষিপ্ত কুণ্ডলকুমারীর ন্যায় তিনি আন্দোলিত হইতেছেন। আগন্তুক পাখি ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া শেষ নিকটস্থ হইয়া বিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তুমি কে গা? কেন ক্রন্দন করিতেছ? আর কেনই বা এ ঘোর নিশাকালে একাকিনী এখানে বসিয়া রহিয়াছ? যদি আমা দ্বারা কোন সাহায্য হয় বল, আমি আত্মাধের সহিত তাড়া করিব।”

সন্তোষিণী স্বদেশে এবং কাশীধামে লোকচরিত্রের বৈরূপ ভয়ানক নিব-
র্শন সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সাহস হইল না যে কোন কথার উত্তর দেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন, “মহাশয়! আমি পথের কাঙ্গা-
লিনী হইয়াছি, দয়া মাত্রা করিবার আমার আর কেহ নাই। আমার এ হুঃখ
কষ্ট বোধ হয় মানুষের দ্বারা দূর হইবে না। জীবনান্তই আমার
হুঃখের অন্ত।”

* পাখিকের মাথায় একটী ছাড়া ছিল। এবং হস্তে কতকগুলি খুঁটে এবং
কিছু স্নাত ময়দা। তিনি নিকটস্থ কোন গৃহবাসী সাধুর সেবার্থ সেইগুলি
লইয়া বাইতেছিলেন। তিনি এক জন বাঙ্গালী ভ্রমলোক, বার্ষিক এবং

পরোপকারী ব্রাহ্মণ। সন্তোষিনীর উত্তর শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। বলিলেন, “মা, তুমি কেন বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইতেছ, এই ছাতাটি রহিল, আমি শীত্র আসিতেছি।” এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে সাধুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেই স্থানের অনতি দূরে একটা ক্ষুদ্র নগর, তথায় সেই ভদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পরিবার পুত্র কন্যা ছিল। নাম তাঁহার সেবানন্দ শর্মা। অতঃপর সাধুর ভোজ্য সামগ্রী রাখিয়া আসিয়া সন্তোষিনীকে তিনি নিজগৃহে লইয়া চলিলেন, এবং তথায় অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। বাড়ীর গৃহিণীও তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন্তোষিনী নানা স্থানে উৎপীড়িত অভ্যাচারিত হইয়া এই ব্রাহ্মণগৃহে কিছু দিন নিরাপদে শান্তিতে অবস্থিত করেন। গৃহস্থামীর চরিত্রটি বড়ই ভাল। তিনি পরের হুঃখ ভুলিলে কান্দিতেন। ধর্ম্মের কোন আড়ম্বর বাচালতা ছিল না। বাড়ীতে পূজা পার্বণের বেশী ঘট জাঁক জমক দেখা যাইত না, কিন্তু জীবের দয়া, ভগ্নবানে অচলা ভক্তি ছিল। পথের মধ্যে কে কোথায় কোন অন্ধ বৃদ্ধ অথবা পক্ষু দরিদ্র কান্নালা অনাহারে নিরাশ্রয়ে পড়িয়া রহিয়াছে তাঁহাই তিনি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং কাহারো দেখা পাইলে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতেন। যাহারা হাতে তুলিয়া ধাইতে পারে না, গলিত কুষ্ঠ রোগে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে, তাহাদিগের মুখে স্বহস্তে তিনি আহারসামগ্রী তুলিয়া দিতেন। কাহাকেও রাহা ধরচ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও খাদ্য দান করিতেন। কেহ একাকী রোগশয্যায় ঘরে পড়িয়া আছে, একটু জল দেয় এমন লোক নাই, মরিয়াছে কি বাচিয়া আছে তাহার কোন সংবাদ কেহ লয় না, তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া রাত্রি জাগিতেন, বাড়ী হইতে পথ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহার সেবা করিতেন। এ সকল সেবার কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য সংকার্য্যও তাঁহার অনেক ছিল। কাহারো বাড়ীতে কেহ মরিলে সন্ধ্যাত্রে তিনি গামছা কাঁধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন এবং মৃত দেহের সংকার করিয়া আসিতেন। মুখে একটা কথা নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার রাত্রি, প্রতিবাসী অলস সুবকগণ বলিল, “দাদা মহাশয়, বড় খিদে পেয়েছে, কিছু দিন না খাই।” বিনা বাক্য ব্যারে

অজনি সেবানন্দ হঠাৎহাতে বাজারে চলিলেন । কেহ বলিল, "তো'টা মহাশয়, "আমি কাল জন কয়েক লোককে খাটিতে বলিয়াছি, একটু সাহায্য করিতে হইবে।" সেবানন্দ রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে গিয়া হাজির । নিজেই র'ধিতে লাগিলেন । এ সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় শত্রু মিত্র আশ্রয় পর ভেদজ্ঞান ছিল না । কোন বিধি উপবিধির সঙ্গে তাঁহার সংকাণ্ড মিলিতেছে কি না তাহাও তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেন না । যিনি গোপনে ঘেঁষিয়া গোপনে এবং প্রকাশ্যে পুরস্কার দেন তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ এই সকল সাধুকাণ্ড করিতেন ।

এই সুখী পরিবারে সন্তোষিনী মুখে বাস করিতে লাগিলেন । গৃহ-স্বামীর পরোপকার জনহিতৈষণা হৃৎসীর প্রতি দয়্য মমতা দেখিয়া, তাঁহার বিন্দ্র মধুর বচন শুনিয়া এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সরল মধুর বাব-হার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অত্যন্ত মোহিত ও প্রীত হইলেন । এই শান্তির পরিবারের শীতল ছায়া প্রতিবাসী নরনারীগণের জুড়াইবার স্থান ছিল । কেহ কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিলে, কিম্বা কোন পরিবারমধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিলে এই সাধু বিপ্র সপরিবারে তাহাদের হাতে পারে ধরিয়া কৃত-জ্ঞি করিয়া সমস্ত গণগোল মীমাংসা করিয়া দিতেন । তিনি বক্তৃতা করিয়া কিম্বা ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন ব্যাখ্যা করিয়া, অথবা উপদেশ দ্বারা লোকের ক্রোধ বিদ্বেষ হিংসা প্রবৃত্তির চিকিৎসা করিতেন না, তাহা জানিতেনও না ; কেবল আপনাকে ভুলিয়া পরের হৃৎথে হৃৎখী হইয়া কাঁদি-তেন, মুখ খানি কাঁচু মাচু করিয়া হাতঘোড় করিতেন, বাপ মা ভাই দাদা সম্বোধনে দুই একটী কথা বলিতেন, দাসের মত মাটি হইয়া লোকের পদসেবা করিতেন তাহাতেই সকলে একবারে নরম হইয়া বাইত । ভাল মন্দ স্বধর্মী বিধর্মী পাপী সাধু ঠেতাাদি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহাতে লোকে উপকৃত হয়, হৃৎথ চলিয়া যায় সেই সকল কাণ্ড করিয়া তিনি পরের মুখে সুখী হইতেন । তদীয় ব্রাহ্মণী এবং পুত্র কন্যাগণ এইরূপ সংকাণ্ডে চিরসহকারী ছিলেন । স্বামী স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া বধন তাঁহার হৃৎসীর "সেবা করিতেন, তাহা দর্শনে পাষাণ হৃৎথও স্নেহের সঞ্চার হইত । ঘোর অহঙ্কারী মহাক্রোধী ব্যক্তিও সেবানন্দের মুখের বিনম্রজ্যোতি দেখিয়া ভাল মানুষের মত আস্তে আস্তে কথা কহিত ।

সন্তোষিণী তাঁহার গৃহে থাকিতেন আর এই সকল স্বর্গীয় ব্যবহার মীরবে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেন। যত দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি ব্রাহ্মণের আচরণে অধিকতর মোহিত হইতে লাগিলেন। দেখিয়া স্তনিয়া মনে ভাবিতেন, “প্রকৃত ধর্ম যে জনসমাজে মানবপরিবারে আছে তাহা এত দিনে আমি বুঝলাম। এ স্বর্গীয় কুসুম তীর্থস্থানে, পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রক্ষুটিত হয় না।” সন্তোষিণী ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপে তিনি গৃহের কন্যার ন্যায় আত্মীয় পরিচিতি হইয়া রহিলেন। সেবানন্দের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া তিনিও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

এই গৃহবাসী নিরীহ ধর্মাত্মা বিপ্লব উপর এক জন সাধু মহাপুরুষের ছায়া পড়িয়াছিল তাই তাঁহার স্বভাব এত সুন্দর সুমিষ্ট। গৃহবাসী সাধুর সেবা করিয়া ইনি তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হন। তিনি যেমন বিনয়ী প্রেমিক প্রশান্তাত্মা গুরু, ইনিও তেমনি তাঁহার অনুরূপ শিষ্য। বাহিরে কোন আড়ম্বর সমারোহ নাই, অথচ স্বভাবতঃ তাহা হইতে ধর্মের শীতল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। তিনি জানিতেন না কেমন তিনি ধার্মিক। এক দিন অধ্যায় কথায় ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মা, তুমি যেরূপ ধর্মের জন্য লালা-রিত দেখিতেছি, যদি আমাদের বাবাজীর নিকটে এক বার যাও, তাহা হইলে বড়ই শান্তি লাভ করিতে পার। আমাদের বাবাজীর এমনি প্রসন্ন মূর্তি, আর এমনি তাঁহার মিষ্ট কথা যে নিমেষের মধ্যে সকল প্রকার ভব-যন্ত্রণা চলিয়া যায়। কত বিধবা পতিপুত্রবিহীন অনাথা তাঁহার কথা শুনিয়া শান্তি পাইয়াছে। তুমি যদি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, বড়ই কৃতার্থ হইবে। তাঁহার দর্শনে সশরীরে স্বর্গ লাভ হয় আর অধিক কথা কি বলিব। আমি সেই স্বামীজীর চরণপ্রসাদে পরিবার মধ্যে থাকিয়াও শান্তি সন্তোষ করিতেছি। তিনি লোকসঙ্গ প্রায়ই করেন না। কদাচিৎ মাসের মধ্যে দুই একবার বাহির হন, অবশিষ্ট সময় গভীর নির্জন গহ্বর মধ্যে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তিনি কাহাকেও শাস্ত্রও শিখান না, উপদেশও দেন না, কিন্তু এমনি হাসেন আর মিষ্ট মিষ্ট কথা বলেন যে তাহাতেই মৃতপ্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তাঁহার হাসিমুখ ধানি বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবত

অপেক্ষাও গভীর অর্থযুক্ত । তুমি দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবে । অদ্বুত তাঁহার চরিত্র, একাকী অন্ধকার মধ্যে গত পাঁচ বৎসর কাল মহাযোগতত্ত্ব সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, লোকে মনে করিত তিনি অস্তর্জ্ঞান হইয়াছেন, কেহ বা বলিত গর্তের ভিতর তাঁহার শরীর পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে । পাঁচ বৎসর পরে সম্প্রতি হঠাৎ তিনি দেখা দিয়াছেন । দেশ দেশান্তর হইতে কত কত সাধু মহন্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন । আমাকে তিনি বড় কৃপা করিয়া থাকেন । যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে তুমি চল, আমি দেখা করিয়া দিব ।”

ব্রাহ্মণের মুখে বাবাজীর অদ্বুত গুণকাণ্ডিনী শুনিয়া সন্তোষিনীর শরীর রোমাঙ্কিত হইল, চক্ষে জলধারা বহিল, অস্তরনিহিত ভগবতাক উদ্ভূসিত হইয়া উঠিল । তিনি যে কিরূপ মহাপুরুষ তাহার আভাস ব্রাহ্মণের পবিত্র উদার চরিত্র দেখিয়া সন্তোষিনী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তখনস্তর নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া গৃহস্থামীর পায়ে লুটাইয়া বলিলেন, “আপনি যদি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যান বড় কৃতার্থ হই । আমি বড় দুঃখিনী, শোক সন্তাপে আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যথিত আহত, এক্ষণে আপনার কথা শুনিয়া মনে আশা হইতেছে সেই সাধু মহাত্মনের কৃপায় আমারও তাপিত হৃদয় শান্তি লাভ করিবে । চলুন, আমি অদ্বাই আপনার সঙ্গে বাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । আপনি যে আমাকে পণ চাইতে তুলিয়া আনিয়াছেন, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা আমি এখন বুঝিতে পারিলাম ।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

অন্ধকারে মানিক ।

গঙ্গার ধারে একটা অতি সুস্বাদু নির্জন স্থান, চতুর্দিকে প্রশস্ত শস্য-ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে অশ্বখ নিম্ব এবং অত্রবৃক্ষের বাগান, তাহাতে বিচিত্র বিহঙ্গকুল নিরন্তর কলনাদে সজ্জিত করে। ভাগীরথীর সলিলসিক্ত শিথিলসমীরণ রাশি সমুদ্রস্থ প্রান্তর পার হইয়া সেই তরুভূজের পরিকৃত ভূমিতে সর্বদা প্রবাহিত হইত। এই বিজন স্থান স্বামী সদানন্দের আশ্রম। ইহার প্রকৃত নাম হরভজনদ্বাস, কিন্তু আমরা সদানন্দ বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসি। একটা কুটীরের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড শূড়ঙ্গ আছে, তাহার ভিতরে অন্ধকার গুহা, সেইখানে বসিয়া বাবাজী সর্বদা যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তিনি পার্শ্বস্থ শূণ্য বিলাসের নিকটতো তিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছেন, অনায়াস-লভ্য যে স্বভাবের উপহার তৎপ্রতিও স্পৃহা রাখেন না। প্রকৃতির নয়ন-রঞ্জন শোভা দেখিয়া চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিতেও কখন ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এমনি তাঁহার তপ্তকাকনের ন্যায় তেজঃপূর্ণ শরীর, প্রকৃত পক্ষের ন্যায় যুগকান্তির এমনি প্রসন্নতা, যে তাহা দেখিলে মায়াবদ্ধ জীবের ভবের জালা নিবারিত হইয়া যায়। অতি কোমল স্বভাব, কথাগুলি বড়ই মধুর, বিনয়ের যেন একবাণে অবতারণ। তাঁহার যে কোন গুণ আছে, বা ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য আছে ইহা তিনি জানিতেন না। বৈরাগ্যের প্রতিও তাঁহার বৈরাগ্য। একাল পর্য্যন্ত বাবাজীকে অগ্রে কেহ প্রণাম করিতে পারে নাই। পুরুষকে পিতা, স্ত্রীকে মাতা এবং আপনাকে দাস বলিয়া তিনি সম্বোধন করেন। যে সময় জগতের লোক সকল নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন তিনি জাগিয়া শৌচ আচমন স্নানাদির অন্য বহির্গত হন। প্রাণ্ডক ভজ্ঞ বিশ্র বাবাজীর বড় অমুগত প্রিয় সেবক, তিনি এক দিন সন্তোষিনীকে সঙ্গে লইয়া ঐ সময় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

তখন রজনী অবসান প্রায় হইয়াছে, কিন্তু অন্ধকার সকল গ্রহণ করে

নাই ; নিভৃত কক্ষে, বৃক্ষাশ্রয়ে তাহারা লুকাইয়া রহিয়াছে । উষার আলোকে সূর্য্য দেবের সমাগম চিহ্ন দেখিয়া নক্ষত্রগুলি একে একে ভয়ে গাঢ়া দিতে লাগিল । প্রভাতভারকার জ্যোতিঃ সেই অন্য কৌশলপ্রভ হইয়া আসিল । আকাশপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিবার জন্য পবন ঘেঁষ ঘেঁষ বীরে বীরে চামরহস্তে বাহির হইলেন, তাপসদিগের কানে কানে কি বলিলেন, পক্ষী-দ্বিগকে জাগাইলেন । বিহঙ্গপরিবার কেহ উঠিয়া বসিয়াছে, কেহ পাখা কাড়িতেছে, কেহ গাত্র কণ্ঠস্বন করিতেছে, কেহ কেহ বা গলায় সান দিতেছে । এমন সময় সন্ধানন্দ স্বামী ঘোর গম্ভীর পাদ বিক্ষেপে কমণ্ডলু-হস্তে তরুণ তপনের ন্যায়, প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায় গম্ভীরান করিয়া আস্রমে উপনীত হইলেন । সহসা বাবাজীর সেই দেবশ্রী সম্মর্শন করিয়া সজো-বিনীর সর্স্বাজ কাঁপিয়া উঠিল, চিত্ত চমকিত হইল, চকিতলোচনে তিনি তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন । কে সেই নারী, সেবানন্দ তাহার আশু-পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিয়া সবিশেষ পরিচয় দিলেন ।

আহা সেই বিজিতাত্মা সাধুর কি প্রসন্ন মূর্ত্তি ! শান্তি ঘন মূর্ত্তিমতী । মুখমণ্ডল আনন্দে ঢল ঢল করিতেছে । ঘেন হাসির এক ধানি চিরপট । ঘন মান বিলাস ঐশ্বর্য্য লাভের হাসির মত সে হাসি নয় । ভোগ স্বখামক ইন্দ্রিয়-পরিভূপ্ত ব্যক্তি বৃথা আমোদে আমোদিত হইয়া যেমন হাসে সে হাসিও নয় । হাস্য রে আপ্তকাম সাধুর স্বর্গীয় হাসি, তোমা- মত পবিত্র বস্তু অপভে কোথায় পাইব ! কাহার সঙ্গেই বা তোমার উপমা দিব ! নির্দোষ শিশু সন্তান জনমীর কোলে স্তন্যপান করিতে করিতে হাসে তাহা দেখিয়াছি । প্রেমের প্রতিমা স্নেহের অবতার সত্য নারীর প্রফুল্ল আননের হাসিও দেখিয়াছি । শত্রু নির্জিত হইলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ অন্য বৈরনির্ঘাতনকারী মুখে যে দৃষ্ট হাসি বাহির হয় তাহাও দেখিয়াছি । ফুলের হাসি, চাঁদের হাসি, হেমকান্তি শস্যমঞ্জরীশোভিত বিস্তীর্ণ ভূতাপের হাসি, নবজলপ্রাবৃত ক্ষীত-বক্ষ তরঙ্গাকুলিত বর্ষাকালীয় নদীর হাসি, তরুণাক্ষণের লোহিত রাগে অমুরঞ্জিত চিরতুষারাবৃত ধবল গিরির হাসি, নবনীরবকোলে ঢকঢক চপলায় হাসি, সকল প্রকার হাসিই দেখিয়াছি ; কিন্তু সিদ্ধ মহাজনের যোগপ্রভা-

সমন্বিত অটল শাস্তির দিব্যহাসি যেমন সুন্দর এমন আর কিছুই নাই। বিপুল ক্লেণ বহন করিয়া, পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৃপাসিক্ত সাধু পরিণামে অনন্ত হাস্যময়ী বিশ্বমনোমোহিনী অধিলমাতার নিকট এই হাসি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কৃত্রিম কৌশলে খাস প্রখাস রুদ্ধ করিয়া কল্পিত আলোক দেখিয়া যে হাসির উদয় হয়, তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই। মাদকসেবী মদ্যপান করিয়া যে হাসি হাসে তাহাতেও কিছু রস নাই। যৌবনমদে অন্ধ, বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত, সৌন্দর্য্যগর্ভে গর্জিত যুবক যুবতী এবং নবপ্রেমানুরাগে উদ্ভূত নায়ক নায়িকা যেরূপ হাসে তাহাতেই বা প্রতিভা মাহুর্ঘ্য কৈ? এ স্বর্গের হাসি, স্বর্গবাসী অমরগণের পৈতৃক সম্পত্তি। মানুষ ধর্ম্মের জন্য কেন এতকষ্ট স্বীকার করে, সংসারের কোন অবস্থাতে শাস্তি না পাইয়া পরিশেষে কেনই বা সে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয় এবং তাহার শেব ফলই বা কি, তাহা এই সদানন্দ স্বামীর হাসিমুখ স্পষ্ট ভায়ায় বলিয়া দিতে-ছিল। ইহা শরীরের ধর্ম্ম নহে, যোগী আত্মার যোগপ্রতিভা, আনন্দময়ী অননীর অনন্ত হাস্যের প্রতিচ্ছায়া। ফল দ্বারা যেমন বৃক্ষ চেনা যায়, হাসি মুখ দ্বারা তেমনি সাধুর সিদ্ধত্ব লাভের পরিচয় হয়। তাঁহার অন্তরের যে সচ্চিন্তা, যোগানুভূতি, ব্রহ্মসন্তোষ, বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের সৌন্দর্য্যচ্ছটা ললাটে, গণ্ডস্থলে, নয়নে ও জ্রুগলে দৃষ্টে ওষ্ঠাধরে বাহ বক্ষে আপনাদের স্বরূপ মূর্তি অঙ্কিত করে, তাহাকেই আমরা হাসি বলিতেছি। তাহার অভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় কোন বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ বা সাময়িক নহে, কিন্তু স্থির সৌখ্যমিনী তুল্য চিরহারী। এ হাসি চিরশাস্তির পুণ্যভূমিজাত আনন্দের ফুটন্ত গোলাপ কানন সদৃশ। যেন মেঘোদ্ভূত শারদীয় পূর্ণ শশধরের কমলীর কৌমুদীর উপর তীব্র বিজলীর জলস্ত রেখা। যদি কখন প্রেমের বিজলী অন্তর্হিত হয়, তথাপি শাস্তিচন্দ্রমার শুভ্র শীতল জ্যোতি নির্ঝাঁপ হইবে না। তাঁহার চিরহাস্যমুখ কেবল ইহাই বলে যে “ধর্ম্ম কর্ত্ত্ব সকলই মিথ্যা, সুখ দুঃখ জীবন মরণ সকলই মিথ্যা, কেবল হাসিই সত্য।” হায় কবে হাস্যালোকপূর্ণ অনন্ত চিদাকাশে এই ক্ষুদ্র জীবাত্মা পরমাত্মার হাসিতে হাসি মিলাইয়া মহাহাসি হাসিয়া হাস্যার্গবে ডুবিয়া যাইবে!

সন্তোষিণী সদানন্দ স্বামীর এই হাস্যময়ী ভাগবতী তনু সন্দর্শনে

অভিমান প্রত্যংশপন্ন হইয়া বলিলেন, “পিতা! এই চিরচুঃখিনী অনা-
খিনীর প্রতি এক বার কৃপাকটাক্ষ কর, আমি ভবঘ্রষ্টপাননে সর্বদা দগ্ধ হই-
তেছি, আমার যুক্তির পথ বলিয়া দাও, আমি আর তোমায় ছাড়িব না।”
এই বলিয়া তিনি বাবাজীর পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন।

সদানন্দ তদীয় প্রিয় শিষ্যের মুখে সেই সুভগা শুলভনা বয়সবর্ণিনীর
গুণের কথা সকল শুনিয়া বলিলেন, “অশ্বে! তুমি অমীর হইও না, বাহা
বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাহাকেও কখন উপদেশ দিই না, কেবল
শুনি। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড় আত্ম হইতেছে। কিন্তু কি
করি, আমি পৃথিবীর নিকট যাহা শিখিবার ছিল বাহা শিক্ষা করিয়া
এক্ষণে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। পূর্বে মালাস্তে এক
এক বার বাহির হইতাম, এবং লোকসঙ্গ করিতাম; কিন্তু কাহাকেও
পথের পথিক ভাবের ডাবুক পাইলাম না, তবে আর আমার অসার কুটু-
ম্বিতায় প্রয়োজন কি? শীঘ্রই আমি আকাশে অনন্তের সঙ্গে মিশিব।

সন্তো। আমার একটা গতি আপনাকে করিয়া বাইতেই হইবে।
আপনার নিকটে থাকিয়া দাসী হইয়া আমি পদ সেবা করিব।

সদা। আমার কি বাড়ী দর আছে মা, তাই নিকটে থাকিবে? পদ-
সেবাই বা কিরূপে করিবে? উহাত অচিরে মাটিতে মিশিয়া বাইবে।

সন্তো। আমি আপনার গুহার ভিতর থাকিব।

সদা। তাই বা আর কয় দিন, আমারত শেষ হইয়া আসিয়াছে।
গুহার ভিতর থাকিবে যে বলিতেছি, অচ্ছা মা, তুমি কি সংসারের মারা
একবারে কাটাইয়াছ বলিতে পার?

সন্তো। পিতা, আমার আর সংসারে কিছু নাই।

সদা। পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কিহা পদার্থে কি আর তোমার আসক্তি
নাই?

সন্তো। কোন আসক্তি নাই, কেবল ঘাহার পদে আমি আত্মসমর্পণ
করিয়াছি তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়।

সদা। তিনি কি তোমার স্বামী?

সন্তো। তদপেক্ষা বেশী, তিনি আমার জীবনসর্বস্ব।

সদা। যে রাজ্যে তুমি আসিয়াছ, এখানে পার্থিব কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। এখানে কেহ কাহারো স্বামী বা স্ত্রী নহে, সকলেই সেই অনন্ত চিহ্নানন্দের প্রতিবিম্ব সদৃশ। আচ্ছা বল দেখি মা, তিনিও কি বাসনাবিজয়ী মুক্তিপিপাসু সাধক ?

সন্তো। আজ্ঞে হাঁ। আমরা উভয়েই আধ্যাত্মিক প্রেমযোগে সম্মিলিত।

সদা। প্রেমের বিকার কাটিয়াছে কি বলিতে পার ?

সন্তোষিণী এ কথার পরিষ্কার উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ায় বাবাজী বলিলেন, "কিছু কাল তপস্যা করা চাই। সকল প্রকার ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করিয়া ভগবান্ সচ্চিদানন্দে আত্মবিসর্জন কর, কেবল তাঁহারই অনন্ত ঐশ্বর্য দেখিয়া দিবা নিশি ভুলিয়া থাক। আমার এ আশ্রমে কাহারো বাস করিবার অনুমতি নাই, তুমি একটু দূরে কুটির নির্মাণপূর্বক যথারীতি তপস্যায় নিযুক্ত হও, পরে, যথাসময়ে আবার দেখা হইবে।" এই বলিয়া তিনি গুহাপ্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর স্বামীজীর উপদেশানুরূপ আশ্রমবাটীর প্রান্তভাগে অদূরে তাঁহাকে এক কুটির নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। সেই পরপ্রেমিক দয়ালু ব্রাহ্মণই তপস্যার সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ করিয়া দিলেন। তিনিই তাঁহার আহার সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাইতেন। এইরূপে সাধুর সাহায্যে ভগবানের কৃপায় সন্তোষিণী মুক্তির সোপানে পদার্পণ করিলেন। যখন পথ পাইলেন, সঙ্গী ধরিলেন, তখন আর গম্য স্থানে পৌঁছিবার অন্তরায় কোথায় ? বাবাজীর স্বর্গীয় যোগবল তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে তিনি মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া সংসারসমুদ্রের ঘটনারাজীকে জলবুদ্বূদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অনুভব করত ভগবৎপদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিলেন। আশা বিশ্বাসের হস্তে সিদ্ধির ফল ধারণ করিয়া সাধনে নিযুক্ত হইলেন। হুতরাং সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

সন্তোষিণীরও এক প্রকার গতি করা গেল, বাস্তারামের সংবাট। এখন এক বার লগুয়া যাউক। তিনিও সেই বেগিং বাবুর হস্তে সংসারের উচ্ছ্রিষ্ট ঝাড়া কিছু সঙ্গে ছিল সমস্ত উৎসর্গ করিলেন। তার পর একাকী উদাসীন বেশে মত্ততার আবেশে পদতলে বদরিকাশ্রমে গিয়া ঘণ্টা সময়ে পৌঁছিলেন। তথায় মহারণ্য পরিবেষ্টিত নির্ঝরনিনাদিত এক অতি সুরম্য প্রতিকল্পর তাঁহার তপোনিবাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল। সমস্ত দিন রাত্রি তথায় ধ্যান চিন্তা জপ তপে মগ্ন থাকিতেন, কেবল দিনান্তে এক বার মাত্র কল মূল কলঙ্গ সংগ্রহের জন্য বাহিরে যাইতেন। মহা একাগ্রতা এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

যোগীজন নিসেবিত প্রাচীন তীর্থ বদরিকাশ্রম অত্যন্ত পবিত্র গম্ভীর স্থান। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস ইহা ভূষারবৃত্ত থাকে। দূরে দূরে তাপস-দিগের এক একটী নিভৃত নির্জন কুটীর, নিকটে অপর মনুষ্যের গতাগত নাই, বিষয় বাণিজ্যের কোলাহল নাই। চতুর্দিকে মহোচ্চ শৈলমালা, তন্মধ্যে পর্বতনিঃস্যান্ধিনী তটিনী সকল রজতঃ রেখার ন্যায় কূল কূল নাকে বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার মূহ কলঙ্গনির সহিত সুর মিলাইয়া পার্শ্বত্যা বিহঙ্গগণ গীত গাইতেছে। উপরে ঘন নীল স্তনির্মল অনন্ত পগন, নিম্নে নয়নরঞ্জন হরিষ্রণ উন্নতশির তরুরাজী। শীতল আকাশে শ্রদ্ধ সমীরণ, শান্তি শৈলে শান্তি সলিল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। শস্যভূগাছাদিত উপত্যকা ভূমি সকল সোপান শ্রেণীর ন্যায় গম্ভীর হইতে উর্দ্ধে শিখর প্রদেশে উঠিয়াছে, এবং তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র ভলশ্রোত শুভ্র ফেনরাশি উল্লীর্ণ করিতে করিতে দল দিকে ধাবিত হইতেছে। বায়ুর স্বন স্বন শব্দ, তটিনীর মূহ কলনাথ এবং পক্ষীদিগের সম্ভীত ধ্বনি তিন সুরে সুর মিলাইয়া শান্তিধায়িনী প্রকৃতিদেবী মহাদেবীর মহিমা

পানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বর্ষাকালীন নিবিড় নীরদের ঘন কুণ্ডলায়া বধন ঐ বিশালবপু ভূগরের সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে এবং তাহার গভীর ঘন গর্জনে গিরিকন্ডর সকল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, আর সেই সঙ্গে কনকলতিকা দামিনীর সহস্র কিরণে দ্বিঅণুল সমুজ্জ্বলিত হয়, তৎকালকার গাভীরা দর্শনে মন আপনা আপনি সেই অনন্ত প্রশান্ত মহান পুরুষের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তুষারকিরীটি নগেন্দ্রপতি হিমালয়ের এই সকল গভীর দৃশ্য দর্শনে, এবং বিচিত্র সজ্জীত ধ্বনি শ্রবণে, তাহার স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে এবং শীতল জল পানে চকল চিত্ত অযোগীর আত্মাও যোগের শান্তি অনুভব করে। নীল আকাশের তলে, মুক্ত বায়ুর কোলে, তুঙ্গ গিরির শিখরে বসিয়া, ভীমকান্তি অভ্রভেদী হিমালয়মাণ্ডিত প্রকাণ্ড গিরিরাজীকে সম্মুখে করিয়া একবার অনন্তের পানে চাহিলে আর অন্য কিছু মনে থাকে না, ক্ষুদ্র জলবিন্দু যেন অনন্ত মহাসিন্ধুতে একবারে বিলীন হইয়া যায়। অসৌম চিদ্রাকাশে চিত্তবিহীন যোগভরে যেন উড্ডীন হইতে থাকে।

“মস্ত্রেয়সাধন, কিস্মা শরীর পতন” এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহ্যারাম যোগাসনে উপবেশন করিলেন। দিন রাত্রি মাস বর্ষ নিমেষ মুহূর্তের ন্যায় চলিয়া বাইতে লাগিল। আহার নিদ্রা কেবল নাম মাত্র, পরম চৈতন্যের ধ্যান চিত্ত সর্বদা নিমগ্ন। কিন্তু অগ্রে শরীরের পতন, তার পর মস্ত্রের সাধন। ক্রমে তপস্যার তেজে শরীর শীর্ণ দুর্বল শুষ্ক হইতে লাগিল। শেষ এমনি নিজ্জীব হইয়া পড়িলেন, যে এক বার বাহিরে গিয়া যে আহার অধ্বেষণ করিবেন তাহারো সামর্থ্য রহিল না। ক্ষুধা নিদ্রার অধীন বলহীন পার্শ্বভৌতিক তমু নিজঃস্বয় পরিত্যাগ করিতে চাহে না। জলের মীন জলেই বাঁচে, ভৌতিক দেহ তেমনি ভৌতিক পদার্থ অধ্বেষণ করে। শ্রুতরাং সেবার অভাবে শরীর ক্রীণ মলিন রুগ্ন হইয়া পড়িল।

বাহ্যারাম শরীরকে একবারে কঙ্কালমাত্র সার করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে যেন পদদ্বারা দলিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভৌতিক দেহরাজ্যে রিপুপরিবার মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন অপরিচীর্ণ শোণিত মাংস-লোপুণ বাসনারাক্সসী পণ্ডপ্রবৃত্তি দৈহিক জীবনীশক্তিকে ডাকিয়া বলিল,

“দেখ, পূর্বে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই তো সত্য হইল। এবার আমরা সবংশে নির্কলঙ্ক হইতে বসিয়াছি, আর রক্ষা নাই, শীঘ্রই আমাদের জীবন বিনষ্ট হইবে, তোমরা শেষসংগ্রামের জন্য সকলে প্রস্তুত হও। আমরা মরিবার জন্যই জন্মিয়াছি, প্রাণ তো বাবেই, তবে বিনা-যুদ্ধে কেন বায়; প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া মরিব। তোমাদের বাহার বড় চুঁকু শক্তি বল আছে, তাহা লইয়া আমার পশ্চাতে আগমন কর। আমরা আত্মরক্ষার জন্য সময়ে প্রবৃত্ত হই।”

এই বলিয়া কুবুজি, কুয়ুজি, কুকল্পনা, নিরাশা, অবিশ্বাস, ভয়, আত্মবিশ্বাসি সন্দেহ প্রভৃতি বাহারা ভয়ে লুকাইয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই রণরঙ্গিনী ভীমকন্যা বাসনা রণস্থলে দণ্ডায়মানা হইল। উহার সন্দেহ মহা হৃদ্যার গর্জনে করিয়া বাহ্যারামকে জুড়ি সহকারে বলিতে লাগিল, “রে আত্মঘাতী, ভ্রাত্ত, গৃহাত্মে অবস্থান কালীন মনে মনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলি তাই শেষে কাজেও করিলি? আমরা সকলে মিলিয়া এত যে বিলাপ আত্মনাশ করিলাম, কত সংপরাশ্রম সঙ্গত্বে দিলাম, তাহার প্রতি একবারও মনোযোগ দিলি না? অচ্ছা তোরে উপ-যুক্ত শিক্ষা দিতেছি দাঁড়া?” অনন্তর তাহারা বাহ্যারামের তপোনিষ্ঠা, সাধনপ্রসিদ্ধতা, বৈরাগ্যপ্রভাব, যোগামুরাগ সমস্ত বিপর্যস্ত করিয়া তাঁহার উপর চাপিয়া বসিল। শত্রুকুলের ভীষণ আফালন দেখিয়া অগত্যা তিনিও মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বাহা কিছু দণ্ড সম্মল অস্ত্র সস্ত্র ছিল তাহা লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যোগ ধ্যান নামগান অপতপ প্রভৃতি রক্ষকগণের আশ্রয় লইলেন।

স্থির চিত্ত হইয়া বাই নির্কাগনক সন্তোষের জন্য বাহ্যারাম একটু আয়োজন করিতেছেন, সহসা অলক্ষিতভাবে নিজজীবনের প্রেমালীয়ার বিচিত্র বর্ণের ছবিগুলি মানসনেত্রে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি মন সংসারের দিকে মহাবেগে ছুটিতে লাগিল। আগ্রহাবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, যেন সন্তোষিনীর কোলে মাথা বিয়া ভইয়া আছেন এবং ভাবে গদগদ হইয়া তাঁহার প্রীতিশ্রবা পান করিতেছেন। এত দিন মহাবৈরাগ্যের জলজ তেজে প্রাণ মন প্রবৃত্ত

উৎসাহিত ছিল, বিচ্ছেদ বেধনা অনুভূত হয় নাই, এক্ষণে পূর্বের সমস্ত ভাব চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য ঘটনা, কল্পনা, সুখস্বপ্ন সমস্ত যেন স্রোতের ন্যায় সারি সারি একটার পর একটা মনে উদ্ভিত হইয়া কষ্ট দিতে লাগিল। তাড়াইতে যান, ভুলিতে চেষ্টা করেন, কিছুতেই কিছু হয় না; বরং আরো তাহারা মুখ বাহির করিয়া নিকটে আসে, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটার পশ্চাতে দৌড়িয়া যান, অন্য দ্বার দিয়া আর দশটা ঘরে প্রবেশ করে। দূর হ! বলেন, কেহ নড়ে না; ভয় দেখান, তাহাতে ভয় পায় না। আবার হাসে, মুখ ভ্যাংচায়, উপহাস করে। ভৌতিক দেহ যত দিন দেবভাবে পরিণত না হয় তত দিন সে ভূতের অধীন। যেন শত শত ভূত পেত্নী তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। একে অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ, ক্লিষ্ট অবসন্ন, তাহার উপর নিরাশা অবিশ্বাস বিরক্তি মানসিক দৌর্দৈর্ঘ্য, তাঁহার চিৎ নিমেষের মধ্যে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। এরূপ উজ্জ্বল মোহময় রমণীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে ইতি পূর্বে কখন ঘটে নাই, এ যেন একবারে স্বর্ণাকরে অঙ্কিত, প্রস্তরে খোদিত, অঙ্কিত মজার সঙ্কট গ্রথিত। যদিও ইহা মহাবিকারের অবস্থা, কল্পনার লীলা, অবিকার খেলা, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। অসংবত মন, দুর্বল রুগ্ন মস্তিষ্ক, সেই স্বপ্ন কল্পনা পান ভোজন করিয়া সুখী হইতে চায়, কিন্তু শেষে দুঃখে মরে। বিরহের অবস্থায় ঐশ্বর্য ঘটনাবলী আরো সহস্র গুণ মনোহর এবং সুমিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। অনলের সঙ্গে পতঙ্গের কি যে নিগূঢ় আত্মীয়তা তাহা বিরহানলদগ্ধ প্রাণীই কেবল জানে।

“আচ্ছা, এক বার ধ্যান করিয়া দেখি, মনের গতি কিরাইতে পারি কি না।” এই বলিয়া তিনি চিত্ত সমাধানপূর্বক ধ্যানে মগ্ন হইবার চেষ্টা করিলেন। “তুমিই সত্য, তুমি সার, আর সকল মিথ্যা অসার। তোমাতে আমি, আমাতে তুমি। অন্তরে বাহিরে তুমি পরিপূর্ণ।” বারম্বার এই কথা বলিলেন। অণু কাল নিস্তরু থাকিয়া “এ কি বিপদ! ধ্যানের মন্ত্র অপিতে অপিতে আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম! পুকুর, বাগান, ফুলের গাছ, শিবের মন্দির, রাসমঞ্চ, পুষ্কার দালান, আটচালা, অট্টালিকার ছাদ, এ যে

সেই আমার বাড়ীর ছবি দেখছি! বা, সব জন্মে যি ঢালা হইল! যথেষ্ট এক, মনে ভাবছি আর এক। হায় কেন আমি তোমার ভাল বাসিয়া-ছিলাম! এত জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার পর আমার যদি এই অবস্থা হইল, তবে না আমি তোমার কতই যত্ন হইতেছে! আহা, তোমাকেও সান্ত্বনা দান করিবার কেহ নাই! তোমার দুর্দশা যে কি বড়িগাছে তাহা ভাবিলেও আমার প্রাণ কাটিয়া যায়। অসহ্য বিরহকাতর্য দেখিয়া হয়তো কত দুই লোকে তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে। আমাকে হারাইয়া নিঃশ্রয় অনাধিনীর বেশে হয়তো পথে পথে বনে বনে তুমি কাঁদিয়া বেড়াইতেছ। কিম্বা শোক দুঃখে ভগ্নহৃদয় হইয়া শেষ অকালে মৃত্যুমুখেও বা পতিত হইয়াছ! যাউক, আর কাঁদিব না। কাঁদিয়া আত্মনাশ করিয়া দেহ পাত করিলেও কি এ দুঃখের অন্ত আছে? এ যে অনন্ত দুঃখ।

“কিন্তু বাহা করিতে বসিলাম তাহা ত হইল না। এ যে অনন্তের পরি-বর্তে সান্ত, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিবর্তে জড়চৈতন্য আসিয়া পথ ঘেঁষ করিল। বাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি হয় তাহাই পুনঃ পুনঃ পান করিতেছি! হায় প্রেম কি ভয়ানক বিকার! বাহাতে মনের শান্তি ভগ্ন করে, চিত্ত বিচলিত হয়, জ্ঞানী যোগীরা তাহাকে বিষম পরিভ্রাণ করেন। সবইত বুঝিলাম, এখন মিথ্যা মায়ার হাত এড়াই কি প্রকারে? আহা সত্য যদি মিথ্যার মত সহজে মিষ্ট লাগিত। ঠাকুর, বাহা আমার অনিত্য তাহাকে কেন তুমি এত মোহিনী শক্তি দিলে? যদি দিয়া আত্মা কাঁদিয়া লইবে, তবে মন হইতে তাহার দাগ কেন একবারে মুছিলে না? অনন্তমূর পার্থক্য প্রলোভনে আসক্ত হইলে তোমাকে পাওয়া যায় না, এই জন্য তাহা হইতে যদি বঞ্চিত করিয়া থাক, তবে তুমি সফল হইয়া কেন তোমার গুণ মৌল্যে আমাকে ভুলাইয়া রাখ না? বুঝিলাম আমি বড় দ্বিষাত্ত দেবতা, অন্য কাহাকে ভালবাসিলে তোমার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। আচ্ছা তাহা হইলে, অন্যকে তবে আমাকে বাইতে দাও কেন? আপনার দিকে কেন টানিয়া লও না? হায়! যে ইচ্ছা সকল কার্যের মূল শক্তি, সে নিজেই যদি স্নায়ুসমূহ হইয়া পড়ে, তবে আমি কাহার শরণাপন্ন হইব? রিপূ-দ্বিগের বিধাত্ত বাণে জড় মন প্রাণ জর্জরিত হইয়াছে। এখন মারিলে

যদি প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়, তবে না হয় আমার মরণই হউক ! হায় রে আমি দুই কূল হারাইলাম ! যদি উচ্চ জ্ঞানের অনুমোদিত উচ্চ ব্রত না লইয়া কোন রূপে সংসারে মাথা ঠুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আর এত কষ্ট হইত না। আবার কি সংসারে ফিরিয়া যাইব ? না, মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া তাহার আকর্ষণে কি আর ডুলিতে পারি। কিন্তু আর সহ্য হয় না, হৃদয় অশান্তির অনলে জলিয়া যাইতেছে, ভজন সাধনে কোন ফল ফলিল না। প্রবৃত্তি সকল যেন এক সময় মত্ত মাতঙ্গবৎ দশদিকে ধাবিত হইতেছে। হে রিপুগণ, হে প্রবৃত্তিসকল, আর আমাকে হুঃখ দিও না, রক্ষা কর। আমার অস্ত্র চূর্ণ হইয়া গেল।”

এই রূপ বিলাপ আত্মনাদের পর বাহ্যারাম সেইখানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। এ প্রকার বিপদে একবার যে তাঁহাকে পড়িতে হইবে তাহা জানা কথা। কেন না, অজ্ঞাতসারে যে মোহগরল তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাহার ফল অবশ্যস্তাবী।

বাহ্যারাম নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া জপ তপ জ্ঞান কর্তব্য ধ্যান যোগ সাধন চিন্তার অভিমান ছাড়িয়া যখন ক্ষীণ স্বরে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—“মা গো, তুমি কোথায় ! কাতর সন্তানের পানে মুখ তুলে এক বার চাও মা, আমি বুঝি এই বার মরলাম। আমার ব্যথিত অঙ্গে তোমার স্নেহহস্ত ধানি একবার রাখ মা, তোমার শীতল কোলে আমি একটু ঘুমাই। একটু চরণামৃত আমার মুখে দাও, শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করি।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। সেই অবস্থায় এই মুহূ মধুর দৈববাণী শ্রবণ করিলেন ;—“ভয় নাই, ভয় নাই, আশা পূর্ণ হইবে। পুরুষ আত্মা স্ত্রীআত্মা পরমাঙ্গায় গিয়া মিশিবে। সমুদ্রেরে স্বর্ণারোহণ করিবে। যোগিনী মাতার নিকট দীক্ষিত হও, তিনি তোমার সংপথ দেখাইয়া দিবেন।”

যখন এই স্বর্ণার আশাবাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার শুষ্ক বিশার্ণ মুখমণ্ডলে আবার কিঞ্চিৎ জীবনের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। আশ্রমের অন্ধরে এক যোগিনী মাতা অবস্থিতি করিতেন, তিনি সেই সময় বাহ্যারামকে অচেতনপ্রায় দেখিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লন, এবং কমণ্ডলু হইতে বিন্দু বিন্দু জল তাঁহার মুখে প্রদান করেন। তাঁহার যোগানন্দময়ী ভগ্ন

সংস্পর্শে বাহ্যারাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার মৃৎপানে চাহিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে তাপস-মণ্ডলীমধ্যে মহা আনন্দ ধ্বনি উঠিল । সকলে এই সবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিলেন । গরল হইতে এত দিনে অমৃত উৎপন্ন হইল ।

এই অমৃত প্রতি ঘণ্টে, প্রতি ঘটনাঘ, প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে গরলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । প্রত্যেকের জীবনে, মানবীয় প্রত্যেক সম্বন্ধের মধ্যে ইহা লুক্কায়িত রহিয়াছে । সুখ দুঃখ যোগ সুস্থতা, জীবন মরণের ভিতর অমৃত আছে । শক্রতা মিত্রতা, সংসার বৈরাগ্য, স্থনীতি দুর্নীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলের মধ্যে অমৃত আছে । দোর নরকের ভিতরেও আছে । তাই স্বয়ং মহাদেব ভূভারহাণী ভগবান ইহা উদ্ধারের জন্য মঙ্গলহস্তে বিশাল ন্যায়দণ্ড ধারণপূর্ব্বক পাপকলুষিত এই বিস্তীর্ণ ভবসমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন । তিনি সকলকে এই কার্য্যে যোগ দ্বিবার জন্য ডাকিতেছেন । বাহারা এই পবিত্র কার্য্যে সহকারী হয়, তাহারা অস্তিমে গোলোকধামে বৈকুণ্ঠপতির পারিষদ হইয়া অমরগণসঙ্গে নিত্য কাল অমৃত রস পান করে । যেখানে যে অবস্থায় যে কোন সম্বন্ধের ভিতর যিনি এক বিন্দু প্রেমের আশ্রয়ন পাইয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি স্বর্গীয় প্রেম সাধনে প্রবৃত্ত হউন । ধন্য তাহারা বাহারা সংসার-গরল হইতে অমৃত তুলিয়া লইতে শিখিয়াছে ! দুর্ভাগ্য তাহারা বাহারা বলে, “আমরা গরলপানে জীবন শেষ করিব, তাহা মন্থন করিয়া আর অমৃতের অপেক্ষা করিতে পারিব না।” ভগবানের রাজ্যে নিরাশা নাই । গরল মন্থনের জন্যই মনুষ্য জীবন এবং তাহাতেই তাহার কৃতার্থতা । সে কার্য্য ছাড়িয়া আর সে কিই বা করিবে ? বাহ্যারামের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে অমৃতের অন্বেষণ কর, নিশ্চয়ই লাভি পাইবে ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

যোগশিক্ষা ।

অনন্তর সেই বিজনবাসিনী যোগিনী মাতা শীর্ণদেহ বাহ্যারামকে অন্ধ ধারণপূর্বক আপনার আশ্রম-কুটীরে লইয়া আসিলেন এবং তথায় মাসাধিক কাল তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার সেবা দ্বয়ে সাধু বাহ্যারামের স্বাস্থ্য বল ফিরিয়া আসিল কেবল তাহা নহে, তদীয় যোগপ্রভাবে তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন।

এক নিভৃত গিরিসঙ্কটে গহন বনমধ্যে নির্ঝরতটে যোগিনী মাতার আশ্রম। তাঁহার মাতৃমূর্তি বনদেবীর ন্যায় সেই বনস্থলীর চারিদিকে শান্তি প্রসন্নতা নিরন্তর বিকীর্ণ করিত। তাঁহার এমনি মহিমাময় দেব-প্রভাবশালী রূপলাবণ্য, যে দেখিলে হঠাৎ বুঝা যায় না বয়ঃক্রম কত। পরিণত দিব্য-দেহে প্রবীণতা ও নাস্তীর্ঘ্যের লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান, অথচ তাহা ধর্ম-যৌবনের প্রকৃষ্টতা এবং কমনীয় মধুর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। জটাকার-লম্বমান আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত। ঈষৎ লোহিত রাগরঞ্জিত শুভ্র স্থলর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি গোলাপ কুসুমের আভায় দীপ্তিশালী ; সর্বাঙ্গে বিভূতি, এবং উজ্জ্বল গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, গলে রুদ্রাক্ষমালা। তাঁহার অচঞ্চল কমল নয়ন যোগপ্রভাসমন্বিত, এবং ললাট ও গণ্ডস্থল অতি-মাত্র প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট ! বেতোজ্জ্বল দন্তশ্রেণী শোভিত মুখমণ্ডল পরমানন্দে বিকসিত। সেই সহাস্য আস্যে মূঢ় মধুর স্বরে যে সকল স্বর্ণীয় বাক্যসুধা সচরাচর করিত হইত তাহা ভবদাবানলদগ্ধ সত্তপ্ত জনের পক্ষে অমৃত সন্দেশ ছিল। দেবী যোগসন্তোষে তৃপ্তকাম হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্বক জলপ্রপাতের ধ্বনির সহিত বীণাধ্বনি মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে ধর্মসংস্কৃত ভাষায় মধুর গম্ভীর নাদে দেবাদিদেব ভগবানের স্তব গান করিতেছেন, তখন বোধ হইত যেন অমরগণ স্বর্ণ হইতে তথায় অবতীর্ণ হইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। সেই তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত রব জন্মে বনভূমি ছাড়িয়া

নিরিশৃঙ্খল, গিরিশৃঙ্খল অতিক্রম করিয়া আকাশে, আকাশ হইতে মহাকাশে
স্তরে স্তরে গ্রামে গ্রামে সমুপ্তিত হইয়া পবনহিম্মোলে ঘেন ক্রীড়া করিত,
এবং লতাকুঞ্জ তরুরাজীকে বিধৃত ও নির্যববাহি বৈশকল্যকে প্রতিধ্বনিত
করিয়া পুনরায় আবার গায়িকার নিকট ফিরিয়া আসিত। তাহা শুনিতে
শুনিতে বাঞ্ছারাম যোগমগ্ন-চিত্তে ঘেন ঘুয়াইয়া পড়িতেন। তখন
তাহার আত্মা আকাশবৎ দৃষ্ক হইয়া চিগাশে মিশিয়া বাইত। স্বয়ং
ভগবান ঘেন একাকী বিভনে বসিয়া সেই বামাকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ
করিতেন।

বাঞ্ছারাম কৃতজ্ঞরসে রিগলিত হইয়া বলিলেন, “মাতঃ! আপনার
শীতল বক্ষের সংস্পর্শে আমার বাসনাজর্জরিত ভগ্নবেহ শান্তি লাভ
করিল, আমি বড় কৃতার্থ হইলাম। বালা কালে আমি মাতৃহীন হইয়া
একপণে আবার মাকে পাইলাম। একপণে এমন দিক পথ দেখাইয়া বিন
বাহা ধরিলে আর আমাকে ভবিষ্যতে পরীক্ষায় না পড়িতে হয়।”

যোগিনী বলিলেন, “বৎস, তুমি বালক, অপকর্মতি, তারি সাহসের কাণ্ডে
হাত দিয়াছিলে। অগ্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ সম দম বিচার শান্তি
সাধনপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়া তার পর বাহিরে আসিতে হয়, ইহাই
যোগশাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ বিধি এবং তপোষনবিধির অবলম্বিত পথ। তুমি
বাহ্য প্রমত্ততার সাহায্যে আপ্যাত্তিক প্রেমে প্রবেশ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত
হইয়াছ। যোগের অটল ভূমিতে প্রেমের বৃক্ষ জন্মে। আগে যোগ তার
পর প্রেমমহাভাব। বাহা কিছু হয় ভালর জন্যই হয়, আর কোন ভয়
নাই; কণ্ঠের ব্রত সাধনে আর তোমাকে ব্রতী হইতে হইবে না।”

তাহার স্নেহপূর্ণ আশা বচনে বাঞ্ছারাম সাহস ভরসা পাইলেন এবং
উৎকল লোচনে বলিলেন, “মাতঃ! বলুন দেখি, কেন আমার এমন দুর্দশা
উপস্থিত হইল? আমিও সমস্ত ত্যাগ করিয়া কণ্ঠের ব্রতচরণে প্রবৃত্ত
হইয়াছিলাম, মনে কোন বাসনাকেত স্থান দিই নাই, তবে কেন আবার
দুঃখ পাইলাম?”

সম্বোধিত চিত্ত নিত্যযোগমগ্নী যোগিনীর যোগবিদ্যা এবং যোগবল উভয়ই
করতল ন্যস্ত ছিল। পুনরপি তিনি বলিলেন, “ছাড়াটাইত ধর্ম নয়, সে

কেবল মনকে ধার্মিক করা, তৎসঙ্গে আবার সংপদার্থ ধরা চাই। ভগবৎ-স্বরূপের জীবন্ত লাভেরা প্রেমমার্গের জীব প্রস্তুতি না হইলে শান্তি লাভের আশা নাই। অনেক সাধক কেবল ছাড়ে, কিন্তু ধরিতে পারে না। তাহাদের জীবনে চিদানন্দের জ্যোতি বিকসিত হয় না। তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান, ইচ্ছায় ইচ্ছা, ভাবে ভাব, ক্রটিতে ক্রটি, আনন্দে আনন্দ মিলিয়া এক হইবে, তবেত সিদ্ধত্ব লাভ করিবে। ‘আমি সুখ বিলাস ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়াছি, এই জ্ঞানের মধ্যেও অহমিকা থাকে। ধর্মেরই হউক, আর বিষয়েরই হউক, আমিভের একটুমাত্র দুর্গন্ধ থাকিলে ভগবান্ সে দিকে আর অগ্রসর হন না। ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত নিকাম ধর্ম্মে ব্রতী হইলে ভগব-চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ব্যতীত কেবল পণ্ড শ্রম।

“ভগবদ্বীত্য শ্রীকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন “যোগস্থ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যজ্য ধনঞ্জয়। সিদ্ধাসিন্দোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।”

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কৰ্ম্ম কর। ফলা-কলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয় তাহাকে যোগ বলা যায়।

তিনি আরো বলিয়াছেন, “কৰ্ম্মেচ্ছিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ। ইচ্ছিয়াৰ্থান্ বিমুঢ়ান্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥” যে ব্যক্তি সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, অথচ অন্তরে কেবল বিষয় চিন্তা করে, সেই নির্বোধ মনুষ্যকে কপটাচারী বলা যায়।

“তুমি যে উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিবে মনে করিয়াছিলে তৎপ্রতি তোমার ভিতরে ভিতরে অন্ত্যস্ত আসক্তি অন্নিয়াছিল, তাই তপস্যাতে এত বিয়ৎটিল। অনেক লোক উপায়কে ভালবাসিতে গিয়া এইরূপে ভগবান্কে একবারে হারাইয়া কেলে। তাহার উপায়ের পূজা করে, উপায়কে বত পারে খুব বাড়ায়, সময়ে সময়ে ক্রোধ বশতঃ বৈরনির্ব্যাভূতের অন্য উপায়কে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, অবশেষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধোঁর-তর পাপান্তর্জনেও প্রবৃত্ত হয়।”

যোগিনী মাতার অলৌকিক যোগবলের পরিচয় পাইয়া বাহ্যারাম তখন কাঁদিয়া অধীর হইলেন, এবং আত্মপ্রাণি সহকারে বলিতে লাগিলেন, “হায়, কোথায় আমি বিন্দুর সাহায্যে সিদ্ধকে পাইব, না বিন্দুর প্রলোভন

মায়ায় প্রেমসিদ্ধ হরিকে ভুলিয়া গিয়াছি! আমার প্রাণের সধা হরিকে আমি আদর বহু, ভক্তি শ্রদ্ধা করি নাই! মানুষকে আমি তাঁহার প্রতি-
দ্বন্দ্বী, প্রেমের অংশী করিয়া ফেলিয়াছি! হায় কি মূর্খ আমি! কি
নীচাশয় কঠোর জব্বর আমি। বাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এক সময় আমি
পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতি উপেক্ষা হতাবর ঐক্যসীমা!
অহো! এ কি নিদারুণ মনঃপীড়া! আমার বড় অপরাধ চইয়াছে। এমন
প্রেমময় উদার কমাশীল চিরমুহূর্ত্তকে আমি ভালবাসিতে পারিলাম না। তবে
আর আমি কোন অপকর্ম না করিতে পারি? হায় মোহ, ভ্রমি কত রূপেই
না মনুষ্যমনকে বিপথগামী কর! হা ধর্ম, তোমার মধ্যেও বেধি অশেষ
বিধ মায়ায় ছলনা আছে। কি দুর্ভাগ্য আমার! কি ভয়ানক ভ্রম! ঠাকুর,
তোমার চক্রে কে বুঝিবে? আমি কি তোমার অনন্ত লীলা বুঝিয়া উঠিতে
পারি? আহা এখন তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার মধুর প্রেমে কিরূপে
মজিয়া বাইতে পারি তাই বলিয়া দাও। তোমাকে ভালবাসিবার জন্ত যে
প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে! ভুলাইয়া লণ্ড, মুগ্ধ করিয়া ফেল; তোমার
প্রেমের জলন্ত জ্বাবকের ভিতরে ফেলিয়া আমাকে বিগলিত কর। ঐ
প্রেমের রং চক্ষে মাধাইয়া দাও, সেই চক্ষে আমি সমস্ত অগ্নি দেখি।
আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলিও না, মায়ায় মুগ্ধ করিও না। স্বয়ং, তোমার
চরণে মাথা দিয়া এই আমি পড়িয়া রহিলাম।”

জলসিক্ত উর্বরা ভূমিতে উত্তম বীজ রোপিত হইলে তাহা যেমন অচিরে
অঙ্কুরিত এবং ফলফুলে সুশোভিত হয়, যোগিনী মাতার উপদেশাবলী
বাহ্যারামের চিত্ত-ক্ষেত্রে উদ্ভূত অচিরে সুফল প্রসব করিল। তিনি
তাঁহাকে “সৎ চিং আনন্দ” এই মূল মন্ত্র প্রধানপূর্ব্বক যোগশক্তি
সংক্রামিত করিয়া স্বধারীতি দীক্ষিত করিলেন। এই মূলমন্ত্র অগ্ন করিতে
করিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন লাভ হইল। আহা সে কি অপূর্ব্ব
স্বর্গীয় অবস্থা! সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্রবিল জ্যোতিতে প্রাণ একবারে
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত আকাশ চিদালোকময় দেখিতে
লাগিলেন। কি সুন্দর দৃশ্য! যেন জ্যোতির সাগরে জ্যোতির তরঙ্গ।
নয়নময় আনন্দাশ্রিতে পরিপ্লাবিত, মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে

প্রফুল্লিত, সর্বদা হরি, আশ্রা প্রেমানন্দমাগরে নিমগ্ন। ভগবানের প্রেম-
বক্ষে সাধু ভক্ত অমরাআদিগকে দেখিয়া তিনি তৃপ্তকাম হইলেন। তখন
গুরু শিষ্য উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গভোগ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে যখন সব দিক জ্যোতির্ময়, আনন্দময় হইল, তখন
যোগিনী মাতা “পুণ্যপুঞ্জন যদি প্রেমধনং কোপিলভেৎ তস্য তুচ্ছম্
সকলম্, প্রেমসূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণমেকং জ্বলয়ে, সকলং হস্ততলম্।”
এই শুল্ললিত সঙ্গীত গাইলেন।

বাহ্যারাম জীবনে কখন গান করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার এমনি
ভাবাবেশ হইল যে তিনিও অজ্ঞাতসারে সুরে সুর মিলাইয়া সেই গীত-
ভরঙ্গে ভাবন ভাসাইয়া দিলেন। পরে যোগিনী মাতা তাঁহাকে কোলে
বসাইয়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অধিকতর উল্লাসের সহিত গান ধরিলেন।
এমনি সে মধুর সঙ্গীত, তাহা শ্রবণে হিম্মানিরঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ সকল যেন
জ্বীভূত হইয়া স্রোতস্বতীরূপে বহিয়া বাইতে লাগিল, বায়ুমণ্ডলের সহিত
সমস্ত আকাশমণ্ডল মধুময় হইল, বিহঙ্গকুল বিপুল ঝংকারে মহাহরি-
লক্ষীর্জন আরম্ভ করিল, লতাকুঞ্জ এবং পাদপশ্রেণী নীরবে তাহা ভনিয়া
পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, চকিতনয়না কুরঙ্গিনীগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে
উৎকর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষীকা ও অলিকুল
উড়িয়া আসিয়া পড়িল, সমস্ত বিশ্ব যেন সঙ্গীতসুধার্ণবে ডুবিয়া গেল।

যোগসন্তোষ এবং সঙ্গীতের অবসানে যোগিনী বলিলেন, “এক্ষণে
তুমি সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত হইয়াছ, এখন গাজীপুরে পদ্ধতীয়ে আমার ভক্তিভাজন
ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমৎসদানন্দ স্বামীর আশ্রমে গমন কর, তথায় তোমার নিত্য-
সহচরী জীবনসঙ্গিনী সন্তোষিনীকে প্রাপ্ত হইবে।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

স্বর্গারোহণ ।

জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, প্রেম, পুণ্যের স্বর্গীয় উপাধানে রচিত ভাগবতী তমু লাভ করিয়া বাহ্যরাম পূর্বোক্ত বৈবস্বতির অনুগরণ করিলেন । ভক্তিবিশিষ্ট চিত্তে যোগিনী মাতা এবং আশ্রমবাসী তাপসমণ্ডলীর নিকট প্রণামপূর্বক বিদায় লইলেন । ইতিপূর্বে তিনি জনতের প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ এবং মানসিক ক্রিয়ায় মূলে পরম পুরুষ ভগবানকে পিতা মাতা সখারূপে ভক্তিনেত্রে দর্শন করিয়া ভক্তবিশ্বাসী হইয়াছিলেন, এক্ষণে যোগ-সিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তর বাহ্য, ইহ পরকাল, নগ্ন পৃথিবী, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত হরিময় দেখিতে লাগিলেন । ইহাতে তাঁহার হৃদয় বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে আগ্রস্ত হইল, প্রেমরূপে রঞ্জিত নয়ন ভক্তিজলে তামিতে লাগিল, তাহার স্বচ্ছ দর্পণে বিশ্বত্রুত ব্রহ্মজ্যোতিতে য্যোতিমান হইয়া এক অপূর্ব আনন্দরাম রচনা করিল । প্রথমে নিষ্ঠুর, তার পর সগুণ, পরিশেষে তদন্তর্য্য লাভ । ইচ্ছা ভাব জ্ঞান সমস্ত অন্তের অস্বীকৃত হইল । অন্ধ উদ্ভিদ, পক্ষী নিকর, আকাশ বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, সমস্ত জাহার নিকট জীবন্তভাবে তখন কথা কহিতে লাগিল । জীব যখন প্রকৃতিস্থ তখন প্রকৃতির গড় প্রকৃতি ভাবগতি নৃত্য গীত আমোদ কৌতুক কথাবার্তা সমস্ত সে মুকিতে পারে । যে নিষ্ঠুর আধ্যাত্মিক অদৈবতবাদের অন্ধুর বাহ্যরামের প্রথম যৌবনে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সগুণ পুরুষের সহিত মিশিয়া বৈতাদৈবতবাদের সমস্ত সাধন করিল । পূর্ব ব্রহ্মে অসুখ জীবাত্মা, চিদাকাশে চিহ্নিন্দু, অনন্ত জগদ্বিশিষ্টায় জ্যোতি কলিকা মিশিয়া গেল ।

অতঃপর প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে পর্বতের অধিত্যকা ভূমি ছাড়িয়া উপত্যকা ভূমিতে তিনি অবরোহণ করিলেন । তাহে মত্ত বাহ্যরাম পৃথিবীতে কখন কলতরে অবনত তরুণাজীকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার অস্ত্র ধাৰিত হন, কখন বা নবপল্লবাত্ত বোহল্যমান কুশ-

মিত লভিকা সকলকে পবন হিলোলে জৌড়া করিতে দেখিয়া ভাড়াহিন্দকে ভয়ী বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি সর্বত্র আপনার প্রতিরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ধানন্দের আশ্রমাস্তিমুখে চলিলেন। মহাশেষের আবেশে প্রমত্ত হইয়া শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। যোগের বিচ্ছেদ নাই, ভাবেরও বিরাম নাই। এইরূপে নাচিতে গাইতে হাসিতে খেলিতে শুকদেব গোশ্বামীর স্তায় বালকবৎ পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্তের ন্যায় বেশ ভূষা দেখিয়া নগর জনপদের বালকগণ অঙ্গে ঘুলি নিক্ষেপ করিল, কেহ কটু বলিল, কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহার শাস্তি ভঙ্গ করিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপারমধ্যে তিনি কেবল ভগবানের বিচিত্র লীলা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ শোক হর্ষ সুখ দুঃখ স্তুতি নিন্দা মান অপমানের অতীত অবস্থায় তখন তিনি পৌঁছিয়াছেন। যিনি অনন্তের সন্ধান অন্তরাশ্রা স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার অন্ত পান সুখ সম্পদ। বধাসময়ে বাহ্যারাম গম্য স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। পথ ভ্রমণের পরিশ্রম, দেশ কালের ব্যবধান কিছুই আর অনুভব করিতে পারিলেন না; যেন যোগবলে অচিরকাল মধ্যে আপনার স্বজাতীয় সম-প্রকৃতি সমভাবী আশ্রয় অন্তরঙ্গের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন। তৎকালে আশ্রম-কূটীর দ্বারে স্বামী সন্ধানন্দের সম্মুখে অজ্ঞানাসনে যোগসমাহিত চিত্তে সন্তোষিণী বসিয়াছিলেন। সন্ধানন্দের মুখের হাসি তাঁহার মূর্ত্তি কুটিয়াছে, চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, ভয় দুঃখ ভাবনার লেশ মাত্র তাহাতে নাই। প্রাণ যেন প্রাণারামের শান্তিকোলে পরম শান্তি সন্তোষে তৃপ্তকাম হইয়াছে। বস্তুতঃ তৎকালে স্বামীজীর অমিত যোগপ্রভা প্রচণ্ড মার্ভগের ন্যায় সন্তোষিণীর নির্মল শুদ্ধদেহে বিভাসিত হইতেছিল। সে অপূর্ণ শোভা সন্দর্শন করত বাহ্যারাম পুনরায় গাইলেন, “পূণাপূজেন যদি প্রেমধনং কোপিলভেৎ।” যোগরাজ্যে কেহ কাহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করে না। ব্যবধান ছিন্ন হইলে অলে যেমন জল, আলোকে আলোক মিশিয়া যায়, ষটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, তেমনি যোগী আত্মা সর্বলের পরস্পর মিলন। এখানে জ্ঞানে ভাবে ইচ্ছায় সমজাতীয়ত্ব।

বাহ্যারাম যোগনেত্রে দেখিলেন, সন্তোষিণীর পূর্বের শ্রীর সঙ্গে এখন

আর কিছুই ঐক্য হয় না। বেহের অস্থি মাংস যেন বিহীনবৎ ভেঁজোয়, চক্ষু হইতে যেন কমনীয় চন্দ্ররাশি অবিরক করিয়া পড়িতেছে। সুখ থানি যেন সর্বাধিকসিদ্ধ হৈত শতদল পদ্মের জ্যায় প্রফুল্লিত। মৃত্যুর সেই ক্লিষ্ট কৃৎসনশঙ্কু এখন স্বর্ণবর্ণ। অনন্তর ইহাঁদের তিন জনের জ্ঞান জ্ঞান, ভাবে ভাব, ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া এক হইয়া অনন্তে গিয়া প্রবেশ করিল। মহাযোগ-সমুদ্রে প্রেমমহাভাবের তরঙ্গ উঠিল। তখন তিন জনে মিলিয়া এক হাসি হাসিলেন, এক নাম গাইলেন, এক তত্ত্ব বুঝিলেন, এক ভাব ভাবিলেন, এক লীলা দেখিলেন, এক মতে এক পথে মহামিলনের রাজ্যে চলিলেন। ইহা জড় ভূতের মিলন নহে, স্বাধীন চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার দেখা মিলন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অধীনে তিনের মিলন। বিচিত্রতার ভিতর একতা এবং একতার ভিতর বিচিত্রতা।

পরে স্বামী সন্ধানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “হে যোগী আত্মাদয়, তোমরা পরম্পরের হস্ত ধারণপূর্বক আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, এবং বল, জয় সচ্চিদানন্দের জয়! জয় সচ্চিদানন্দের জয়! জয় সচ্চিদানন্দের জয়!”

বাঞ্ছারাম সন্তোষিনী স্বামীজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত মহাশাক্য সমস্তের বারংবার উচ্চারণ করিলেন। সেই ক্ষণি সমস্ত ভূমনে প্রতিধ্বনিত হইল। যৎকালে এই প্রযুক্তাঙ্গা যোগীত্রয় দণ্ডায়মান হইয়া সচ্চিদানন্দের জয় গান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অঙ্গকান্তি চিত্তব্যাহারাত গিরিশঙ্করের ন্যায় চারিদিকে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছি। মহাযোগে এবং মহাভাবে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মসত্যে দীপ্তি পাই-তেছিলেন। তদনন্তর স্বামী উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “ঐ বেধ! পুষ্পরঞ্জে চড়িয়া স্বর্গদূতগণ তোমাদিগকে লইতে আসিতেছেন! অমর ধামে গিয়া অমৃত পান করিবার জন্য প্রস্তুত হও!”

(১)

অনন্ত আকাশে নীলাশ্বর শবে

বেবদুতগণ চড়ি পুষ্পরঞ্জে

আসিল নামিয়া গাইয়া গাইয়া

অমর ধামের মধুর গান;

গগনে গগনে ছুটিল সে ধ্বনি,
 ধ্বনিত করিয়া বিশাল ধরণী ;—
 বাহল পবনে, তপনকিরণে,
 স্নিগ্ধা জুড়াল তাপিত প্রাণ ।

(২)

শ্বেত পীত নীল লোহিত বরণ
 সুবাসিত যত কুসুম রতন
 গাঁথিয়া যতনে সুরবালাগণে
 দিয়াছে পরায়ে রথের গায় ;
 অপরূপ ভাতি কুসুমবিমান,
 উড়ে কত তাহে ফুলের নিশান,
 করে ঝল মল আকাশ ভূতল
 পবনে পবনে সুরভি ধায় !

(৩)

শ্বেত সুবিমল রক্ততঃ উজ্জ্বল,
 হিমালি সমান ধবল কায়
 দেবদূতগণ সুরভি মোহন
 শোভে সারি সারি বসিয়া তায় ।

(৪)

মিশে প্রাণে প্রাণে, স্থললিত তানে,
 ভগবৎ বশঃ সকলে পায় ;
 জয় জয় নাদে পরম আহ্লাদে
 দেয় সুরগণ তাহাতে সায় ।

(৫)

বলে সব নরে অগস্তীর বরে
 “আগ রে ঘুমায়ে থেক না আর ;
 গরল মথিয়া অমৃত তুলিয়া
 হরিলেন হরি ভবের ভার ।

(৬)

সন্তোষিনী বাহ্যারাম, হয়ে এবে পূর্ণকার,
 কণমিষা সহানন্দে উঠিলেন রথে ;
 ভাগবতী ওমু হরি, বহনে বলিরা হরি,
 প্রেমানন্দে ধোঁহে চলিলেন অর্পণথে ।

(৭)

নগার মিলে সবে, অর অর অর হবে,
 গাইল মঙ্গল গীত গভীর মিনাথে,
 সেই নামে গণ মঠা হইল আনন্দে মত্ত,
 বাড়িল জীবের আশা হরির প্রসাথে ।
 বল ভাই হরি হরি, আনন্দে লঙ্কর ভরি,
 "গরলেক্ষমুত" এই দিব্য উপাখ্যান ;
 ভক্তিভরে সেই জন করিবেক অধারন,
 অবিমুক্ত হবে পাবে হরিপথে স্থান ।

[সমাপ্ত ।]





